কনস্তান্তিন স্তানুকোভিচ

# মাক্সিমকা

সোমেন-তাজুল পাঠাগার

কনস্তান্তিন স্তানুকোভিচ

# মাক্সিমকা

## সাগরের গল্প

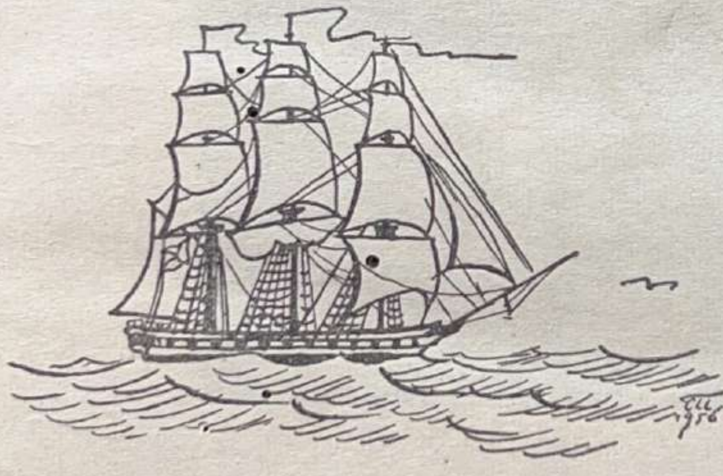

বিদেশী ভাষায়
সাহিত্য প্রকা[illegible]য়
মস্কো

অনুবাদ: ফল্গু কর
প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: সের্গেই পজারস্কি

# সূচী

মাক্সিমকা . . . . . ৭
নার্স . . . . . ৪৩
পলায়ন . . . . . ১২০
জলে-পড়া লোক . . . . . ১৪৭
বেঁড়ে . . . . . ১৭৩
বন্ধুদের মাঝখানে . . . . . ২০০
ঝড়ের মধ্যে . . . . . ২১৭
বেপরোয়া . . . . . ২৩৬

তুর্সিককে

## ১

এইমাত্র জাহাজের ঘণ্টা বাজল। মধ্য আটলাণ্টিকে অপূর্ব গ্রীষ্মমণ্ডলের সকাল ছ'টা। উজ্জ্বল, জ্বলন্ত, সোনার গোলকের মত সূর্য দ্রুত উঠছে হাল্কা নীল পূব আকাশের বুকে। গুচ্ছ গুচ্ছ তুষার-ধবল খণ্ড মেঘের দল সূক্ষ্ম লেসের টুকরোর মত উর্ধ্ব আকাশের কোমল স্বচ্ছতাকে এখানে ওখানে ফুটিয়ে তুলছে। সমুদ্রের বিশাল বুকে সূর্যের উজ্জ্বল দীপ্তি। দূর নীল দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত সীমাহীন, মৃদু তরঙ্গায়িত সমতলের মত সমুদ্র বিস্তৃত।

বাতাসে কেমন একটা গম্ভীর স্তব্ধতা।

একটার পিছনে আর একটা ছুটে চলেছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাল্কা নীল ঢেউয়ের দল। ওদের রুপোলী চূড়া রোদে ঝিকমিক করছে। একমাত্র ঢেউয়ের শব্দ কানে আসছে—মৃদু, প্রায় আদর করা আওয়াজে একটার সঙ্গে আর একটা

মিলিয়ে যাচ্ছে। ফিস ফিস করে যেন বলছে ওখানে, ঐ গ্রীষ্মমণ্ডলে প্রাচীন আদিম সমুদ্র সব সময়েই ভাল মেজাজে আছে।

সযত্নে, দয়াবতী স্নেহময়ী ধাত্রীর মত সমুদ্র তার বিশাল বুকে জাহাজগুলোকে ধরে আছে, ঝড় ঝঞ্ঝার লেশমাত্র আশঙ্কা নেই নাবিকের মনে।

সমুদ্র নির্জন।

কোথাও একটা জাহাজ বা এতটুকু ধোঁয়া নেই — আছে শুধু বিশাল সমুদ্র পথ।

মাঝে মধ্যে উড়ুক্কু মাছের উজ্জ্বল রুপোলী আঁশ রোদে চক চক করছে। খেলায় মত্ত তিমি মাছ কালো পিঠ দেখিয়ে সশব্দে জলের ফোয়ারা তুলছে। হয়ত একটা কালো ফ্রিগেট বা তুষার-সাদা আলবেট্রস মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল কিংবা একটা ছোট্ট ধূসর পাখি জলের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে আফ্রিকা বা আমেরিকার সুদূর তীরের দিকে। মর্মরিত তরঙ্গ, সূর্য ও আকাশ — সবকিছু উজ্জ্বল, আনন্দময় ও সখ্যতাভরা — এ ছাড়া আর কিছুই নেই।

স্ফীত সমুদ্রের উপর দিয়ে মৃদুভাবে দুলতে দুলতে রুশ বাষ্পীয় রণ-পোত ক্লিপার 'জাবিয়াকা' দ্রুত এগিয়ে চলেছে দক্ষিণে। প্রতিদিনই উত্তরের কঠোর ও গম্ভীর প্রকৃতির দেশ থেকে জাহাজটি দূর থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে, সে দেশ যদিও এত প্রিয়, এত আদরের।

ছোট্ট, কালো, ছিমছাম চেহারার জাহাজটি, শোভন গঠনসৌষ্ঠব। পিছন-দিকে-একটু-হেলান তিনটি লম্বা মাস্তুল পালের ক্যানভাসে ঢাকা। 'জাবিয়াকা' অনুবাতে ঈষৎ একপেশে হয়ে সাত বা আট মাইল বেগে উত্তর-পূব আয়ন বাতাসে পাল তুলে এগিয়ে চলেছে। গড়িয়ে-যাওয়া ফেনপুঞ্জ আর উৎক্ষিপ্ত শীকরধারার মাঝখানে অগ্রভাগ দিয়ে মৃদু শব্দে সমুদ্রকে কেটে ঢেউয়ের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে সে—গতি স্বচ্ছন্দ ও সুচারু। ঢেউগুলো মৃদুভাবে জাহাজের পাশে পড়ছে। চলার পথের পিছনে পড়ে আছে উজ্জ্বল রুপোর এক চওড়া ফিতা।

উপর ও নীচের ডেকে সকাল আটটার নিয়মিত সাফাই ও মাজা ঘষার কাজ চলেছে। এটা হল জাহাজের নিশান তোলা ও দিনের কাজ সুরু করার প্রস্তুতি।

ডেকের এদিকে ওদিকে চওড়া-নীল কলারওয়ালা সাদা সার্ট-পরা নাবিক। দেখা যাচ্ছে তাদের পেশী বহুল, জল-হাওয়ায় তামাটে গলা, পা খালি, ট্রাউজার হাঁটু পর্যন্ত গুটান। করছে ধোলাইয়ের কাজ। ডেক, জাহাজের দেয়াল, কামান, পিতলের জিনিষ এবং নজরে-আসা 'জাবিয়াকার' অন্যান্য সবকিছুর মাজা ঘষায় এরা ব্যস্ত। অতি সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে তারা কাজ করছে। জাহাজ পরিষ্কারের সময় নাবিকরা সব সময়েই এমনি করে থাকে। মাস্তুলের মাথা থেকে সুরু করে জাহাজের খোল পর্যন্ত সবকিছুই যাতে নিখুঁতভাবে পরিষ্কার হয় সে দিকে তাদের খেয়াল। ঝামা, ন্যাকড়া বা সাদা রঙ দিয়ে যাকিছু সাফ করা সম্ভব তার সবকিছুই হবে ঝকমকে ও ছিমছাম।

মনপ্রাণ ঢেলে ওরা কাজ করছে। 'গলা-বাজ' সারেঙ্গের চিৎকার যতবার কানে আসছে মুখ টিপে হাসছে ওরা। এ হল উদ্গত ধূসর-চোখ মাৎভেইচ। পারে গিয়ে অতিরিক্ত মদ গেলায় আর রোদে পোড়ায় মুখ লাল—বুড়ো ঝানু নাবিক। এমন বিশেষ ধরনের চমকদার গালাগালি করতে ওস্তাদ, যা রুশ নাবিকদের অভ্যস্ত কানকেও পীড়া দেয়। নিজের কথামত 'শৃঙ্খলা বজায় রাখার' জন্য তার এই অভ্যেস, লোকদের উত্তেজিত করার জন্য ততটা নয়।

মাৎভেইচের শাপান্ত করাকে কেউ কিছু মনে করে না। নাবিকরা জানে লোকটা দয়ালু, ভদ্র—ওদের সঙ্গে ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত, নিজের পদমর্যাদার অবমাননা করে না সে। শাপান্ত না করে সে যে একটা কথাও বলতে পারে না এ তারা বহুদিন ধরেই জানে। সত্যি বলতে গেলে এ ব্যাপারে তার শব্দকোষের পরিধি ও বৈচিত্র্যে তারা আনন্দ পায়। এতে লোকটি একজন সত্যিকারের ওস্তাদ।

মাঝে মাঝে দু'একজন নাবিক ছুটে যাচ্ছে অগ্রমাস্তুলের পুরোবর্তী উঁচু ডেকে জলের টব আর ধোঁয়াটে তেলের বাতির কাছে। ওখানে চলেছে চট করে এক টান কড়া মাখোরকা তামাক খেতে আর সেই সঙ্গে বন্ধুদের সাথে দু'চারটে কথা বলতে। আবার ওরা ফিরে আসছে নিজেদের মাজা ঘষার কাজে। লম্বা ছিপছিপে চেহারার প্রধান অফিসারকে দেখতে পেলেই বিশেষ যত্ন নিয়ে কাজ করছে। অফিসারটি সেই ভোর থেকে জাহাজের সর্বত্র টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

পাহারা-অফিসারটির অল্প বয়েস, চুলগুলো সোনালী, ওর পাহারার কাজ চারটে থেকে আটটা, ভোর বেলার ঘুম ঘুম ভাব সে কাটিয়ে উঠেছে। পরনে সাদা পোষাক, সার্টটা গলার কাছে খোলা। ব্রিজের উপর পায়চারি করছে সে আর বড় বড় হাঁ করে ভোরের ঠাণ্ডা ও তাজা বাতাস নিচ্ছে। বাতাসটা জ্বলন্ত রোদে তখনো গরম হয়ে ওঠেনি। কর্ণধার ঠিক পথে জাহাজ চালাচ্ছে কি না দেখার জন্য কম্পাসের দিকে চাইবার সময়, পালগুলো ঠিক আছে কি না কিংবা আকাশে ঝোড়ো মেঘ দেখা যাচ্ছে কি না যাচাই করার জন্য যতবারই সে থামছে ততবারই স্নিগ্ধ বাতাস তার ঘাড়ের উপর এসে আদর জানাচ্ছে।

সর্বকিছুই ঠিক থাকায় এই সুন্দর গ্রীষ্মমণ্ডলে পাহারা-অফিসারের বস্তুত কিছুই করার নেই।

সুতরাং ব্রিজের উপর স্রেফ পায়চারি করতে লাগল সে। আগেভাগেই পাহারার কাজ শেষ করে টাটকা গরম রুটির সঙ্গে চা খাবার স্বপ্ন দেখতে লাগল। অফিসারের পাচকটি এই খাবার বানাতে ওস্তাদ, অবশ্য 'ময়দার তালকে ফাঁপানোর' জন্য যে ভদকা দেওয়া হয় তা যদি না গিলে ফেলে।

## ২

হঠাৎ পোতাগ্রভাগের পাহারাদারের চমকে-ওঠা অস্বাভাবিক তীব্র চিৎকারে সকালের স্তব্ধতা গেল ভেঙে:

'জলে মানুষ!'

নাবিকরা কাজ ফেলে ছুটে গেল জাহাজের অগ্রমাস্তুলের পুরোবর্তী ডেকের ওপর, উদ্বেগের সঙ্গে চাইতে লাগল সমুদ্রের দিকে।

'কোথায়?' পাহারাদারকে তারা জিজ্ঞেস করল চেঁচিয়ে। তরুণ সোনালী চুল নাবিকের মুখ হঠাৎ কাগজের মত সাদা হয়ে গেল।

'ওই ওখানে!' কেঁপে-উঠা হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল সে। 'এখন ওকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু একটু আগেই দেখতে পেয়েছিলাম ... ঝুঁলে আছে একটা মাস্তুলের

সঙ্গে, মনে হচ্ছিল ওরই সঙ্গে বাঁধা,' বৃথাই আবার মাস্তুলটাকে দেখার চেষ্টা করতে করতে উত্তেজিতভাবে বলল সে।

পাহারা-অফিসার পাহারাদারের চিৎকারে চমকে উঠে তার দূরবীণ চোখে লাগাল। যে দিকটায় সে আঙুল দেখিয়েছে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল সে দিকে।

সঙ্কেতকারীও তার দূরবীণ নিয়ে ঠিক তাই করল।

'কিছু কি দেখতে পাচ্ছ?' তরুণ অফিসার জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ স্যার, আর একটু বাঁ দিকে।'

ঠিক সে সময় অফিসারও একটা মানুষশুদ্ধ মাস্তুলের টুকরো ঢেউয়ে দুলতে দেখল।

তীক্ষ্ন কাঁপা গলায় যত জোরে সম্ভব সে হুকুম দিল:

'সবাই ডেকে যাও! পাল নাবাও!'

সঙ্কেতকারীকে বলল উত্তেজিতভাবে:

'ওর উপর নজর রাখো!'

সিটি বাজিয়ে সারেঙ্গ গভীর খাদে চেঁচিয়ে উঠল, 'উঁচু ডেকে সবাই!'

নাবিকরা পাগলের মত নিজের নিজের জায়গায় দৌড়ে গেল।

ক্যাপ্টেন আর প্রধান অফিসার ইতিমধ্যেই ব্রিজের উপর এসে গেছে। অন্যান্য অফিসারদের বেশীর ভাগ আধ-জাগা, আসতে আসতে ইউনিফর্ম গায়ে চাপাল।

প্রধান অফিসার ব্যাপারটার ভার নিল। 'সবাই ডেকে লাগ,' এ নির্দেশের সময় এই হল নিয়ম। নাবিকরা তার ত্বরিৎ আদেশে অত্যুগ্র দ্রুততা নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল, উপলব্ধি করল প্রতিটি মুহূর্তই অমূল্য।

মিনিট সাতেকের ভিতর সব পালগুলো গুটিয়ে নেওয়া হল। 'জাবিয়াকা' ঢেউয়ের উপর মৃদু দোল খেতে লাগল। লম্বা নৌকোটিকে নীচে নাবিয়ে দেওয়া হল। ষোলো জন দাঁড়ী আর কর্ণধার হিসেবে একজন অফিসার চাপল তাতে।

'জলদি!' নৌকো জাহাজ থেকে দূরে সরে যেতে ব্রিজের উপর থেকে ক্যাপ্টেন বলে উঠল।

নাবিকরা প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগল, দ্রুত এগুতে লাগল জলে-পড়া লোকটাকে বাঁচাবার জন্য।

'জাবিয়াকার' গতি কমাবার জন্য যে সাত মিনিট সময় লেগেছিল তাতে সে একমাইলেরও বেশী এগিয়ে গেছে, দূরবীণ দিয়েও মাস্তুল বা লোক দেখা যাচ্ছে না।

ওরা অবশ্য কম্পাসের সাহায্যে যে দিকটায় মাস্তুলটা ভাসছিল সেদিক লক্ষ্য করেছে, নৌকো বাইতে লাগল সেই দিকে।

'জাবিয়াকার' সব নাবিকদের চোখই নৌকোর উপর। কখনো ভেসে উঠছে ঢেউয়ের চূড়ায়, কখনো ডুবে যাচ্ছে খাতের ভিতর — সুপারীর খোলার চাইতে বড় মনে হচ্ছে না।

কিছুক্ষণের ভিতরে ওটাকে মনে হল একটা কালো বিন্দুর মত।

## ৩

ডেকের উপর চুপচাপ।

মাঝে মাঝে নাবিকরা জাহাজের পিছনের দিকে ও কোয়ার্টার ডেকে জড় হয়ে নীচু গলায় দুচারটে কথা বলাবলি করছে:

'নিশ্চয়ই কোন ডুবো জাহাজের লোক হবে।'

'এরকম জায়গায় কোন জাহাজই ডুবতে পারে না। একেবারে পচা না হলে।'

'না! কিন্তু এমন হতে পারে রাতে অন্য জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে ...'

'আগুনও ত লাগতে পারে।'

'হয়ত এই একটা লোকই বেঁচে আছে!'

'হতে পারে আর সবাই নৌকোয় উঠে চলে গেছে। ওর কথা সবাই ভুলে গিয়েছিল।'

'সন্দেহ হয় লোকটা বেঁচে আছে কি না।'

'তা, এখানকার জল গরম, বাঁচতেও পারে।'

'হাঙ্গর ওকে ধরেনি সেটা কি ব্যাপার? জায়গাটা যে হাঙ্গরে কিলবিল করছে।'

'হ্যাঁ ভাই, নাবিকের জীবন বড় বিপদের। আমি বেশ টের পাচ্ছি।' দীর্ঘ নিশ্বাস চেপে বলল একজন। যুবকটির কালো চুল। এক কানে একটা আংটি। মাত্র

সে বছরেই নৌবাহিনীতে কাজে লেগেছে আর বলতে গেলে লাঙল ছেড়ে সরাসরি বড় সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে।

বিষণ্ণ মুখে, টুপি খুলে ক্রুশচিহ্ন আঁকল সে। সমুদ্রে সাংঘাতিক মৃত্যুর হাত থেকে ঈশ্বর ওকে রক্ষা করুন, নিঃশব্দে যেন এই প্রার্থনাই জানাল।

পৌনে এক ঘণ্টা কাটল ক্লিষ্ট উৎকণ্ঠায়।

শেষ পর্যন্ত দূরবীণ থেকে চোখ না সরিয়ে সঙ্কেতকারী সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল:

'নৌকো ফিরে আসছে!'

নৌকো এগিয়ে আসতে প্রধান অফিসার জিজ্ঞেস করল:

'ওরা ওকে পেয়েছে?'

'আমি দেখতে পাচ্ছিনে, স্যার,' সঙ্কেতকারীর গলায় আগের মত ফূর্তি নেই।

'ভয় হচ্ছে ওরা ওকে খুঁজে পায়নি,' প্রধান অফিসার ক্যাপ্টেনের দিকে যেতে যেতে বলল।

'জাবিয়াকার' ক্যাপ্টেন বেঁটে, মোটা, বলিষ্ঠ, কালো চুলওয়ালা মাঝ-বয়সী, তার মাংসল গাল আর চিবুকের উপর কাঁচা-পাকা দাড়ির ঘন গোছা, ক্ষুদে গোল চোখ বাজপাখির মত তীক্ষ্ন ও প্রখর। অস্থিরভাবে ঘাড় নেড়ে চাপা বিরক্তির সঙ্গে বলল:

'আমার মনে হয় তোমার ধারণা ভুল। নৌকোয় একজন অভিজ্ঞ অফিসার আছে। লোক না পেলে এত তাড়াতাড়ি সে ফিরে আসত না।'

'কিন্তু সঙ্কেতকারী যে ওকে দেখতে পাচ্ছে না।'

'হতে পারে ও নীচে শুয়ে আছে। যাই হোক, এখুনি জানা যাবে।'

ক্যাপ্টেন ব্রিজের উপর পায়চারি শুরু করল আর ফিরে-আসা নৌকোটাকে দেখবার জন্য মাঝে মাঝে থামতে লাগল। শেষটায় দূরবীণ দিয়ে নিরিখ করল সে। উদ্ধার-করা লোকটিকে দেখতে না পেলেও অফিসারের মুখে প্রশান্ত আনন্দের ভাব দেখে সে নিশ্চিন্ত হল যে ওরা ওকে নৌকোয় তুলেছে।

ক্যাপ্টেনের কঠোর মুখে ফুটে উঠল স্মিত হাসি।

কেটে গেল আরও কয়েক মিনিট। নৌকো পাশে ভিড়ল — সবশুদ্ধ তোলা হল জাহাজে।

অফিসার বেরিয়ে এল, পিছনে দাঁড়ীর দল। প্রত্যেকেরই মুখ লাল, ঘাম ঝরছে, শ্রান্তিতে হাঁপাচ্ছে। একজন নাবিক তাদের খুঁজে-আনা উপহারটিকে নিয়ে এল। একটা নিগ্রো বাচ্চা — দশ এগার বছরের হবে। আপাদমস্তক ভেজা, ছোট্ট, কাহিল, রোগা চকচকে কালো শরীরটা একটা ছেঁড়াখোঁড়া সার্টে কিছুটা ঢাকা।

বাচ্চাটার দাঁড়াবার শক্তি নেই। সমস্ত শরীর কাঁপছে। নাবিকদের দিকে তার বড়, বসে-যাওয়া চোখে এমনভাবে তাকাচ্ছে যাতে অবিশ্বাসের সঙ্গে মিশে আছে আনন্দ — যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সে উদ্ধার পেয়েছে।

'মাস্তুল থেকে যখন তুলি বেচারা প্রায় আধ-মরা। ওর জ্ঞান ফিরাতে খুব বেগ পেয়েছিলাম,' অফিসারটি বলল ক্যাপ্টেনকে।

'এখখুনি রোগীর ঘরে নিয়ে যাও!' ক্যাপ্টেন হুকুম দিল।

ছেলেটিকে সঙ্গে সঙ্গে রোগীর ঘরে নেওয়া হল। সেখানে ওকে শুকনো করে মুছিয়ে বাঙ্কের উপর শুইয়ে জড়ান হল মোটা কম্বলে। এরপর জাহাজের ডাক্তার ওর গলায় এক একবার কয়েক ফোঁটা করে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে ওর চিকিৎসা সুরু করল।

ছেলেটা তেষ্টা-পাওয়া লোকের মত ব্র্যাণ্ডি গিলে ফেলল। ডাক্তারের দিকে সানুনয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের মুখ দেখাতে লাগল।

ইতিমধ্যে আবার পালগুলো তোলা হল। মিনিট পাঁচেকের ভেতর 'জাবিয়াকা' তার পথ ধরল। নাবিকরা সুরু করল তাদের ফেলে-রাখা কাজ।

চারদিকে উদ্ধারের ব্যাপার নিয়ে সজীব আলোচনা চলল; মন্তব্য করা হল বাচ্চাটার সাংঘাতিক রোগা আর রক্তশূন্য চেহারা নিয়ে।

কেউ কেউ রোগীর ঘরে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করল ছেলেটি আছে কেমন।

'ডাক্তার দেখছেন। তিনি ওকে ঠিক করে তুলবেন!'

ঘণ্টাখানেক বাদে অভিজ্ঞ করশুনভ এই খবর নিয়ে হাজির হল যে নিগ্রো বাচ্চাটা কয়েক চামচ গরম সুপ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

'রাঁধুনি বিশেষ করে এটা তৈরী করেছিল ছেলেটার জন্য। বিশুদ্ধ সুপ — এক ধরনের সুরুয়া,' উত্তেজনার সঙ্গে ওদের খবরটা দিল করশুনভ। তার দ্বিগুণ আনন্দ, কারণ এই সে প্রথম বিশ্বাসী শ্রোতা পেয়েছে (লোকটা সাংঘাতিক মিথ্যে বলে), আর মিথ্যে বলার তার দরকার নেই।

এই অপূর্ব সুযোগের চরম সদ্ব্যবহারের জন্য সে চটপট বলে চলল:

'ডাক্তারের এসিসট্যাণ্ট আমাকে বলেছে ডাক্তার যখন ওকে খাওয়াচ্ছিল ও যেন বিড় বিড় করে কী বলে, "সুপ আরও চাইছিল আর কি।" ডাক্তারের হাত থেকে একবার পেয়ালাটা ছিনিয়ে নেবারও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ডাক্তার তাকে বেশী খেতে দেয়নি। "ওকে ধীরে ধীরে এগুতে হবে নইলে ও মারা পড়বে," বলেছে সে।'

'ছেলেটা তখন কী করল?'

'কিছু না। তাই মানতে বাধ্য হল।'

ঠিক সেই সময়ে জলের টবের কাছে এসে হাজির হল ক্যাপ্টেনের চাকর সোইকিন — ক্যাপ্টেনের ফেলে-দেওয়া সিগারের টুকরো ধরাল সে।

সঙ্গে সঙ্গে সবার নজর পড়ল ওর উপর:

'তুমি কিছু শুনেছ না কি সোইকিন, ওরা নিগ্রো বাচ্চাটাকে নিয়ে কী করবে?'

লাল চুল আর ছুলিওয়ালা মুখ, ছিমছাম করে গায়ে-দেওয়া নিজের সুন্দর নাবিকের সার্ট, পায়ে ক্যানভাসের জুতো। বড়লোকি কায়দায় সিগারে টান মেরে এমন কর্তৃত্বের সঙ্গে কথা বলল যাতে মনে হল সরাসরি ওর খবর জানা আছে:

'আমরা ওকে নিয়ে কী করব? কেন, কেপটাউনে পেঁাছে পারে ছেড়ে দেব।'

একটু থেমে উদ্ধতভাবে বলল:

'ওর মত কালা বিধর্মীকে নিয়ে আর কীই বা করা যায়? বুনো বর্বর ছাড়া আর কী?'

'বর্বর হোক আর যাই হোক, তোমার আমার মত ওরাও ঠিক ভগবানের সন্তান,' বলল জাহাজের ছুঁতোর মিস্ত্রী জাখারিচ বুড়ো।

সবাই ওর কথায় সায় দিল।

'কিন্তু কেপটাউন থেকে ও বাড়ি যাবে কী করে? আমার মনে হয় ওর মা বাবা কোথাও আছে আমাদেরই মত।'

'ওঃ, কেপে বহু নিগ্রো আছে। ও কোত্থেকে এসেছে তারা বার করে ফেলবে, সোইকিন জবাব দিল।' সিগারের টুকরোটা শেষ করে চলে গেল সে।

'ও কে যে এ ভাবে কথাবার্তা বলে! বেটা ত চাকর মাত্র!' বুড়ো ছুতোর গোঁ গোঁ করে উঠল।

## ৪

যদিও খুবই দুর্বল, পরের দিন নিগ্রো বাচ্চাটা তার দুর্ভোগের ধাক্কা কাটিয়ে উঠল। মোটাসোটা সদাশয় ডাক্তার অমায়িক হেসে সাদরে ওর গালে টোকা মেরে এক পেয়ালা সুপ খেতে দিল। ছেলেটা গরম সুপ খেয়ে মর্মস্পর্শী কৃতজ্ঞতায় তার দিকে বড় বড় বেরিয়ে-আসা চোখ মেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। সাদার মাঝে কালো চোখের তারা জ্বলজ্বল করছে।

এরপর ডাক্তার বার করবার চেষ্টা করতে লাগল কী ভাবে ছেলেটা সমুদ্রে পড়েছিল, কতদিনই বা না খেয়ে আছে। কিন্তু সংকেত আর ভাবভঙ্গী দিয়ে নিজেকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেও ডাক্তার তার রোগীর সঙ্গে কথা বলতে পারল না। বাচ্চাটা ডাক্তারের চাইতে ভাল ইংরেজি জানে বটে কিন্তু তারা তাদের জানা অল্প কয়েকটি শব্দকে ঠিক ভাবে উচ্চারণ না করে কথাবার্তা অসম্ভব করে তুলল।

ফলে কেউ কাউকে বুঝতে পারল না।

এরপর ডাক্তার এক ছোকরা অফিসারকে ডাকবার জন্য তার এসিস্ট্যাণ্টকে পাঠাল। একে অফিসাররা ডাকে পেতিয়া বলে।

'আপনি ত ভাল ইংরেজি জানেন পেতিয়া। দেখুন দেখি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারেন কি না। আমি ত একেবারেই নাচার,' হাসতে হাসতে বলল ডাক্তার। 'বলুন, তিনচার দিনের মধ্যে ওকে ডেকে বেড়াতে দোব।'

ছোকরা অফিসার বাচ্চার বাঙ্কের পাশে বসে তাকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করতে লাগল। খেয়াল রেখে ছোট ছোট কথা ব্যবহার করল, প্রতিটি শব্দকে উচ্চারণ করল স্পষ্ট। ছেলেটি তার সব কথা বুঝতে না পারলেও বেশীর ভাগই ধরতে পারল, নানারকম শব্দ জোড়া দিয়ে আর সুস্পষ্ট ভঙ্গীর সাহায্যে তার অর্থ বুঝাবার চেষ্টা করে চটপট জবাব দেবার প্রয়াস পেল।

এভাবে দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য কথাবার্তার পর অফিসারটি উপরওয়ালা অফিসারদের ঘরে বাচ্চার কাহিনীর একটা মোটামুটি কিন্তু যুক্তিসঙ্গত সঠিক বিবরণ দিল। এর ভিত্তি হল বাচ্চাটার উত্তর আর তার ভাবভঙ্গী।

ও ছিল আমেরিকার দু'মাস্তুল জাহাজ 'বেটসি'র ক্যাপ্টেনের কাছে ("আস্ত জানোয়ার," ক্যাপ্টেন সম্পর্কে মন্তব্য করল অফিসারটি)। ওর জন্য সে কাপড় আর জুতো সাফ করত, ওকে কফি ও ব্র্যান্ডি খাওয়াত (কিংবা বলা চলে ব্র্যান্ডি ও কফি), ক্যাপ্টেন ওকে ডাকত 'বয়' বলে আর এই নিগ্রো ছেলেটা মনে করত এটাই ওর নাম। কে যে ওর মাবাবা কোন ধারণাই ওর নেই। বছর খানেক আগে ক্যাপ্টেন ওকে মোজাম্বিকার দাসবাজার থেকে কিনে আনে। লোকটার কাজ ছিল রোজ ওকে প্রহার করা। নিগ্রো ক্রীতদাসের দল নিয়ে 'বেটসি' যাচ্ছিল সেনেগাল থেকে রিওর দিকে। দু'দিন আগে একটা জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ওটা ডুবে যায়। (অফিসারের বলা কাহিনীর এই অংশের ভিত্তি হল ছেলেটির 'দড়াম, দড়াম, দড়াম' বলে জাহাজের পার্টিশনের উপর ঘুঁষি মারা।) সমুদ্রে পড়ে ছেলেটা একটি ভাসা মাস্তুলের টুকরোর সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলে। দু'দিন এরই উপর কাটিয়ে দেয় সে ...

কিন্তু কথার চাইতে অনেক বেশী মুখর হয়ে যা প্রকাশ পেল তা হল ওর প্রতি দয়ার জন্য বিস্ময়, ওর ভয়-পাওয়া চাউনি। ডাক্তার আর অফিসারের দিকে যখন ও একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ওর চোখে ফুটে ওঠে রাস্তার কুকুরের কৃতজ্ঞ ভাব। সবচেয়ে স্পষ্ট ওর কালো চকচকে রোগা পিঠে চাবুকের কুৎসিত দাগ। পিঠের চামড়া এত পাতলা যে পাঁজরাগুলো প্যাট প্যাট করছে।

অফিসারের কাহিনী আর ডাক্তারের সাক্ষ্য উপরওয়ালা অফিসারদের মনে গভীর দাগ কাটল। একজন অফিসার প্রস্তাব করল ছেলেটিকে কেপটাউনে

রুশ কনসালের কাছে দেওয়া হোক আর ওরা নিজেদের ভিতর ওর জন্য চাঁদা তুলুক।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় উক্ত অফিসারের ছোকরা চাকরের গপ্প নাবিকদের মনে যে রেখাপাত করল তার তুলনায় এটা কিছুই না। ছোকরা চাকর আর্তেমি মুখিন (চালু নাম আরত্যুশ্কা) একটা হিংসা-মেশান আনন্দের লোভ সামলাতে পারল না। কাহিনীটাতে নিজের কিছু যোগ করে রং চড়িয়ে ফুটিয়ে তুলল আমেরিকান ক্যাপ্টেনের চরম পাশবিকতা।

'রোজই ও বাচ্চাটাকে পিটত। এইটুকু একটা শিশু কিন্তু যতক্ষণ না রক্ত ঝরত, ওর মুখের উপর সমানে ঘুষি চালাত সে। তারপর বাঁকান পেরেক থেকে চামড়ার পেটি তুলে আর এক দফা পিটত — সব চাইতে পুরু চামড়ায় তৈরী ভয়ঙ্কর পেটি,' বলে চলল আরত্যুশ্কা। ওর বাসনা ছেলেটার দুঃখের সব চাইতে জোরদার বর্ণনা দেওয়া। 'দেখতে কালো হলে কী হয়, একটা দুর্ভাগা অসহায় ছেলে। এই শুয়োরের কোনই ভ্রূক্ষেপ ছিল না সেদিকে। বাচ্চাটার পিঠে এখনও চাবুকের দাগ। দেখতে ভয়ঙ্কর — বলেছে ডাক্তার,' উত্তেজিত আরত্যুশ্কা বলতে লাগল, ওদের মনে দাগ কাটবেই সে।

কিন্তু নাবিকরা কিছুদিন আগেও নিজেরাই ছিল ভূমিদাস। বেত আর প্রহারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাদের আছে। ছেলেটির কাহিনী শুনে গভীরভাবে চঞ্চল হবার জন্য আরত্যুশ্কার বাড়িয়ে বলার দরকার ছিল না। ওরা কামনা করল পাষণ্ড আমেরিকান ক্যাপ্টেনের ভয়ঙ্কর কিছু ঘটুক, যদি হাঙ্গরে ওকে এর মধ্যেই না গিলে থাকে।

'আমাদের চাষীরা ত এর আগেই মুক্তি পেয়েছে কিন্তু মনে হচ্ছে ওদের আমেরিকাতে এখনও ভূমিদাস আছে,' বয়স্ক নাবিকটি বলল।

'হ্যাঁ, ওদের ওখানে আছে।'

'আমি এর মানে বুঝতে পারি না। অথচ ওরা নিজেদের বলে স্বাধীন জাত।'

'ওদের কাছে নিগ্রোরা এক ধরনের ভূমিদাস,' ব্যাখ্যা দেয় আরত্যুশ্কা। এ বিষয়ে উপরওয়ালাদের ঘর থেকে সে কিছু টুকরো খবর শুনেছে। 'আর

এ নিয়ে ওরা নিজেদের ভেতর লড়াই করছে। কোন কোন আমেরিকান নিগ্রোদের মুক্তি চায় কিন্তু যাদের ভূমিদাস আছে তারা এতে রাজী হচ্ছে না। এ নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি চলছে নিজেদের মধ্যে। অফিসাররা বলে, যারা নিগ্রোদের মুক্তি চায় তারাই জিতবে। ভূমিদাস-পোষা আমেরিকানদের তারা ধূলিসাৎ করবে,' তৃপ্তির সঙ্গে বলল আরত্যুশকা।

'আমি নিশ্চয় বলতে পারি, ভগবান আছেন ওদের দলে... যে কোন নিগ্রো আর সবার মতই স্বাধীন হতে চায়। এমন যে পাখি, সেও খাঁচার ভেতর সুখ পায় না, মানুষের ত কথাই নেই,' বলল ছুতোর মিস্ত্রী জাখারিচ।

কালো, বয়স-কম নাবিকটি বছর খানেক কাজ করছে। নাবিকের জীবন বিপজ্জনক বলে মন্তব্য করেছিল সে। এতক্ষণ মন দিয়ে আলোচনা শুনে এবার জিজ্ঞেস করল:

'তাহলে নিগ্রো বাচ্চাটাকে যে আমরা উদ্ধার করলাম, ও এখন স্বাধীন হবে কি?'

'অবিশ্যি। তোমার কী মনে হয়?' আরত্যুশকা জোর দিয়েই কথাটা বলল যদিও মনে মনে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত নয়। ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত আমেরিকান আইন সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান ছিল না।

তবু তার নিজের বিবেচনা মতে ছেলেটি স্বাধীন হবে। পাষণ্ড ক্যাপ্টেন ত মাছের খোরাক হয়েছে, সুতরাং আর কী আছে ভয় পাবার?

সে বলতে থাকে:

'এখন ওর যা দরকার তা হল কেপে পৌঁছে একখানা নতুন পাসপোর্ট। তারপর যেখানে ইচ্ছে সেখানেই যেতে পারবে।'

এই পাসপোর্টের ধারণায় তার নিজের সন্দেহ দূর হল।

'কথাটা ঠিক!' সোৎসাহে সমর্থন করল তরুণ নাবিক।

লালচে মুখে ভাল মানুষের ছাপ, 'কুতকুতে' স্নেহ-মাখা চোখ দুটোতে ফুটে উঠল হতভাগা নিগ্রো বাচ্চাটার জন্য স্বস্তির হাসি।

ক্ষণস্থায়ী প্রদোষের পর দেখা দিল মন-ভোলান গ্রীষ্মমণ্ডলের অপরূপ রাত। ভেলভেটের মত আকাশের বুকে ফুটে উঠল লক্ষ লক্ষ উজ্জ্বল তারা। জাহাজের

কাছাকাছি জলরাশি অনুপ্রভ আলোয় ঝিকমিক করছে — এছাড়া সবকিছু অন্ধকার।

একটু পরেই প্রার্থনার সঙ্কেত বেজে উঠল। কাজ-থেকে-ছুটি-পাওয়া পাহারাদাররা গেল বিছানা নিয়ে ডেকের উপর ঘুমোতে।

দীর্ঘ সময় কাটাবার জন্য পাহারার লোকরা দড়াদড়িতে বসে মৃদু গলায় কথাবার্তা চালাতে লাগল। সে রাতে বহু লোকেরই আলোচনার বিষয় হল 'নিগ্রো বাচ্চাটা'।

## ৫

দুদিন বাদে যথারীতি সকাল সাতটায় রোগীর ঘরে তার একমাত্র রোগীকে দেখে ডাক্তার সিদ্ধান্ত করল এখন সে যথেষ্ট সুস্থ হয়েছে। ডেকে গিয়ে নাবিকদের সঙ্গে তার খাওয়াদাওয়া চলবে। ডাক্তার বিশেষ করে হাতের ইঙ্গিতে কথাটা ওকে জানাল আর বাচ্চাটাও বুঝে ফেলল চটপট। এখন সে সুস্থ ও দিব্যি ফুর্তিতে আছে, এই সেদিন যে সে মরতে মরতে বেঁচে গেছে সে কথা যেন এর মধ্যেই ভুলে গেছে। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে তেমনি পোষাকেই সে দৌড় মারতে যাচ্ছিল, ইচ্ছে, ডেকের উপর রোদে গিয়ে বসে। কিন্তু তার ছোট্ট কালো শরীরটার উপর চাপান ইয়া লম্বা এক নাবিকের সার্ট ঢিলে থলের মত। ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠল। তার এসিস্‌ট্যাণ্টও মুখ টিপে হাসতে লাগল। ছেলেটা থমকে গেল—হতভম্ব সে। ডাক্তার কেন তার সার্ট ধরে টানছে আর এত হাসছে তাই দেখে অবাক।

তখন সে সার্ট থেকে গলিয়ে রোগীর ঘরের দরজা দিয়ে ন্যাংটো হয়ে ছুট মারতে গেল, কিন্তু এসিস্‌ট্যাণ্ট ওকে আটকে ফেলল। ডাক্তার আবার হাসতে হাসতে বলল:

'নো, নো…'

ছেলেটিকে আবার সার্ট পরবার ইসারা করল সে।

'আমরা ওকে কী পরতে দেব, ফিলিপভ?' বিব্রতভাবে এসিস্‌ট্যাণ্টকে জিজ্ঞেস

করল ডাক্তার। 'আমরা ত এ নিয়ে কখনো মাথা ঘামাইনি ...' এসিস্ট্যাণ্ট বছর তিরিশেকের, বাবু ধরনের, চুল কোঁকড়া।

'না, স্যার। কিন্তু সার্টটাকে যদি হাঁটু পর্যন্ত কেটে ফেলি আর কোমরে একটা বেল্ট লাগাই তা হলে দিব্যি "রেসপেকটিভ" দেখাবে।' জানাল এসিস্ট্যাণ্ট। লোকটা যখন কথায় অলঙ্কার বসাতে চায় বা নাবিকদের কথামত অতিরিক্ত বিজ্ঞোচিত করতে চায় তখন ভুল শব্দ ব্যবহার করার অদ্ভুত অভ্যেস তার।

'"রেসপেকটিভ"? তুমি কী বলতে চাইছ?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করল ডাক্তার।

'যথার্থ রেসপেকটিভ, স্যার। সবাই জানে রেসপেকটিভ মানে কী। সুন্দর আর আরামপ্রদ।' ফিলিপভের কণ্ঠ ক্ষুব্ধ।

'জানি না তুমি যে "রেসপেকটিভ" বলছ তাই হবে কি না। তবে ও যে হাসির পাত্র হবে তা ঠিক। যাই হোক ওর পরবার জন্য একটা কিছু জোগাড় করা দরকার। এর মধ্যে ওর মাপসই একটা কিছু তৈরী করার অনুমতি নেব ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে।'

'ওর জন্য একটা যুৎসই পোষাক বানান মোটেই কঠিন নয়। আমাদের ভেতর ত দর্জির কাজ জানা নাবিকও রয়েছে।'

'বেশ। তাহলে যাও, এর ভেতর তোমার "রেসপেকটিভ" পোষাকটি বানিয়ে আনো।'

এমনি সময় দরজার উপর কে যেন ভদ্রভাবে মৃদু টোকা মারল।

'কে? ভেতরে এসো,' চেঁচিয়ে বলল ডাক্তার।

দরজার সামনে ভেসে উঠল লালচে, ঈষৎ ফোলা একটি মুখ, তাতে কটা রঙের জুল্পী। সন্দেহজনক বেগুনী নাক আর লাল কিন্তু সজীব ও দয়ালু চোখ। পরেই দেখতে পাওয়া গেল ছোটখাট, পেশীবহুল ইভান লুচকিনের সুগঠিত চেহারা। ও হল অগ্রমাস্তুলের নাবিক।

বয়স্ক নাবিক, বছর চল্লিশেক বয়েস, পোনের বছর ধরে কাজ করছে নৌবাহিনীতে। জাহাজে সেরা নাবিক—পারে জঘন্য মাতাল। শোনা যায়, মদ

গেলার জন্য পোষাক বিক্রি করে শুধু অন্তর্বাসে জাহাজে আসে আর পরের দিন অবধারিত শাস্তির জন্য নির্বিকার হয়ে অপেক্ষা করে।

'আমি, স্যার,' খালি, বলিষ্ঠ পা দুটোকে টেনে এগিয়ে আসতে আসতে ভাঙা গলায় বলল সে। আলকাতরা মাখা খসখসে হাত দিয়ে কোনরকমে ট্রাউজারের ভাঁজ ধরে আছে।

অন্য হাতে একটা ছোট্ট পোটলা।

ডাক্তারের দিকে তাকাল সলজ্জ অপরাধীর দৃষ্টিতে। মাতাল বা পাপীদের ভেতর এমনি ভাব প্রায়ই ফুটে ওঠে।

'কী ব্যাপার, লুচকিন? ... অসুস্থ না কি?'

'না, স্যার। নিগ্রো বাচ্চাটার জন্য একটা পোষাক এনেছি ... ওর কিছু নেই দেখে ভাবলাম একটা কিছু তৈরী করি। ওর মাপ নিয়েই এগুলো বানিয়েছি। এসব কি ওকে দেওয়া চলবে, স্যার?'

'নিশ্চয় ভাই, দেবে বই কি ... খুব খুশি হয়েছি আমি,' অবাক হয়ে বলল ডাক্তার। 'আমরা ভাবছিলাম কী দেওয়া যায় ওকে পরতে। তুমি যে আমাদের আগেই ভেবে রেখেছ দেখছি।'

'অবসর সময়ে এটা বানিয়েছি, স্যার,' প্রায় ক্ষমাপ্রার্থীর কণ্ঠে বলল লুচকিন।

এরপর ক্যানভাসে তৈরী একটা নাবিকের পোষাক বার করল পোঁটলা থেকে। ঝাড়া মেরে পোষাক দিল অবাক ছেলেটার হাতে। কণ্ঠ সানন্দ। ডাক্তারের সঙ্গে যেমন সলজ্জভাবে কথা বলছিল তেমন নয়। নিগ্রোটির দিকে চেয়ে সস্নেহে বলল:

'এই যে, মাক্সিমকা! এটা সত্যি "ভেরি গুড" ইউনিফর্ম। এসো, পরো দেখি কেমন ফিট করে তোমাকে।'

ডাক্তার হেসে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওকে মাক্সিমকা বলে ডাকছ কেন?'

'কেন স্যার, ওকে যে আমরা সেণ্ট মাক্সিম দিনে উদ্ধার করেছি। তাই ও হল মাক্সিমকা ... তাছাড়া, ওর ত আর কোন নামও নেই। আমাদেরও ডাকতে হবে একটা কিছু বলে।'

নাবিকের ধবধবে নতুন পোষাক পরে বাচ্চাটা ভারি খুশি। স্পষ্টই এর আগে এমন পোষাক ও কখনো পরেনি।

লুচকিন তার হাতের কাজ বিভিন্ন কোণ থেকে পরীক্ষা করল। সার্টটাকে এখানে একটু টেনে ওখানে একটু সমান করে ভাবল পোষাকটা চমৎকার ফিট করেছে।

'আচ্ছা, এবার তুমি রোদ পোয়াবার জন্য ডেকে যাবে, মাক্সিমকা ... আমি ওকে ওপরে নেব, স্যার?'

মুখে সদাশয় হাসি, ডাক্তার মাথা নেড়ে সায় দিল। ছেলেটার হাত ধরে লুচকিন ওকে সঙ্গে করে ডেকের উপর আনল আর সব নাবিকদের সামনে পরিচয় দিল:

'এই হল মাক্সিমকা! এবার ও আমেরিকান পশুটার কথা ভুলে যাবে। ও বুঝেছে, রুশ নাবিকরা ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে।'

বাচ্চাটার কাঁধে সস্নেহে চাপড় মেরে কোঁকড়া চুল দেখিয়ে বলল:

'তোমার জন্য একটা টুপিও বানাব, ভাই। আর এক জোড়া জুতো। সবকিছু যথাসময়ে।'

একটা কথাও বুঝতে পারল না ছেলেটা, কিন্তু নাবিকদের রোদে-জলে পোড়-খাওয়া মুখে বন্ধুত্বের হাসি দেখে তার ভরসা হল ওরা ওর প্রতি নিষ্ঠুর হবে না। ওদের দিকে চেয়ে সেও হাসল বন্ধুর মত, দেখা গেল চকচকে সাদা দাঁত। নিজের দেশের দক্ষিণা সূর্যের তপ্ত রোদ পোয়াতে লাগল সে।

তখন থেকে ওর নাম হল মাক্সিমকা।

### ৬

নতুন নাবিকের পোষাকে ছেলেটিকে তার জাহাজের সাথীদের কাছে হাজির করে ইভান লুচকিন জানিয়ে দিল সে ওর 'দেখাশুনো' করবে, রাখবে নিজের বিশেষ তত্ত্বাবধানে। বাচ্চাটাকে পোষাক আর নাম দেওয়ার জন্য এটা তার ন্যায্য অধিকার বলে দাবী করল।

এই চর্মসার, অর্ধভুক্ত নিগ্রো বাচ্চা তার জীবনের প্রত্যূষে আমেরিকান

ক্যাপ্টেনের হাতে কতই না নির্যাতন সহ্য করেছে। কী ভাবে ও লুচাকিনের নিঃসঙ্গ হৃদয়ে অস্বাভাবিক সহানুভূতি জাগাল, কেনই বা সে বাচ্চাটার এই জাহাজ-জীবনকে যথাসাধ্য সুখের করতে চাইল—এ নিয়ে একটি কথাও সে বলল না। বিশেষ করে যৌবনে তার নিজের জীবনও খুব মধুর ছিল না। নিছক রুশিদের মত নিজের অনুভূতিকে অপরের কাছে প্রকাশ করতে সে কুণ্ঠা বোধ করে। সম্ভবত এই কারণে নিজের বাসনাকে 'বানর বাচ্চার মত মজার' এই বালকটির 'দেখাশুনো' বলে রূপ দিল। পেত্রোভ নাবিকের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে কঠোরভাবে জানিয়ে দিল কেউ যদি এই 'অনাথ' শিশুকে জ্বালাতে আসে তাকে দেখে নেবার জন্য স্বয়ং ইভান লুচাকিন এগিয়ে আসবে। পেত্রোভের অভ্যাস ছিল 'নতুন ভর্তি-হওয়া' ভীরু অল্পবয়স্ক নাবিকদের জ্বালানো।

'দেখে নেবার জন্য' মানে কী যেন তা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্য সে যোগ করল, 'মনে থাকে যেন। আমি ওর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব। শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর হওয়া সব চেয়ে জঘন্য অপরাধ। কালা ধলা যাই হোক, শিশু শিশুই... ওর প্রতি সদয় হও।' বক্তব্য শেষ করল লুচাকিন।

লুচাকিনের নিজে-থেকে-নেওয়া মাক্সিমকার অভিভাবকত্ব অন্যান্য নাবিকরা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিল। তাদের অনেকের মনেই অবশ্য সন্দেহ ছিল এই কঠিন কাজের ভার সে এঁটে উঠতে পারবে কি না।

ওর মত একটা 'পাঁড় মাতাল' আর লম্পটের পক্ষে কী করে একটা ছেলের দেখাশোনা সম্ভব?

একজন বুড়ো নাবিক ঠাট্টার সুরে বলল:

'তাহলে তুমি দেখছি বাচ্চাটার আয়া হলে।'

'ঠিক বলেছ, আয়া!' অমায়িক হেসে জবাব দিল লুচাকিন। লোকের হাসিঠাট্টাকে সে থোড়াই পরোয়া করে। 'কেন, তোমরা কি ভাবছ আমি এর উপযুক্ত নই? ও ত আর বড়লোকের পোলা নয়! বাচ্চাটার ত লাগবে আর সামান্য কিছু পোষাক। ওকে বানিয়ে দিতে হবে আর একটা স্যুট, জুতো আর টুপি ... ডাক্তার স্টোর থেকে ওকে কিছু কাপড় দিতে চেষ্টা করবে। কেপে যখন ওকে একা ছেড়ে যাব ও যেন আমাদের, রুশ নাবিকদের সম্পর্কে ভাল ধারণা করে। আর যাই হোক,

ওকে ন্যাংটো থাকতে হবে না।'

'তা না হয় হল, কিন্তু ওর সঙ্গে কথা কইবে কী করে? তোমরা যে কেউ কারও কথা বুঝবে না।'

'ও, সে আমরা ঠিক করে নেব।' দুর্জ্জেয় বিশ্বাস নিয়ে বলে লুচকিন। 'কালো হলে কী হয়, ও দিব্যি চালাক ... চটপট আমাদের ভাষা শিখিয়ে নেব ... ঠিক বুঝবে আমার কথা।'

সস্নেহে চাইল ছেলেটির দিকে। উবু হয়ে সে বসে আছে জাহাজের পাশে, দৃষ্টিতে কৌতূহল।

লুচকিনের দরদ-ভরা চাউনি লক্ষ্য করে ছেলেটিও হাসল। তার প্রাণ-খোলা কৃতজ্ঞ হাসির মধ্যে এ কথাই প্রকাশ পেল, ভাষা ছাড়াই সে বুঝতে পেরেছে লুচকিন তার বন্ধু।

সাড়ে এগারটা নাগাদ সকালের সব কাজ শেষ হতে ভদকার আয়োজন হল। দুজন সারেঙ্গ আর আটজন পাতি অফিসার কোয়ার্টার ডেকের মাঝখানে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ভদকা পরিবেশনের সঙ্কেত জানাল। নাবিকরা রসিকতা করে একে বলে 'বুলবুলের সঙ্গীত'।

লুচকিন নিজের মুখের দিকে ইসারা করে খুশির সঙ্গে হাসতে হাসতে মাক্সিমকাকে নিজে ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলল। বাচ্চাটাকে কিছুটা বিব্রত অবস্থায় রেখে দ্রুত চলে গেল কোয়ার্টার ডেকের দিকে।

কিন্তু এ অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকতে হল না তাকে।

ভদকার তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল ডেকের চারদিকে। খসখসে, আলকাতরা-মাখা হাত দিয়ে গোঁফ সমান করতে করতে কোয়ার্টার ডেক থেকে আসতে লাগল নাবিকের দল। তাদের ভিতর সমাহিত গম্ভীর তুষ্টির ভাব। ওর মনে পড়ে গেল কী ভাবে 'বেটসিতে' নাবিকদের সাপ্তাহিক রাম দেওয়া হত, ক্যাপ্টেন কী ভাবে রোজ রোজ এই মদ গিলত—ছেলেটির মতে তা প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশী।

বড় এক গ্লাস ভদকা মেরে ফূর্তিতে ডগমগ হয়ে লুচকিন ফিরে এল মাক্সিমকার কাছে—সানন্দে ওর পিঠ চাপড়াল। নিজের ফূর্তির কিছুটা ভাগ দেবার জন্যে বলল:

'খাসা ভদকা! ভেরি গ্বড, মাক্সিমকা!'

মাক্সিমকা সমঝদারের মত মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল:

'ভেরি গ্বড!'

তার এই দ্রুত বোধশক্তিতে ল্বচাকিন উল্লসিত হয়ে বলে উঠল:

'সাবাস মাক্সিমকা! তুমি দেখছি সবকিছ্বই ব্বঝতে পার... এবার আমাদের ডিনারে যেতে হবে... তোমার খিদে পায়নি?'

কথাটাকে ব্বঝাবার জন্য চোয়ালটাকে উপর নীচ করতে লাগল নাবিক।

ল্বচাকিন যে কী বলতে চাইছে তা বোঝা কষ্টকর নয়, বিশেষ করে বাচ্চাটা যখন দেখতে পাচ্ছে নাবিকদের কেউ কেউ বড় বড় কাঠের গামলা নিয়ে আসছে ডেকে, তার ভেতর থেকে উঠছে বাঁধাকপির স্বপের ক্ষ্বধা-উদ্রেককারী স্বস্বাদ্ব গন্ধ।

মনের ভাব প্রকাশ পায় এমনিভাবে মাথা নাড়ল সে, চোখ দ্বটো আনন্দে চক চক করছে।

'কেন, ও ত সবকিছ্বই ব্বঝতে পারে!' ভাবল ল্বচাকিন। ছেলেটিকে নিজের কথা বোঝাবার ক্ষমতা ওর আছে—এ নিয়ে এর মধ্যেই সে কিছ্বটা গর্ব বোধ করছে। বাচ্চাটার হাত ধরে তাকে ডিনারে নিয়ে চলল ল্বচাকিন।

তেরপল ঢাকা ডেক, তারই ওপর আসন কেটে জনা বার'র এক এক দল বসেছে গোল হয়ে শিচর* বাটির সামনে। এটা তৈরী ক্রনস্টাড্টের টোকো বাঁধাকপি দিয়ে। সাধারণ লোকেরা যেমন করে থাকে, স্বপের মধ্যে র্বটি ভিজিয়ে নিঃশব্দে একান্ত মনযোগের সঙ্গে খাচ্ছে নাবিকরা।

ওদের মাঝখান দিয়ে সন্তর্পণে পথ করে ল্বচাকিন মাক্সিমকাকে নিয়ে চলল নিজের দলে। এটা হল প্রধান ও অগ্রবর্তী মাস্তুলের মাঝখানে। নাবিকরা খাওয়া স্বর্ব করার আগে ওরই জন্য অপেক্ষা করছিল। ল্বচাকিন এদের জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা ভাইসব, মাক্সিমকা কি আমাদের সঙ্গে বসতে পারে?'

'আহা, কী প্রশ্ন! বসে পড় দ্ব'জন,' বলল ব্বড়ো ছ্বতোর মিস্ত্রী জাখারিচ।

---

* শিচ — বাঁধাকপির স্বপ।

'আর কারও হয়ত আপত্তি থাকতে পারে ... তোমরা সবাই কী বল?' লুচকিন আবার জিজ্ঞেস করল।

সবাই রাজী হল নিগ্রো বাচ্চাটি তাদের দলে বসবে, পাশে সরে জায়গা করে দিল ওদের তারা।

'চিন্তা নেই। সবকিছু ও খেয়ে ফেলবে না!' চারদিকে ঠাট্টা তামাসা শোনা গেল।

'শুয়োরের মাংস যথেষ্ট আছে, ওরও হয়ে যাবে।'

'আমরা ত ওর জন্য একখানা চামচও রেডি করে রেখেছি।'

'প্রশ্নটা তুলেছিলাম কারণ ও নিগ্রো আর বিধর্মী,' মাক্সিমকাকে নিয়ে বসতে বসতে বলল লুচকিন। 'কিন্তু আমার বিবেচনায় ঈশ্বরের চোখে সবাই সমান। যার ভাগেরটা সেই খায় ...'

'ঠিক কথা! ঈশ্বর তাঁর সব সন্তানকেই সমান চোখে দেখেন। তিনি লোক-বিচার করেন না, ওর বেলাও তাই। মুখ্যু সোইকিনটাই শুধু বিধর্মীদের নিয়ে বকবক করে!' বলল জাখারিচ।

স্পষ্টই অন্যান্য নাবিকরা জাখারিচের কথায় সায় দিল। এতে অবাক হবার কিছু নেই কারণ যে কোন জাত আর ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গেই ওদের পরিচয় হয়েছে তাদের প্রতিই রুশ নাবিকরা চমৎকার সহিষ্ণুতা দেখিয়েছে।

একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে মাক্সিমকাকে ওরা দলে টেনে নিল। একজন দিল একখানা কাঠের চামচ, আর একজন ভেজানো রুটির টুকরো — সবার চোখেই বন্ধুত্ব ও আশ্বাসের চাউনি। স্বভাবতই সাদা চামড়ার লোকদের কাছে বাচ্চাটা কখনো এরকম সদয় ব্যবহার পায়নি।

'এসো, আরম্ভ করা যাক, নইলে শিচটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে,' বলল জাখারিচ।

ক্রুশচিহ্ন এঁকে নাবিকরা খাওয়া সুরু করল।

'তুমি কেন খাচ্ছ না, মাক্সিমকা?' বাচ্চাটার চামচ দেখিয়ে লুচকিন জিজ্ঞেস করল। 'এটা শিচ — ভেরি গুড সুপ।'

নিগ্রো বাচ্চাটা 'বেটসিতে' সাদা লোকদের সঙ্গে বসে খেতে পায়নি — অন্ধকার কোণে একা একা পাত-কুড়োনো খাবার খেত সে। ছোট্ট চোখ দুটোতে খাবারের উপর লোলুপ দৃষ্টি। জিভে জল এসে গেছে কিন্তু খেতে ভয় পাচ্ছে।

'বেচারা ঘাবড়ে গেছে। সেই ক্যাপ্টেন শুয়ারটা ওকে ভয় দেখিয়ে শেষ করেছে,' ছেলেটার পাশে-বসা জাখারিচ এই বলে ওর কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে নিজের চামচটা ঢুকিয়ে দিল ওর মুখে ...

মাক্সিমকার ভয় গেল ভেঙে। প্রাণভরে খেতে লাগল শিচ, মাংস আর মাখন দিয়ে মিলেট পরিজ।

লুচকিন ঘন ঘন বাহবা দিতে লাগল:

'এই ত চাই, ভেরি গুড ভায়া। খাওদাও আর তাগড়া হও।'

## ৭

দুপুরের খাবার পর সারা জাহাজ জুড়ে বিশ্রাম-নেওয়া নাবিকদের নাক ডাক ছড়িয়ে পড়ল। ঘুমোয়নি শুধু পাহারাদাররা। এ ছাড়া দুএকজন নাবিক অবসরের সুযোগ নিয়ে বুট আর সার্ট সেলাই করছে বা জামা রিপু করছে।

একটানা আয়নবাতাসে 'জাবিয়াকা' এগিয়ে চলেছে স্বচ্ছন্দে। কখনো সখনো ঝড়ের মেঘ যখন ঘনিয়ে ওঠে সে সময় এগিয়ে-আসা প্রবল ঝঞ্ঝা আর মুষলধার বৃষ্টি রুখবার জন্য পাল গুটিয়ে মাস্তুল খালি করে ফেলতে হয় অর্থাৎ সবচাইতে কম অবরোধের ব্যবস্থা করতে হয় — এছাড়া, অন্য সময় পাহারাদারের কিছুই করার থাকে না।

আজকের আকাশ একেবারে পরিষ্কার। কোথাও নেই সেই কুয়াসা-ধূসর ক্ষুদ্র টুকরোটার চিহ্ন যেটা দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত এক বিরাট ঝোড়ো মেঘ হয়ে দাঁড়ায় — ঢেকে ফেলে সূর্য আর দিকচক্রবাল। প্রচণ্ড দমকা বাতাসে জাহাজ দুলতে থাকে, বৃষ্টির ঝাপ্টা ডেকের উপর চাবুক মারে, চামড়া পর্যন্ত ভিজিয়ে ছাড়ে সবাইকে। তারপর ঝড়টা যেমন দ্রুতগতিতে আসে তেমনি দ্রুতগতিতে চলে যায়। একটা হঠাৎ গর্জন আর বর্ষণ — তারপর সবকিছু আবার শান্ত।

সূর্য আবার মাথার উপর জ্বলতে থাকে। ডেক, জাহাজের রসারসি, পাল আর নাবিকদের জামাকাপড় শুকিয়ে যায় চটপট। আবার আদর করা, শান্ত

সমুদ্রের উপর নির্মেঘ নীল আকাশ ভেসে ওঠে। সমস্ত পাল তুলে জাহাজ এগিয়ে চলে নির্বাধ, একটানা আয়নবাতাসে।

জাহাজের বুকে সবকিছুই এখন শান্ত আর চুপচাপ। নাবিকরা 'বিশ্রাম নিচ্ছে'। জরুরী দরকার ছাড়া এ সময় ওদের বিশ্রামের ব্যাঘাত করা হয় না — এটাই বরাবরকার নিয়ম।

লুচাকিন কিন্তু আর সবাইকার মত ঘুমোচ্ছে না, বসে আছে অগ্রমাস্তুলের ছায়ায়। পাহারাদার অবাক, কারণ তাকে সবাই কুম্ভকর্ণ বলে জানে।

নিজের মনে গুণ গুণ করে এক জোড়া ক্যানভাসের জুতো সেলাই করছে সে। মাঝে মাঝে চাইছে মাক্সিমকার দিকে। উদ্দেশ্য, দুপুর বেলা যে মাপটা নিয়েছে তা ঠিক আছে কি না পরখ করা। মাক্সিমকা ওর পাশে হাত পা ছড়িয়ে ডেকের উপর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। নতুন সাদা ট্রাউজারে পা দুটো বেশী কালো দেখাচ্ছে।

মাপটা ঠিকই আছে দেখে সে খুশি হল, পরে ছোট্ট কালো পায়ের দিকে না তাকিয়েই সে কাজ করে চলল।

বয়স্ক পাঁড় মাতাল এই ভেবে পুলকিত হল, বেচারা, ঘরছাড়া অনাথ বালকের জন্য একজোড়া 'চমৎকার' জুতো বানাতে চলেছে সে — ঐ সঙ্গে প্রয়োজনীয় আরও সবকিছু। ইচ্ছে না থাকলেও অতীত জীবনের কথা তার মনে আসতে লাগল — সামনে ফুটে উঠল মাতলামির এক সীমাহীন প্রতিযোগিতা আর তার ফলে বেত খাওয়ার ভয়ঙ্কর চিত্র।

কিছুটা যুক্তির সঙ্গে মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করল, সে যদি এরকম নির্ভীক অনন্য লোক না হত, যে সব ক্যাপ্টেন ও অফিসারদের অধীনে সে কাজ করে তাদের নিজের দুঃসাহসিকতা দিয়ে তাদের খুশি না করতে পারত তাহলে অনেকদিন আগেই তাকে কয়েদী দলের সামিল হতে হত।

'হ্যাঁ, এরই জন্য ওরা আমাকে ছেড়ে দেয়,' জোরে জোরে বলল সে এবং কেন জানি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। 'ওখানেই যত জ্বালা!'

সে যে জাহাজের জঘন্যতম মাতাল, একমাত্র ক্রনস্টাড্ট ছাড়া পারের কাছাকাছি সরাইখানা থেকে বেশী দূরে সে কখনো যায় বলে কেউ জানে না —

এই কারণেই কি 'জ্বালা' শব্দের উল্লেখ করল অথবা সেরা নাবিক হিসেবে তার ক্ষমতার জন্য সে কয়েদী দলের স্বাদ পায়নি — এটা বোঝা গেল না। একটা জিনিষ স্পষ্ট হল যে কোনো রকম একটা 'জ্বালা'র ধারণায় কয়েক মিনিটের জন্য তার গান গেল থেমে, চিন্তায় ডুব দিল সে। শেষ পর্যন্ত বলে উঠল:

'আর মাক্সিমকার লাগবে একটা নাবিকের সার্ট'ও। সার্ট ছাড়া আবার নাবিক কিসের!'

বিশ্রামের সুযোগ নিয়ে লুচকিন মাক্সিমকার জুতোর সোল আর উপরের অংশ কেটে ফেলল, সোল দুটো স্টোর থেকে আনা। একেবারে নতুন চামড়ার। সেদিন সকালে জাহাজের এক সঙ্গীর কাছ থেকে ধারে কেনা। লোকটা হিসেবী, নিজের তৈরী জুতো পরে। লুচকিনের পক্ষে টাকা হাতে রাখা ভারি কষ্টকর, বিশেষ করে পারে গেলে। লুচকিন ব্যবস্থা করল তার হয়ে সারেঙ্গ টাকাটা তার মাইনে থেকে কেটে শোধ করবে।

হুইসিল বাজার সঙ্গে সঙ্গে সারেঙ্গ ভার্সিলি এগোরাভিচের (নাবিকরা ডাকে এগোরিচ বলে) চড়া গলা শোনা যেতে সে ঘুমন্ত ছেলেটাকে জাগাল। ভাবল একমাত্র যাত্রী হলেও তার উচিত বাকি নাবিকদের মত জীবন চালান, নইলে এগোরিচ গোলমাল বাধাতে পারে। এগোরিচকে সে 'ভদ্র' বলেই জানে, 'সঙ্গত কারণ না থাকলে' ঘুঁষি সে চালায় না। কিন্তু মেজাজ বিগড়ালে 'শৃঙ্খলাভঙ্গের' জন্য বাচ্চাটার কানেও ঘুঁষি মারতে পারে। সুতরাং গোড়া থেকেই নিগ্রোটিকে জাহাজের নিয়ম শেখান ভাল।

'উঠবার সময় হয়েছে, মাক্সিমকা,' ছেলেটির কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে মৃদু স্বরে বলল সে।

মাক্সিমকা চোখ মেলে আড়মোড়া ভাঙল। আর সব নাবিকদের ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠল, ভীরু চোখে চাইল লুচকিনের দিকে — কুকুরের মত ভক্তি নিয়ে।

'ভয় পেও না, মাক্সিমকা। কী বোকা তুমি, সব তাতেই কেবল ভয়! এই দেখো, এ দিয়ে তোমার জুতো হবে ...'

মাক্সিমকার পা এবং তার হাতে জুতোর উপরকার ক্যানভাসের অংশ দেখাল সে।

সে যে কী বলছে এ বিষয়ে কোন ধারণাই বাচ্চাটার ছিল না, তবে সে বোধ হয় আঁচ করতে পেরেছিল কথাগুলো আদরের, কারণ প্রাণ খুলে হাসল সে। বিশ্বস্ত অনুচরের মত লুচকিনের পিছু পিছু চলল নাবিকদের ঘরের দিকে। সকৌতূহলে চেয়ে দেখল লুচকিন আধা-তৈরী জুতো জোড়াকে, পোষাক আর লিনেন-ভরা ক্যানভাসের কেসের মধ্যে ঠেসে রাখছে।

তখনও পর্যন্ত লুচকিন কী বলছে বুঝতে না পেরেও সে কিন্তু সানন্দে হেসে লক্ষ্য করল লুচকিন তার টুপি খুলে প্রথমটায় সেদিকে ইসারা করল। তারপর মাক্সিমকার মাথার দিকে দেখিয়ে ধৈর্য ধরে বুঝাবার চেষ্টা করল তারও হবে অমনি একটা টুপি, মাথার উপরটা সাদা আর কিনারা ঘিরে একটা ফিতে।

নিগ্রোটি তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করল সাদা চামড়ার এই লোকগুলি 'বেটসির' লোকদের চাইতে ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, তারা ওর প্রতি সদয়। বিশেষ করে পাট-রঙা-চুল ও লাল নাকওয়ালা এই নাবিকটি (নাক দেখে তার গোল মরিচের কথা মনে পড়ে), তাকে দিয়েছে ঐ আশ্চর্য সুটটি, খেতে দিচ্ছে ভাল ভাল জিনিষ। এমন শান্ত, সস্নেহ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছে যা সে শৈশব থেকে জানতে পায়নি, শুধু ভাসা ভাসা মনে পড়ে কালো এক রমণী এমনি করে তার দিকে তাকাত।

সেই দরদ-ভরা স্নেহময় চোখ দুটি তার স্মরণে আছে, ক্ষীণভাবে জড়িয়ে আছে দীর্ঘ তালগাছ আর কলাপাতা ছাওয়া কুটিরের সঙ্গে। সে অবশ্য জানে না এগুলো স্বপ্ন অথবা শৈশবের স্মৃতি। কিন্তু মাঝে মধ্যে এরা তার স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিত। আর এখন সে সেই দয়া-ভরা স্নেহময় চোখ দেখতে পাচ্ছে, স্বপ্নে নয় — বাস্তবে।

সব মিলিয়ে তার এই জাহাজ জীবন ঠিক সেই সুখের স্বপ্নেরই মত। আগেকার সদা আতঙ্ক ও কষ্টের দিনগুলির চাইতে কতই না পৃথক এরা।

লুচকিন যখন টুপি সম্পর্কে বুঝাবার চেষ্টা ছেড়ে সিন্দুকের গুপ্ত জায়গা থেকে মাক্সিমকাকে এক তাল চিনি এনে দিল সে হয়ে গেল একেবারেই হতভম্ব।

নাবিকের খসখসে সবল হাতখানা নিজের হাতে ধরে ধীরে ধীরে ভীরুর মত সস্নেহে হাত বুলাতে লাগল আর ঐ সঙ্গে মুখে মর্মস্পর্শী কৃতজ্ঞতার ভাব নিয়ে তার দিকে চেয়ে রইল — তার মধ্যে ফুটে উঠল হঠাৎ ভালবাসায় উদ্দীপ্ত হতভাগা প্রাণীর ভাব। এই কৃতজ্ঞতায় তার চোখ-মুখ চকচক করে উঠল, প্রকাশ পেল তার কাঁপা ক্ষীণ কণ্ঠে। আবেগের উত্তাপে, চিনির টুকরোটা মুখে দেবার আগে সে তার মাতৃভাষায় ধরা গলায় কয়েকটা কথা উচ্চারণ করল।

'ওরে, তুমি যে দয়ার কাঙাল। হায়রে বেচারা, জীবনে আদর করে কেউ ত একটা কথাও কয়নি,' তার হেঁড়ে গলা যতটা সম্ভব মোলায়েম করে বলল লুচকিন, টোকা মারল মাক্সিমকার গালে। 'নাও, চিনিটুকু খেয়ে ফেলো, খাসা জিনিষ।'

আর এই ভাবে সেই নাবিকদের ঘরের অন্ধকার এক কোণে একজন অভিজ্ঞ নাবিক আর এই ঘরছাড়া ক্ষুদে নিগ্রো বাচ্চাটার মধ্যে ঘটল ভালবাসার রাখীবন্ধন। মনে হল দুজনা দুজনাকে পেয়ে ভারি খুশি।

'তোমাকে আমাদের রুশ ভাষা শেখাতে হবে, মাক্সিমকা, নইলে তুমি যা বিড় বিড় করে বল তার কিছুই আমরা বুঝব না। কিন্তু এসো, এখন কামানের মহড়ায় ডেকে যেতে হবে। আমরা কী করি তাই দেখবে চলো।'

তারা ডেকের উপর আসতে কামানের মহড়ার ড্রাম বেজে উঠল। মাক্সিমকা একটা মাস্তুলের উপর হেলান দিয়ে রইল পাছে নিজ নিজ জায়গায় ছুটন্ত নাবিকদের ধাক্কা সে সামলাতে না পারে। প্রথমটায় সে ভয় পেয়েছিল কিন্তু কিছুক্ষণের ভেতরেই তার ভয় গেল কেটে। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল নাবিকরা বড় কামানগুলো ছেঁদা থেকে সরিয়ে নিচ্ছে, দ্রুত স্পঞ্জ ঢুকিয়ে দিচ্ছে নলের মধ্যে কামানের ছেঁদা দিয়ে, আবার তাদের বার করে এনে পাশে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সে ভাবল ওরা কামান দাগবে। কিন্তু অবাক হল এই ভেবে কার উপর গোলা ছুঁড়বে, কারণ জাহাজ ত নজরে পড়ছে না। একবার কামানের মুখে পড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার। দ্রুত পালিয়ে-যাওয়া 'বেটসির' পেছন দিকে একটু দূরে কামানের একটা গোলাও পড়েছিল। পুরো পালে বাতাসে ভর দিয়ে 'বেটসি' একটা তিন মাস্তুলওয়ালা জাহাজকে এড়াবার জন্য ছুটে চলেছিল। জীবন্ত পণ্যের মত ক্রীতদাস ঝোঝাই 'বেটসিকে' ঐ জাহাজটি পিছু ধাওয়া করেছিল। নাবিকদের

মুখে আতঙ্কের ভাব লক্ষ্য করেছিল সে, শুনেছিল 'বেটসির' ক্যাপ্টেনের শাপশাপান্ত যতক্ষণ পর্যন্ত পিছু ধাওয়া জাহাজটি পিছনে ছিল। সে অবশ্য বুঝতে পারেনি যে, যে জাহাজটা ওদের উপর গোলা ছুঁড়েছিল সেটা একটা ইংরেজ রণপোত, বিশেষ করে পাঠান হয়েছিল 'দাস-ব্যবসায়ীদের' ধরবার জন্য। এ জন্য 'বেটসি' যখন তার অনুসরণকারীকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসে সেও আর সবার সঙ্গে আনন্দ করেছিল। এই ভাবে নিষ্ঠুর ক্যাপ্টেন তার পাপ ব্যবসার জন্য ফাঁসির হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়।

মাক্সিমকার খুব আশা সত্ত্বেও একটি গোলাও ছোঁড়া হল না। সে অবশ্য অবিরাম ড্রামের শব্দে উল্লসিত হল, চেয়ে দেখল লুচকিন একটা কামানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে কম্যাণ্ডার হিসেবে আর মাঝে মাঝে ওটাকে লক্ষ্য করবার জন্য নীচু হচ্ছে।

কামানের মহড়ায় মাক্সিমকা আনন্দ পেল কিন্তু মহড়া শেষ হতে লুচকিন তাকে যে চা দিল তা খেয়েও সে কম আনন্দ পেল না। প্রথমটায় নাবিকদের পেয়ালা-ভর্তি গরম জলের মত একটা জিনিষ খেতে দেখে সে বরং অবাকই হয়েছিল, তারা চিনি কামড়াচ্ছে আর সেই সঙ্গে তাদের ঘাম ঝরছে প্রচুর। কিন্তু লুচকিন যখন তাকেও একটা পেয়ালা দিল আর সেই সঙ্গে এক তাল চিনি সে দিব্যি মজা পেল, সানন্দে শেষ করল দুটো পেয়ালা।

অপরাহ্নের উত্তাপ যখন কমে এল আর 'মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করা যখন সম্ভব' তখন সেই সন্ধ্যায় লুচকিন ছেলেটিকে যে প্রথম রুশি পাঠ দিল তা যে বিশেষ ফলপ্রদ হল না সে কথা স্বীকার করতেই হবে। তার নাম মাক্সিমকা এবং তার শিক্ষকের নাম লুচকিন — ছাত্রকে এ কথা বুঝাবার জন্য লুচকিনের আয়াস-সাধ্য কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টায় অন্যান্য নাবিকরা কম আমোদ পেল না।

লুচকিন মাষ্টার নয় কিন্তু রুশি ভাষায় ছেলেটার অন্ততঃ একটা ভিত্তি তৈরীর জন্য নাম দিয়ে সুরু করে সে এত বেশী শান্ত ও সহিষ্ণুভাবে চেষ্টা করতে লাগল যাতে মহা পণ্ডিত ব্যক্তিরও হিংসে হতে পারে। পণ্ডিতদেরও কদাচিৎ এত বেশী ঝক্কি পোয়াতে হয়।

উদ্দেশ্য সফল করার জন্য বহু রকমের মৌলিক পন্থা বার করল সে এবং তাদের কাজে লাগাবার জন্য অগ্রসর হল।

প্রথমটায় সে ছেলেটির বুকে আঙুল রেখে বলল, 'মাক্সিমকা,' তারপর নিজেকে দেখিয়ে বলল, 'লুচকিন।' এই প্রক্রিয়া বহুবার করেও যখন কোন ফল পাওয়া গেল না, একটু দূরে সরে গিয়ে সে ডাক দিল, 'মাক্সিমকা!' মাক্সিমকা হাসল কিন্তু তখনও জিনিষটা ধরতে পারল না। অতএব লুচকিন আর একটা ফন্দী আঁটল। সে একজন নাবিককে দিয়ে মাক্সিমকার নাম ধরে ডাকাল এবং তাই করতে সে নিজে বাজিমাৎ করার মত তুষ্টির ভাব নিয়ে ছেলেটির দিকে ইসারা করল। ব্যাপারটাকে আরও বেশী নিশ্চিত করার জন্য ছেলেটির সার্টের কলার ধরে মৃদু নাড়া দিল। বাচ্চাটা শুধু প্রাণভরে হাসতে লাগল, কারণ সে ভাবল ঐ নাড়া দেওয়ার মানে তাকে নাচতে বলা। চট করে লাফিয়ে উঠে এক ফুর্তিবাজ নাচ সুরু করে দিল সে। দর্শক নাবিকদল, এমনকি স্বয়ং লুচকিনও ভারি আনন্দ পেল।

নাচ শেষ করে মাক্সিমকা অনুভব করল, নাবিকরা খুশি হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে ওর পিঠ, কাঁধ, মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে প্রাণভরে হেসে বলতে লাগল:

'সাবাস মাক্সিমকা! চমৎকার!'

ছেলেটিকে তার নাম শেখাবার জন্য লুচকিনের আর আর চেষ্টা কতদূর সফল হত তা বলা মুস্কিল। সে আবার তার পাঠ সুরু করতে যাবে এমন সময় সেখানে এসে হাজির হল সেই ইংরেজি-বলা অফিসার। তার নাম 'বয়' নয় 'মাক্সিমকা' এবং তার বন্ধুর নাম লুচকিন ইংরেজিতে এই কথা বলে সে ব্যাপারটার দিব্যি সমাধান করে দিল।

'এখন সে তোমার দেওয়া নাম বুঝতে পেরেছে!' লুচকিনকে বললে সে।

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, স্যার, সানন্দে বলল লুচকিন। 'আমি সব রকমের চেষ্টাই করেছি ... বাচ্চাটাও বুদ্ধি রাখে, কিন্তু তার নাম কী কিছুতে বুঝতে পারল না।'

'কিন্তু এখন সে ঠিক বুঝতে পেরেছে ... জিজ্ঞেস করে দেখো।'

'মাক্সিমকা!'

ছেলেটি নিজেকে দেখাল।

'খুব ভাল, স্যার। আচ্ছা, লুচকিন কে?' লুচকিন ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল।

মাক্সিমকা লুচকিনকে দেখিয়ে দিল।

ওরা দু'জনেই প্রাণভরে হাসতে লাগল — সেই হাসিতে যোগ দিল বাকি সবাই।

'তোমার বাচ্চা নিগ্রোর এবার লেখাপড়া সুরু হল ...'

এরপর থেকে শিক্ষার কাজ গেল সহজ হয়ে।

লুচকিন বিভিন্ন জিনিষ দেখিয়ে তাদের নাম বলতে লাগল। শব্দগুলির যতটা সর্বনাশ করা সম্ভব তাই করল সে, তার বিশ্বাস এই 'সরলীকৃত' রূপে ওগুলোকে অধিক বিদেশী বলে মনে হবে এবং সে কারণে মনে রাখা সহজতর হবে। সাপারের সময় পর্যন্ত মাক্সিমকা বেশ কিছু শব্দ তার সঙ্গে সঙ্গে বলতে শিখল।

'সাবাস লুচকিন! বেশ এগুচ্ছ। কেপে পৌঁছন পর্যন্ত এভাবে বহু রুশি শব্দ ও শিখে ফেলবে!' নাবিকরা উৎসাহ দিল।

'বাজি রাখতে পারি, ও শিখবেই। কেপে পৌঁছতে এখনও বিশ দিন বাকি, আর মাক্সিমকাও যে-সে ছেলে নয়!'

'মাক্সিমকা' নাম শুনেই সে লুচকিনের দিকে তাকাল।

'ও দিব্যি ওর নাম শিখে ফেলেছে... চলে এসো, বুড়ো। আমরা এবার সাপার খেতে যাব।'

সাপারের পর উপাসনা শেষ হল। নাবিকদের দেওয়া হল রাতের বিছানা। লুচকিন ডেকের উপর নিজের পাশে ছেলেটিকে শোয়াল। মাক্সিমকা কৃতজ্ঞ ও খুশি, শুয়ে পড়ল তার নাবিকের বিছানায়। মাথার নীচে বালিশ, গায়ে দেবার বড় একখানা কম্বল। মেটের কাছ থেকে এগুলি জোগাড় করেছে লুচকিন।

'এবার ঘুমিয়ে পড়ো, মাক্সিমকা! কাল আমাদের ভোরে উঠতে হবে।'

মাক্সিমকার কিন্তু এর ভেতরেই ঘুম এসে গিয়েছিল। ঘুমের ঘোরে একবার সে বলেছিল, 'মাক্সিমকা' আর 'লিউচিক'। বন্ধুর নামকে এ ভাবেই সে উচ্চারণ করে। প্রথম শিক্ষা হিসেবে আদৌ খারাপ নয়।

ঘুমন্ত ছেলেটির উপর লুচকিন ক্রুশচিহ্ন আঁকল এবং কিছু সময়ের ভিতর নিজেও সশব্দে নাক ডাকাতে লাগল।

রাত বারটায় উঠে পাহারা দিতে গেল সে। অগ্রমাস্তুলের নাবিক লেওন্‌তিয়েভের সঙ্গে চড়ল মাস্তুলের মাথায়।

সবকিছু ঠিকঠাক আছে দেখে সেখানে বসে জেগে থাকার জন্য ওরা গপ্প সুরু করল। আলোচনা করতে লাগল ক্রনস্টাড্‌টের ও আগেকার যে সব ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে কাজ করেছে তাদের নিয়ে। এরপর কিছু সময় থাকল চুপচাপ।

'আচ্ছা লেওন্‌তিয়েভ,' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল লুচকিন, 'তুমি কি কখনো ভদকা খাওনি?'

শান্ত, গম্ভীরস্বভাব, পরিশ্রমী লেওন্‌তিয়েভ লুচকিনকে তার নৌবিদ্যার জন্য যেমন প্রশংসা করত তেমনি তাকে ঘেন্না করত মদের প্রতি তার আসক্তির জন্য। জোরের সঙ্গে জবাব দিল সে:

'কখনো না!'

'মানে, কখনো ছুঁয়েও দেখনি?'

'মাঝে মাঝে ছুটিছাটায় এক আধ গ্লাস — কিন্তু ঐ পর্যন্ত।'

'এ জন্যই কি ভদকার রেশনের বদলে তুমি টাকা নাও?'

'টাকা যে অনেক বেশী দরকারী, ইয়ার ... কাজ থেকে বরখাস্তের পর রাশিয়ায় ফিরে গিয়ে টাকা কত কাজে লাগবে বল...'

'সে কথা ঠিক...'

'কিন্তু তুমি ভদকার কথা কেন তুলছ, লুচকিন?'

'কারণ আমার মতে তুমি ভাগ্যবান লোক ...'

লুচকিন খানিকটা চুপ করে থেকে আবার বলল:

'এটা কি সত্যি যে বেশী মদ খাওয়া বন্ধ করার মন্তর আছে?'

'ওরকম শ‌ুনেছি বটে ... আমাদের "কোর্পাচিক"এর একজন পাতি অফিসার একটা লোকের এই দোষ ছাড়িয়েছিল ... সে যাদ‌ু জানত ... "জাবিয়াকাতে"ও এমনি একজন আছে ...'

'কে?'

'ছ‌ুতোর মিস্ত্রী জাখারিচ ... কিন্তু এটা সে গোপন রেখেছে। সবার জন্যই এ কাজ সে করবে না। কিন্তু তোমার মতলব কী, তুমি কি মদ ছেড়ে দিতে চাইছ?' পরিহাসের স‌ুরে জিজ্ঞেস করল লেওন্‌তিয়েভ।

'মদ ছাড়ব কি না জানি না ... কিন্তু মদের জন্য কাপড় চোপড় বেচা ছাড়তে চাই ...'

'অল্পস্বল্প মদ খাবার চেষ্টা করলেই ত পার?'

'চেষ্টা করেছি কিন্তু কোন ফলই হয় না রে ভাই। মদ খাওয়া স‌ুর‌ু করলেই সব ভুলে যাই। মনে হয় এই আমার অদৃষ্ট।'

'অদৃষ্টের সঙ্গে এর কোন যোগই নেই। আসল কথা বিবেচনা বলে তোমার কিছ‌ু নেই,' জোর দিয়ে বলল লেওন্‌তিয়েভ। 'নিজের উপর হাত থাকা চাই ... যাই হোক, জাখারিচের সঙ্গে কথা বলেই দেখো না। হয়ত তোমার জন্য করতেও পারে ... আমার শ‌ুধ‌ু সন্দেহ ওটা তোমার উপর কাজ করবে কি না,' তার কথায় ঠাট্টার স‌ুর।

'আমারও সে কথাই মনে হয়! কোন কিছ‌ুই আমাকে শ‌ুধরাতে পারবে না!' বলেই ল‌ুচকিন কেন জানি হাসল। সন্তুষ্ট হল যেন এই ভেবে যে তাকে কেউ বদলাতে পারবে না।

## ৮

তিন সপ্তাহ কেটে গেল। 'জাবিয়াকা' প্রায় কেপটাউনের কাছে এসে গেছে, কিন্তু বন্দরে ঢুকতে পারল না। একটা কড়া বাতাস বইছিল, নাবিকদের ভাষায় যাকে বলা চলে 'একেবারে দাঁত বরাবর'। কখনো বা ঝড়ের মত প্রচণ্ড হয়ে উঠছে — ফলে জাহাজটির পক্ষে পারে ভেড়া অসম্ভব হল। ঢেউ আর বাতাসের

এত জোর যে জাহাজটাকে বাষ্পে চালাবার চেষ্টাও বৃথাই হত। ওতে শুধু কয়লা নষ্ট।

আবহাওয়া পাল্টাবার জন্য পারের অনতিদূরে 'জাবিয়াকা' উঁচু পাল গুটিয়ে ফুলে-ওঠা সাগরের বুকে প্রচণ্ডভাবে দোল খেতে লাগল।

এইভাবে কেটে গেল ছ'সাত দিন।

শেষ পর্যন্ত বাতাস গেল পড়ে। জাহাজ তার সাদা চোঙার ভিতর দিয়ে ধোঁয়া তুলতে তুলতে ঢুকল কেপটাউন বন্দরে।

নাবিকদের যে কত ফুর্তি তা না বললেও চলে।

কিন্তু এদেরই ভেতর একজন কেপটাউনে যাচ্ছে বলে যে কেবল খুশিই হল না তাই নয়, জাহাজ যতই পারের কাছাকাছি এগুতে লাগল ততই সে বেশী চিন্তাক্লিষ্ট ও বিষণ্ণ বোধ করতে লাগল।

এ হল লুচকিন, মাক্সিমকার সঙ্গে যার ছাড়াছাড়ি হতে চলেছে।

সেই একটি মাস ধরে তার জাহাজী সাথীদের অবাক করে লুচকিন কত যত্নেই না মাক্সিমকার দেখাশুনো করেছে, কত বেশী মায়া পড়েছে ওর উপর আর বাচ্চা নিগ্রোটিও লুচকিনের কম ন্যাওটা হয়নি। এখন ওরা দু'জনা দু'জনের কথা দিব্যি বুঝতে পারে! লুচকিন চমৎকার শিক্ষক হিসেবে নিজের প্রমাণ দিয়েছে আর মাক্সিমকাও ছাত্র হিসেবে সেরা ও বুদ্ধিমান। এখন সে বহু রুশি শব্দ একত্র করে নিজের কথা বলতে পারে। যতই তারা পরস্পরকে ভাল করে বুঝতে শিখল তাদের বন্ধুত্বও ততই ঘনিষ্ঠ হতে লাগল। মাক্সিমকার এখন দু'প্রস্থ পোষাক। এক জোড়া জুতো, একটা টুপি, চামড়ার পেটির উপর একখানা নাবিক ছোরা। দেখা গেল সেও একজন দিব্যি হাসিখুশি ছেলে — নাবিকদের মন কেড়ে নিয়েছে। এমন কি সারেঙ্গ এগোরিচ, 'অপ্রয়োজনীয় যাত্রীদের' যে সহ্য করতে পারে না, সেও ছেলেটির প্রতি প্রসন্ন, কারণ মাক্সিমকা সব সময়েই আর সবার সঙ্গে দাঁড় ধরে টানে এবং জাহাজের কাজে লাগার মত সবকিছু করে যেন তার 'রাহা খরচের' জোগাড় করছে। বানরবাচ্চার মত দ্রুত সে মাস্তুলের ডগায় চড়ে, ঝড়ের সময়ও এতটুকু ভয় পায় না। সব মিলিয়ে সব দিক থেকেই একজন নাবিক হয়ে দাঁড়াল সে।

অত্যন্ত ভদ্র ও সুন্দর স্বভাবের এই বাচ্চাটা অগ্রমাস্তুলের ডেকে নেচে কিংবা তার পরিষ্কার সুরেলা গলায় নিজের দেশের গান গেয়ে নাবিকদের আনন্দ দেয়। সবাই ওকে নিয়ে হৈ চৈ করে। ছোকরা অফিসারের চাকর আরত্যুশ্‌কা অফিসারের টেবিল থেকে ওর জন্য নিয়ে আসে কেক আর অন্যান্য সুখাদ্য।

বলা বাহুল্য সে ছিল লুচকিনের পুরো ভক্ত। যখনই যেখানে সে যায় কুকুরবাচ্চার মত সেও তার পিছু পিছু চলে। তার পাহারার কাজে অংশ নেবার জন্য মাস্তুলের ডগায় ওঠে, বসে পোতাগ্রভাগের পাহারার জায়গাটিতে তারই পাশে। লুচকিন তাকে যে রুশি শব্দ শিখিয়েছে তা বলার প্রাণপণ চেষ্টা করে।

ইতিমধ্যে কেপটাউন বন্দরের খাড়া পাহাড়গুলো এগিয়ে আসতে লাগল। 'জাবিয়াকা' এগিয়ে চলেছে পুরো দমে—দুপুর নাগাদ বন্দরে নোঙর করার আশা।

আশ্চর্য উজ্জ্বল ও রোদ-ভরা সকাল। কিন্তু লুচকিনকে খুশি দেখাচ্ছে না। ভয়ঙ্কর উৎসাহে কামান পালিশ করছে সে। পাশে দাঁড়িয়ে মাক্সিমকা, যেখানে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করছে।

'মাক্সিমকা রে! শীগগিরই আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে। ওরা তোমাকে কেপটাউনে ছেড়ে দেবে। তোমাকে নিয়ে আমরা আর কিই বা করতে পারি বলো?'

ছেলেটা আগে কখনো ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেনি। লুচকিনের কথার বেশী কিছু বুঝতে না পারলেও তার মুখের বিষণ্ণ ভাব দেখে সে আঁচ করল কথাগুলো দুঃখের। তার জীবন্ত, সংবেদনশীল মুখের উপর চিন্তা ও অনুভূতি দ্রুত ফুটে ওঠে। হঠাৎ তার মুখখানা মেঘলা হয়ে গেল, বলে উঠল:

'আমি না বুঝি, লিউচিকা।'

'ওরা তোমাকে পারে ছেড়ে দেবে, ভায়া। জাহাজ করে চলে যাব আমি, কিন্তু মাক্সিমকা পড়ে থাকবে ওখানে।'

আকার ইঙ্গিতে সে তার কথার মানেটা বোঝাবার চেষ্টা করল।

স্পষ্টই ছেলেটা এবার তার কথা বুঝতে পারল, কারণ লুচকিনের হাত ধরে অনুনয়ের সুরে বলল সে:

'আমাকে না পাঠাও পারে... আমি থাকি এখানে... মাক্সিমকা লিউচিকা, লিউচিকা মাক্সিমকা... আমাকে রুশ নাবিক... হ্যাঁ, হ্যাঁ...'

এই কথা শ্বনে ল্বচাকিনের মাথায় এক ব্বদ্ধি খেলে গেল।

'তুমি কি র্বশ নাবিক হতে চাও, মাক্সিমকা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' তার ছোট্ট মাথাটাকে প্রবলভাবে নেড়ে আবার সায় দিল মাক্সিমকা।

'বাঃ। দিব্যি হবে ব্যাপারটা। কই, আমি ত এ কথা আগে ভাবিনি? সব্বাইকে জানাব কথাটা। সারেঙ্গকে দিয়ে পেশ করাব প্রধান অফিসারের কাছে।'

কয়েক মিনিট বাদেই সে কথাটা নিয়ে অগ্রমাস্তুলের কাছে লোকদের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগল:

'শোন ভাইসব! মাক্সিমকা আমাদের ছাড়তে চায় না। নাবিক হিসেবে ওকে জাহাজে রাখবার জন্য এস আমরা অন্বমতি চাই। তোমাদের কী মত?'

প্রস্তাবটাকে নাবিকরা সোৎসাহে সমর্থন জানাল। ল্বচাকিন গেল সারেঙ্গের কাছে, প্রধান অফিসারকে নাবিকদের অন্বরোধ জানাতে বলল:

'দয়া করে আমাদের এই উপকারটুকু করো, এগোরিচ,' বলল সে। 'প্রধান অফিসারকে বলো মাক্সিমকা থাকতে চায়... আর সবকিছ্ব। ওকে একা একা কেপে ফেলে গেলে কী করবে ও? ওখানে হতভাগাটার সর্বনাশ ঘটতে পারে। ওর জন্য কষ্ট পাচ্ছি, এগোরিচ ... বাচ্চাটা এত সৎ আর ভাল, তাই নয় কি?'

'তা ঠিক। আমি বলব এ কথা। মাক্সিমকা ছিমছাম প'্বচকে ছেলে। আমার শ্বধ্ব সন্দেহ র্বশ য্বদ্ধ-জাহাজে একজন নিগ্রোকে রাখতে ক্যাপ্টেন রাজী হবে কি না... যা কিছ্ব গোলমাল ঐখানে...'

'এতে গোলমালের কিছ্ব নেই, এগোরিচ। আমরা ওকে খৃষ্টান করে নিতে পারব।'

'তুমি কী বলতে চাইছ?'

'আমাদের গীর্জায় ও দীক্ষা নেবে—তাহলেই ও র্বশি নিগ্রো হয়ে যাবে, ব্বঝলে?'

কথাটা এগোরিচের ভাল লাগল। নাবিকদের অন্বরোধ সঙ্গে সঙ্গে সে প্রধান অফিসারকে জানাবে বলল।

প্রধান অফিসার সারেঙ্গের রিপোর্ট শ্বনে মন্তব্য করল:

'মনে হচ্ছে এর পিছনে ল্বচাকিন আছে।'

'শুধু লুচকিন নয়, স্যার। সব নাবিকরাই এই অনুরোধ জানাচ্ছে... ওকে যদি আমরা পারে ছেড়ে যাই কী হবে ওর? সবাই ওর জন্য কষ্ট পাচ্ছে... যদি মত করেন ত ওকে আমরা কেবিন বয় বানাতে পারি, স্যার। ছেলেটা কাজের। দীক্ষা দিলে ও মুক্তি পাবে...'

প্রধান অফিসার কথা দিলেন বিষয়টা ক্যাপ্টেনকে জানাবেন।

নিশান তোলার সময় ডেকে আসতে ক্যাপ্টেনকে তিনি কথাটা পাড়লেন।

প্রথমটায় ক্যাপ্টেন চাইলেন প্রস্তাবটাকে সরাসরি বাতিল করতে কিন্তু বিষয়টা ভেবে (এবং সম্ভবত বাড়িতে নিজের ছেলেদের কথা মনে করে) মতটা পাল্টে বললেন:

'বেশ। থাকতে পারে ও। আমরা ওকে কেবিন বয় বানাব... ক্রনস্টাড্টে ফিরে ওর বিষয়ে কিছু করা যাবে ... সত্যিই ত, কেন ওকে পারে ছেড়ে যাব, বিশেষ করে ওর যখন থাকার ইচ্ছে!... লুচকিনই ওর শিক্ষকের কাজ চালিয়ে যাক... সত্যি অদ্ভুত — ওর মত একটা মাতাল কিন্তু বাচ্চাটার উপর কী টান... ডাক্তার আমাকে বলেছে ওর সব পোষাকই লুচকিন তৈরী করেছে।'

মাক্সিমকাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে, অগ্রমাস্তুলের পুরোবর্তী ডেকে খবরটা পেঁছতে মহা উল্লাস দেখা দিল। সবচাইতে খুশি হল অবশ্য লুচকিন ও মাক্সিমকা।

বেলা একটায় জাহাজটি কেপটাউনে নোঙর করল। পরের দিন সকালে প্রথম পাহারাদলের লোকদের পারে যাওয়ার ছুটি দেওয়া হল। এর ভিতর ছিল লুচকিন ও মাক্সিমকা।

'দেখো, মদের জন্য মাক্সিমকাকে যেন বিক্রি করে বসো না।' জাহাজ ছাড়তে ছাড়তে হেসে বলল এগোরিচ।

ঠাট্টাটা মর্মে গিয়ে লাগল, কারণ লুচকিন জবাব দিল:

'কে বলতে পারে, হয়ত মাক্সিমকার জন্যই আজ রাতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসব!'

সে রাতে যথারীতি পাঁড় মাতাল হলেও সবাইকে অবাক করে সে পোষাক সমেত জাহাজে ফিরল। পরে জানা গেল এর মূলে ছিল মাক্সিমকা। বন্ধুকে অত বেশী মদ খেতে দেখে সে পাশের সরাইয়ে ছুটে গিয়ে কয়েকজন রুশ নাবিককে ডেকে আনে। লুচকিনকে তুলে তারা নৌকোয় নিয়ে আসে। মাক্সিমকা সব সময়েই ছিল তার পাশে পাশে।

মাতাল অবস্থায় সারা পথ লুচকিন বিড় বিড় করতে থাকে:

'মাক্সিমকা কই? মাক্সিমকাকে নিয়ে এসো আমার কাছে… মদের জন্য আমি তাকে বেচিনি ভাই… ও আমার সবচাইতে বড় বন্ধু… কই মাক্সিমকা?'

পরে মাক্সিমকাকে তার পাশে দেখতে পেয়ে সে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

হপ্তাখানেক বাদে 'জাবিয়াকা' উত্তমাশা অন্তরীপ ছেড়ে গেল। কিছুদিন বাদেই মাক্সিমকাকে গাম্ভীর্যের সঙ্গে দীক্ষা দেওয়া হল। আবার তার নামকরণ করা হল মাক্সিমকা। জাহাজের নামমত গোত্রনাম হল জাবিয়াকিন।

তিন বছর বাদে, চৌদ্দ বছরের সমর্থ ছেলে হিসেবে 'জাবিয়াকাতে' করে ক্রনস্টাড্‌টে ফিরে এল সে। তাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য অফিসার পেতিয়া যে কষ্ট করেছিল তা সার্থক হল।

ক্যাপ্টেন তার কথা রাখল। ক্রনস্টাড্‌টে ডাক্তারের এসিস্‌ট্যান্ট শিক্ষা সংক্রান্ত স্কুলে ভর্তি করে দিল তাকে। নৌবাহিনী থেকে ছাড়া-পাওয়া লুচকিনও ক্রনস্টাড্‌টেই বসবাস করতে লাগল — উদ্দেশ্য তার আদরের ধনটির কাছাকাছি থাকা। মাক্সিমকার মঙ্গলের জন্য সে মনপ্রাণ ঢেলে দিল। মাক্সিমকাকেও ধন্যবাদ— মদ খাওয়ার জন্য পোষাক বিক্রি বন্ধ করছে লুচকিন, মদ খেতে শিখেছে 'মাত্রা রেখে'।

## ১

ক্রোনস্টাড্‌ট ডকে বসন্তের এক সকালে, গ্রীষ্মে সমুদ্র সফরের জন্য জাহাজের গোছগাছ করার কাজ যখন সেই ভোর থেকে পুরোদমে চলেছে, তখন ক্যাপ্টেন লুর্জাগিনের রাঁধুনী ইভান ককোরিন তাঁর ছোট্ট ফ্ল্যাটের খাবার ঘরে ঢুকল। নাবিকের পোষাকের উপর সদ্য-পরা চর্বিমাখা ফ্রক কোটটাকে সমান করতে করতে নরম মিষ্টি গলায় জানাল:

'নতুন চাকর এসেছে, মাদাম। মাষ্টার ওকে নৌদপ্তর থেকে পাঠিয়েছেন।'

ক্যাপ্টেনের বৌ তরুণী, সুশ্রী সোনালী চুল, টানা ধূসর চোখ, সামোভারের পাশে বসে কফি খাচ্ছে। পরনে হাল্কা নীল ড্রেসিং গাউন, পুঁটলি বাঁধা অগোছাল

চুলের উপর একটা ছোট্ট সুন্দর টুপি। পাশে উ'চু চেয়ারে বসে সাত আট বছরের একটি ছেলে— ছোট্ট কালো চোখ, গায়ে সোনালী কাজ করা লাল সার্ট। দুধে চুমুক দিচ্ছে আর পা নাড়ছে—খাওয়ায় আগ্রহ নেই। রমণীর পিছনে বাচ্চা কোলে দাঁড়িয়ে কম-বয়েসী রোগা ভীরু চেহারার একটি মেয়ে। পা খালি, মলিন তুলোর পোষাক-পরা। এ হল মাদাম লুর্জাগিনার বিয়ের যৌতুক হিসেবে পাওয়া ক্রীতদাসী আন্যুৎকা (তখন ছিল একেবারেই ছোট)।

'ইভান, লোকটা কে জান কি?' তার দিকে চেয়ে কর্ত্রী জিজ্ঞেস করল।

'না, মাদাম।'

'দেখতে কেমন?'

'এক্কেবারে সাধারণ নাবিক, মাদাম। ভদ্রতার নামগন্ধ নেই!' ইভান ঘেন্নায় তার মোটা মাংসল ঠোঁট বাঁকাল।

তার নিজের চেহারাতে অবশ্য নাবিকোচিত কিছুই নেই। বছর প'য়ত্রিশ বয়েস। মসৃণ ও পাটল মাংসল শরীর তেলতেলে, লালচে চুল, ছুলিওয়ালা মুখ পরিষ্কার কামান। চোখ দুটো বোতামের মত ক্ষুদে। ভদ্দর লোকের সঙ্গে বসবাসকারী পেশাদার চাকরের চতুর চালচলন ছিল ওর ভেতর।

নৌবাহিনীতে যেদিন থেকে সে ভর্তি হয়েছে সেদিন থেকে সে অফিসারের চাকর, কখনো সাগর দেখেনি।

আজ তিন বছর ধরে সে লুর্জাগিনদের কাজ করছে। মাদাম লুর্জাগিনার স্বভাব কড়া হওয়া সত্ত্বেও তাকে সে খুশি করতে পেরেছে।

'দেখতে কি মাতালদের মত?' মাদাম লুর্জাগিনা জিজ্ঞেস করতে থাকে। মাতাল চাকরদের নিয়ে তার আতঙ্ক।

'সে রকম নয় দেখতে কিন্তু কে বলতে পারে? তা আপনি কি নিজে ওকে দেখে জিজ্ঞেসবাদ করবেন না, মাদাম?'

'আচ্ছা, তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।' আন্যুৎকার দিকে প্রেমকটাক্ষ হেনে ইভান বেরিয়ে গেল।

আনুৎকা ভ্রু কোঁচকাল।

## ২

দোর গোড়ায় হাজির হল খাটো বলিষ্ঠ-গড়ন, কালো চেহারার এক নাবিক। এক কানে একটা পিতলের আংটি। দেখতে বছর পঞ্চাশের মত! কষে বোতাম-আঁটা ইউনিফর্ম-পরা, শক্ত কলার কেটে বসেছে তার লাল বাদামী গলার দু'পাশে। হাবভাবটা বিশ্রী, অপ্রস্তুত।

সাবধানে ঘরে ঢুকে সতর্ক হয়ে দাঁড়াল, নাবিকরা যেমন করে দাঁড়ায় অফিসারের সামনে। নিশ্চল চেয়ে রইল মাদামের দিকে। চওড়া, লোমশ, গ্রন্থিল ও আলকাতরার দাগওয়ালা হাত ট্রাউজারের উপর চাপা।

ডান হাতে দুটো আঙুল নেই। এই ময়লা রঙের নাবিকটির কুৎসিত, ছুলিওয়ালা ইঁট-রঙা মুখে কালো গোঁফ ও জুলপীর জঙ্গল, লোমছাওয়া চওড়া ভ্রূ—সবকিছু মিলে চেহারাটা একটু রাগাটে। এই কালো লোকটাকে দেখে স্পষ্টতঃই মাদাম লুজগিনার খারাপ ধারণা হল।

'ভার্সিলি কি এর চাইতে ভাল কিছু জোগাড় করতে পারল না!' মনে মনে স্বামীকে বিশ্রী পছন্দের জন্য ধমকাল সে।

সামনে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা নাবিকটিকে আবার চেয়ে দেখল, লক্ষ্য করল তার ঈষৎ বাঁকা পা আর ভালুকের মতো প্রকাণ্ড পায়ের পাতা। ডান হাতে দুটো আঙুল নেই। সবকিছু ছাড়িয়ে তার চওড়া মাংসল নাকটার লালচে রঙ মনে জাগাল ঘোরতম সন্দেহ।

'সুপ্রভাত!' শেষ পর্যন্ত শুকনো গলায় বলল সে — আয়ত ধূসর চোখ দুটো কঠোর হয়ে উঠল।

'সুপ্রভাত, রাণী মা!' ঘরের ছোট্ট চৌহদ্দির মধ্যে বেমানান, গভীর খাদ কণ্ঠে গর্জন করে উঠল নবাগত।

'চেঁচিও না!' বাচ্চাটাকে চমকে দিয়েছে কি না দেখার জন্য পেছনে তাকিয়ে বলল মাদাম লুজগিনা। 'তুমি এখন রাস্তায় নও। আস্তে কথা বল।'

'হ্যাঁ, রাণী মা,' অনেকটা গলা নাবিয়ে বলল সে।

'আমি বলছি আস্তে বলতে। তুমি কি স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শেখনি?'

'আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব রাণী মা,' নীচু, বিচলিত গলায় জানাল নাবিক। সে বুঝে ফেলল তার ভাবী কর্ত্রীটি 'কটুভাষিণী'।

'তোমার নাম কী?'

'ফেদোস, রাণী মা!'

যেন দাঁতের ব্যথায় কুঁচকে কর্ত্রী বলল, 'কী বিশ্রী নাম! আর তোমার গোত্রনাম?'

'চিজিক!'

'কি বললে?'

'চিজিক ... ফেদোস চিজিক*!'

তার চেহারার সঙ্গে নামটা এমন বেমানান যে মাদাম লুজগিনা আর ছেলেটি হেসে উঠল। (ছেলেটি অনেক আগেই দুধ খাওয়া বন্ধ করে এক জোড়া কৌতূহলী, ভয়-পাওয়া চোখে নতুন লোমশ মানুষটাকে দেখছিল) আন্যুৎকাও মুখ টিপে হাসতে লাগল।

ফেদোস চিজিকের অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখখানা অত্যন্ত সদাশয় হাসিতে নরম হয়ে এল। তাতে এটাই প্রমাণ হল যে সেও তার নামটাকে একটা রসিকতা বলে মনে করে।

ছেলেটি হাসিটা লক্ষ্য করল। এই হাসি তার কঠোর ভাবভঙ্গীকে একেবারে বদলে দিল। লোকটার কালো কোঁচকান ভ্রূ আর গোঁফ এবং জুলপীর ভয় চলে গেল তার মন থেকে। হঠাৎ ওর মনে হল নাবিকটি লোক ভাল, ওকে তার মনে ধরেছে। এমনকি লোকটার সঙ্গে যে আলকাতরার গন্ধটা মিশে আছে তাও যেন কেমন মিষ্টি ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। মাকে জানাল:

'চিজিককে রেখে দাও, মা!'

'চুপ কর!' ধমক দিল মাদাম লুজগিনা।

কড়া ভাব নিয়ে প্রশ্ন চালাতে লাগল:

'এর আগে কোথায় চাকরের কাজ করেছ?'

---

* চিজিক — এক ধরনের পাখি।

'আগে কখনো চাকরের কাজ করিনি, রাণী মা।'

'এ্যকেবারেই না?'

'না, রাণী মা। কখখনো না। সব সময়েই ছিলেম নৌ-বাহিনীতে। পুরোদস্তুর নাবিক, রাণী মা।'

'আমাকে রাণী মা বলা বন্ধ কর। এটা হাস্যকর। আমাকে মাদাম বলবে।'

'হ্যাঁ, রাণী ... ক্ষমা করবেন, মাদাম।'

'তুমি কি আর্দালীর কাজও করনি কখনো?'

'না মাদাম, কখখনো না।'

'তাহলে এখন চাকরের কাজ দিচ্ছে কেন?'

'আমার আঙুলের জন্য, মাদাম,' তার ডান হাতে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী নেই। সেদিকে তাকিয়ে জানাল ফেদোস। 'গত গ্রীষ্মে 'কোর্পাচকে' মাস্তুলের দড়িতে কাটা গেছে।'

'আমার স্বামী তাহলে তোমাকে জানেন, কি বল?'

'হ্যাঁ, মাদাম। 'কোর্পাচকে' তাঁর কাছে তিন বছর কাজ করেছি।'

এই খবরে মাদাম লুর্জাগিনা কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করল। গলাটা একটু নরম করে জিজ্ঞেস করল:

'ভদকা খাও না কি?'

'হ্যাঁ, মাদাম,' চিজিক স্বীকার করল।

'তা ... খুব বেশী খাও কি?'

'অল্প স্বল্প, মাদাম।'

মাদাম লুর্জাগিনা সন্দেহভরে মাথা নাড়ল:

'তাহলে তোমার নাক এত লাল কেন?'

'ওটা বরাবরই ও রকম, মাদাম।'

'ভদকার জন্য নয়?'

'তা হবার কথা নয়। এমনকি ছুটি ছাটায় মদ খেলেও আমার নেশা হয় না।'

'অফিসারের চাকরের মদ খাওয়া কিছুতেই চলবে না... এক ফোঁটাও না... মাতাল আমি সইতে পারিনে। বুঝলে?' হুকুমের সুরে জানাল মাদাম লুর্জাগিনা।

ফেদোস অবাক হয়ে মহিলার দিকে চাইল। প্রশ্নের একটা জবাব চাই, তাই বলল:

'হ্যাঁ, মাদাম।'

'বেশ! আমি যা বললাম মনে থাকে যেন।'

ফেদোস বুদ্ধিমানের মত চুপ করে রইল।

'তোমাকে কী কী কাজ করতে হবে, আমার স্বামী কি বলে দিয়েছেন?'

'না মাদাম। তিনি শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।'

'তোমাকে এই ছেলের দেখাশুনো করতে হবে,' বাচ্চাটাকে দেখিয়ে বলল মাদাম লুর্জাগিনা। 'এর ভার তোমার ওপর।'

ফেদোস ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বন্ধুর মত হাসল, ছেলেটিও হেসে ফেলল।

মাদাম লুর্জাগিনা তার কাজের ফিরিস্তি দিতে লাগল।

বাচ্চাকে তুলতে হবে সকাল আটটায়, পোষাক পরাতে হবে, দিনভর থাকতে হবে ওরই সঙ্গে, রাখতে হবে চোখের মণির মত, নিয়ে যেতে হবে বেড়াতে আর অবসর সময়ে ওর কাপড়জামা কাচতে হবে...

'কাপড় কাচতে জান?'

'আমরা নাবিকরা ত সব সময়েই নিজেদের জামাকাপড় কেচে থাকি!' বলল ফেদোস। ভাবল মাদাম লুর্জাগিনা এতখানি বোকা বলেই এরকম প্রশ্ন করল।

'পরে তোমার কাজকর্ম সম্পর্কে আরও ভাল করে জানাব। এবার বল দেখি, তোমার কাছ থেকে কী কী চাইছি তা বুঝলে?'

নাবিকের মুখের উপর একটা হাসির আভা খেলে গেল। 'যে কোন লোকই এটা বুঝতে পারে,' যেন এই কথাই বলতে চাইল সে।

জবাবে জানাল, 'হ্যাঁ মাদাম, বুঝেছি।' যে গুরুগম্ভীরভাবে মহিলাটি তার সঙ্গে কথা কইছিল আর তার 'ব্যাখ্যার' যে বাহুল্য তাতে সে কিছুটা হতাশ বোধ করল, ভাবল, নিতান্ত মুখ্যু বলেই অনর্থক বকবক করল সে।

'বাচ্চাদের তোমার ভাল লাগে?...'

'নিশ্চয়ই, মাদাম। কে না ওদের ভালবাসে!'

'আচ্ছা, এখন রান্নাঘরে যাও। আমার স্বামী ফিরে আসা অবধি সেখানেই অপেক্ষা কর... তোমাকে রাখব কি রাখব না তখন সঠিক জানাব।'

উপরওয়ালার কাছে তার স্থান ও কর্তব্য কী বুদ্ধিমান নাবিক হিসেবে তা তার জানা ছিল। ফেদোস চট করে বাঁদিকে মোড় ঘুরে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, উঠোনে গেল পাইপ খেতে।

## ৩

'আচ্ছা শুরা, আমার মনে হচ্ছে তোমার এই চাষাড়ে লোকটাকে ভাল লেগেছে?'

'হ্যাঁ, মা। ওকে রেখে দাও।'

'প্রথমেই তোমার বাবার কাছ থেকে জানতে হবে ও মাতাল কি না।'

'কিন্তু চিজিক যে তোমায় বলল ও মাতাল নয়।'

'ও যা বলেছে তা বিশ্বাস করা চলে না।'

'কেন?'

'ও ত একটা নাবিক... একটা চাষা ... মিথ্যে বলতে ওদের বাধে না।'

'ও কি গপ্প জানে ? আমার সঙ্গে খেলবে ত?'

'মনে হচ্ছে জানে। আর তোমার সঙ্গে খেলা ত ওকে করতেই হবে...'

'কিন্তু আন্তোন ত জানত না। আমার সঙ্গে কখনো খেলত না।'

'আন্তোন ছিল আলসে, মাতাল আর অপদার্থ!'

'এ জন্যই কি তুমি ওকে দপ্তরে পাঠাতে মা?'

'হ্যাঁ।'

'আর ওরা বুঝি ওখানে ওকে চাবুক লাগাত?'

'হ্যাঁ, সোনা। ওকে ভাল করার জন্য।'

'ফিরে এলে সব সময়েই ওকে দেখতাম মনমরা। আমার সঙ্গে কথাও কইত না।'

'এতেই বোঝা যায় লোকটা ছিল হাড় পাজি। পিটুনি খেয়েও এতটুকু উন্নতি হয়নি।'

'আন্তোন এখন কোথায় মা?'

'জানিনে...'

ছেলেটি চুপ করে ভাবতে লাগল। শেষটায় গম্ভীর হয়ে বলল:

'চিজিককে চাবুক খেতে পাঠিও না মা, আন্তোনকে যেমন পাঠাতে। ওকে পাঠালে আমাকে আর গপ্প বলবে না আর গালমন্দ করবে আন্তোনের মত...'

'তোমাকে গালমন্দ করার আস্পর্ধা ছিল তার?'

'সে বলত আমি স্বয়ং শয়তানের সাকরেদ... এটা কি নোংরা কথা?'

'উঃ, কী শয়তান!.. আগে আমায় বলনি কেন?'

'বললে তুমি ওকে চাবুক খেতে পাঠাতে আর আমি ওর জন্য দুঃখ পেতাম...'

'ওরকম লোকের জন্য দুঃখ পেতে নেই... তাছাড়া, মায়ের কাছ থেকে কিছু লুকোবে না, শুরা।'

আন্তোনের নাম উঠতে দাসী আন্যুৎকার একটা চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে এল।

সেই জোয়ান, বেপরোয়া, কোঁকড়া-চুল নাবিক মদ খেতে কী ভালই না বাসত! মাতাল হয়ে কী রকম অহংকারী আর উদ্ধত হয়েই না উঠত সে! তাদের সঙ্গে যে দু'মাস সে কাটিয়েছে তাতে তার মনে রেখে গেছে মধুরতম স্মৃতি।

আন্তোনকে সে ভালবাসত। ক্যাপ্টেন যখন তার বৌয়ের নাছোড়বান্দা অনুরোধে প্রায়ই ওকে দপ্তরে পাঠাত চাবুক খেতে, সে যে অনেক চোখের জল ফেলেছে! কখনো ভুলবে না কী সুন্দর বালালাইকা বাজাত আর গান গাইত সে। কী সাহসী ছিল তার দৃষ্টি আর কী নির্ভীক! বিশেষ করে মদ খাওয়ার সময় সে এমনকি মাদাম লুর্জাগিনাকেও পরোয়া করত না! ব্যর্থ প্রেমের কথা ভেবে তার ভালবাসাকে সে গোপন রাখত কারণ আন্তোন কখনো ওর দিকে এতটুকু নজরও দেয়নি। অবসর সময় সে কাটাত পাশের বাড়ির চাকরাণীর পিছনে ঘুর ঘুর করে।

ওই যে নীচ-মনা, লালচে চুল ইভান, যার কাজ অপরের গোপন কথা রটিয়ে বেড়ান, তাকে প্রেম জানিয়ে কী জ্বালাতনটাই না সে করছে। এর চাইতে আন্তোন ছিল কত বেশী মিষ্টি। এই জঘন্য বদমায়েসটার নিজের উপরেও উঁচু ধারণা। ওর প্রেম নিবেদনের হাত এড়িয়ে রান্নাঘরে ঢোকারও সাধ্যি নেই তার।

এমন সময় কোলের বাচ্চাটা জেগে উঠে কাঁদতে লাগল।

আন্যুৎকা ঘরের ভেতর দ্রুত পায়চারি সুরু করল। হাতের উপর রেখে দোল দিতে দিতে পরিষ্কার মিষ্টি গলায় গান গাইতে লাগল।

বাচ্চাটা কিন্তু কান্না বন্ধ করল না। আন্যুৎকা ভীরু চোখে কর্ত্রীর দিকে চাইল।

'বাচ্চাকে আমার কাছে দে! তুই একেবারেই রাখতে জানিস না!' বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল মাদাম লুজগিনা। মোটা মাংসল হাতে ড্রেসিং গাউনের বুকের কাছটা খুলে ফেলল।

মায়ের বুকে শুয়ে বাচ্চাটা সঙ্গে সঙ্গে কান্না বন্ধ করল, হাম হাম করে খেতে লাগল দুধ, জল-ভরা চোখে আনন্দের চাউনি।

'টেবিল সাফ কর্। দেখিস কিছু ভাঙিস্‌নে যেন।'

আন্যুৎকা ছুটে গেল টেবিলের দিকে। ভীরু প্রাণীর মতো ব্যস্তসমস্তভাবে কফির পাত্র সরাতে লাগল সে।

## ৪

বারটা বাজার একটু বাদেই নৌ-ঘাটিতে লাঞ্চের ছুটি হল। ওখানে 'কোর্পচিকের' গোছগাছ চলছিল। বলিষ্ঠ-গড়ন, সম্ভ্রান্ত চেহারার ভাসিলি মিখাইলভিচ লুজগিন ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে বাড়ি ফিরল। বছর চল্লিশেক বয়েস, টাক মাথা, ভুঁড়িদার।

যখন সে বাড়ি পৌঁছল টেবিলে লাঞ্চ সাজান।

ক্যাপ্টেন তার বৌ আর ছেলেকে আবেগভরে চুমো খেল। তাড়াতাড়ি খাবার হিসেবে লবণ-দেওয়া হেরিংমাছের সঙ্গে দু'গ্লাস ভদকা গিলল। তারপর অভুক্ত

মানুষের মতো গো-মাংসের কোপ্তায় কামড় লাগাল। এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়! ভোর পাঁচটা থেকে পেটে পড়েছে শুধু গ্লাস দুয়েক চা — আর কিছুই না।

পেট ভরতে ছিমছাম পোষাক-পরা সুন্দরী বৌয়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল:

'আচ্ছা মারুসিয়া, নতুন চাকরটিকে কেমন লাগল?'

'ওরকম লোক সম্পর্কে আমার কী ধারণা হতে পারে বলে তুমি মনে কর?'

ভাসিলি মিখাইলভিচের ঈষৎ কালো, সদাশয় চোখ দুটো মুহূর্তের জন্য বিমর্ষ দেখাল।

'একটা অভদ্র, চাষাড়ে লোক... দেখেই বলা যায় জীবনে কখনো চাকরের কাজ করেনি।'

'তা ঠিক কিন্তু লোকটা সৎ আর বিশ্বাসী। আমি ত ওকে জানি।'

'আর ওর ওই সন্দেহজনক নাকটা ... ব্যাটা মদখোর, কোন ভুল নেই!' মাদাম লুজগিনা বলে চলল।

'দু'এক গ্লাস খায় বটে, কিন্তু মাতাল নয়। হলফ করে বলতে পারি, মারুসিয়া,' শান্ত ও সতর্কভাবে জানাল ক্যাপ্টেন।

কিন্তু তার স্ত্রী অন্য কোন মতামত সহ্য করে না। সেটাকে মারাত্মক অপমান বলে মনে করে, এ কথা জানে বলে ক্যাপ্টেন চটপট যোগ করল:

'ওগো, যেমনটি তুমি চাও। একে পছন্দ না হলে আর কাউকে খুঁজে আনব।'

'তার মানে আরও দেরী। এদিকে শুরাকে দেখবারও লোক নেই ... না, ও লোকটাই থাক... দেখা যাক তোমার এই রত্নটি কেমন — তোমার এই চিজিক চিজটি!'

'নামটা অবিশ্যি মজার!' ক্যাপ্টেন হাসল।

'আর ওর ক্রিশ্চান নামটাও তাই ... খাঁটি চাষাড়ে নাম — ফেদোস!'

'ইচ্ছে করলে অন্য নামে ডাকতে পার, সোনা... কিন্তু সত্যি বলতে কি, মারুসিয়া, ওকে রাখলে তুমি অনুশোচনা করবে না... লোকটা সৎ আর

বিবেচক... কী চমৎকার নাবিকই না ছিল ও... কিন্তু যা তোমার মর্জি। যা তুমি বলবে তাই ত আইন...'

যা ইচ্ছে তাই করবে, এ কথা বলে স্বামীর কাছ থেকে আশ্বাস পাবার কোন প্রয়োজনই ছিল না মারিয়া ইভানভনার। সরল, সাদাসিধে ভার্সিলি মিখাইলভিচ সুন্দরী তরুণী স্ত্রীর একেবারে হাতের মুঠোয়। দশবছর ধরে একসঙ্গে ঘর করছে। স্ত্রীকে অমান্য করার কথা সে কখনো ভাবতেও পারেনি।

তবু মারুসিয়া বলা দরকার মনে করল:

'তোমার এই চিজিককে আমার পছন্দ নয়, কিন্তু তুমি যখন চাইছ তখন ও থাকুক।'

'কিন্তু কেন মারুসিয়া? তোমার যদি ওকে পছন্দ না হয়...'

'ও থাকবে!' মারিয়া ইভানভনা পাকাপাকি জানিয়ে দিল।

সুতরাং ক্যাপ্টেন লুর্জাগিনের যা করা দরকার ছিল তা হল তার ইচ্ছার প্রতি নিষ্ঠা দেখাবার জন্য স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞভাবে হাসা। চিজিক তার নার্স হবে জেনে শুরারও ভারি আহ্লাদ হল।

নতুন চাকরটিকে আবার খাবারঘরে ডাকা হল। আগের মত সতর্ক হয়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল সে। মাদাম লুর্জাগিনার ঘোষণা শুনল কাজে সে বহাল হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কোন উৎসাহ দেখাল না।

মাদাম জানিয়ে দিল পরের দিন সকালে সে যেন নিজের জিনিষপত্তর নিয়ে আসে, থাকবে রাঁধুনী ইভানের ঘরে।

'আর আজ বিকেলে স্নানের ঘরে গিয়ে তোমার হাতের ঐ কালো দাগটা তুলে আসবে,' তার খসখসে, আলকাতরা-মাখা হাতের দিকে বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে বলল লুর্জাগিনা।

'ক্ষমা করবেন, মাদাম। একদিনেই উঠবে না, এটা যে আলকাতরা!' ফেদোস বুঝিয়ে বলল। সে যা বলছে তা যে সত্যি সে কথার সমর্থনের জন্য যেন আগেকার কর্তার দিকে চাইল। 'ওকে বুঝিয়ে দিন,' তার দৃষ্টিতে যেন এই কথা 'উনি বুঝতে পারছেন না।'

'দাগটা ধীরে ধীরে উঠবে। যথা সময়ে সাফ করে ফেলবে ও ...'

'তাই করব হুজুর।'

'ও ভাবে আর চেঁচিও না, ফেওদোসি। এর আগে বহুবার সাবধান করেছি...'

'বুঝলে উনি কী বলছেন, চিজিক... কখনো চেঁচিয়ে কথা কইবে না!' ক্যাপ্টেন লুজগিন ধুয়ো ধরল।

'হ্যাঁ, হুজুর।'

'নাবিক হিসেবে যেমন ভাল ছিলে তেমনি নার্সের কাজ করে যাও, চিজিক। ভালভাবে আমার ছেলের দেখাশুনো কোরো।'

'হ্যাঁ, হুজুর।'

'ভদকা আর কখনো ছোঁবে না,' মাদাম যোগ করল।

'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে খুব সাবধান,' ভাসিলি মিখাইলভিচ কথাটা বলল দুর্বলভাবে। বুঝল এ রকম কথা বলা বৃথা আর ভণ্ডামীর সামিল, তবু তার বিশ্বাস মদ খাওয়ার ব্যাপারে চিজিক কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে না।

'আর একটা কথা ... এখন থেকে আমি তোমাকে ফেওদোসি বলে ডাকব ...'

'মাদামের যা ইচ্ছে।'

'কখনো এখানে মুখ খারাপ করবে না — বিশেষ করে আমার ছেলের সঙ্গে যখন থাকবে। আর যদি রাস্তায় কোন নাবিককে গালমন্দ দিতে শোন, সেখান থেকে ওকে সরিয়ে আনবে।'

'বুঝলে চিজিক, নোংরা কথা বলবে না কখনো। মনে থাকে যেন এখন আর তুমি জাহাজে নও, কাজ করছ ভদ্র মহিলার কাছে।'

'হ্যাঁ, হুজুর।'

'আর কর্ত্রী তোমাকে যা যা বলেন ঠিক তাই করবে। যখন যা বলেন তাই মেনে চলবে। কখনো অমত করবে না...'

'না, হুজুর।'

'আর ভগবান করুন, কখনো যেন তোমার কর্ত্রীর সঙ্গে বেয়াদপি না কর বা রুক্ষ না হও। এতটুকু বেয়াদপি করলেই তোমার গায়ের চামড়া তুলে ফেলব, বুঝলে?' ভাসিলি মিখাইলভিচের সুরে কঠোর দৃঢ়তা।

'হ্যাঁ, হুজুর।'

খানিক চুপচাপ।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ব্যাপারটা শেষ হল!' ভাবল চিজিক।

'ওকে আর কিছু বলার আছে, মারুসিয়া?'

'না।'

'বেশ। তাহলে এখন যেতে পার, চিজিক... দপ্তরে সার্জেন্ট মেজরকে বলবে আমি তোমাকে এখানে কাজে লাগিয়েছি!' রীতিমত খোশ মেজাজে বলল ক্যাপ্টেন। এর থেকে কারও ধারণা করার উপায় নেই একটু আগেই সে ওর 'চামড়া তুলে নেবে' বলে ভয় দেখিয়েছিল।

কঠোর পরীক্ষা শেষ হওয়ায় চিজিক খুশি হয়ে খাবারঘর থেকে বেরিয়ে এল। ক্যাপ্টেনের ব্যবহারে কম অবাক হল না সে।

আর অবাক হবার কথাও বটে!

যুদ্ধ-জাহাজে ক্যাপ্টেন লুজগিন ছিল ঈগলের মত, বিশেষ করে ঝড়ঝাপ্টার সময় ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে যখন সে হুকুম দিত। অথচ এখানে এই বাড়িতে বউয়ের কাছে সে একেবারেই আলাদা মানুষ — 'পুরোপুরি স্ত্রৈণ'। আর একটা জিনিষ: জাহাজে লোকদের উপর ছিল দয়া, কদাচিৎ কাউকে শাস্তি দিত — দিলেও যথেষ্ট কারণ থাকলে তবেই দিত আর এখন কি না 'সোনালী চুলওয়ালীর'টি খাতিরে তার 'চামড়া তুলে নেবে' বলে ভয় দেখাচ্ছে!

'এই দুশ্চরিত্র কটুভাষিণীর রাজত্ব এখানে!' মনে মনে ভাবল সে। আগের কর্তার উপর যে সহানুভূতি জাগল তার সঙ্গে মিশল ধিক্কার। 'এরই সম্পর্কে আমাকে সাবধান থাকতে হবে,' ভাবল সে।

রান্নাঘর দিয়ে যেতে ইভান জিজ্ঞেস করল:

'কী হে বাপু, এখানেই থাকছ তাহলে?'

'হ্যাঁ,' চিজিক বলল শুকনোভাবে। চাকর আর আর্দালিদের সে দেখতে পারে না আদৌ। মনে করে এরা আলসে আর কুঁড়ে, নাবিক নয় আদৌ।

'আমাদের দু'জনার থাকার মত যথেষ্ট জায়গা আছে এখানে ... একটা সিগারেট চলবে কি? ...'

'না, ধন্যবাদ। আমি পাইপ খাই... পরে দেখা হবে।'

নৌদপ্তরে যেতে যেতে চিজিক ভাবল চাকর হিসেবে তার 'দুঃসময়ের' কথা, বিশেষ করে যখন মাদাম লুর্জাগিনার মত 'কটুভাষিণীর' কাছে তাকে কাজ করতে হবে। ভদ্দরলোকের বাড়িতে কাজ করার ধারণাটাই তার কাছে বিরক্তিকর।

যে দুর্ঘটনার জন্য তার দুটো আঙুল খোয়া গেছে তাই নিয়ে সে দুঃখ পেল। এ না হলে সে অবসর নেওয়া পর্যন্ত রীতিমত নাবিকের কাজই করতে পারত।

'কখনো মদ ছোঁবে না — যত সব পাগলামী!' নৌদপ্তরে পৌঁছতে কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

## ৫

পরের দিন সকালে তল্পি-তল্পা নিয়ে চিজিক এসে হাজির হল লুর্জাগিনদের কাছে। সঙ্গে একটা ছোট্ট বাক্স, মাদুর, পাটল রঙের তুলোর তৈরী ওয়াড়ওয়ালা একটা বালিশ (সারেঙ্গ বন্ধুর বউয়ের কাছ থেকে পাওয়া উপহার) আর একটা বালালাইকা। জিনিষগুলোকে রান্নাঘরের এক কোণায় রেখে আঁটসাঁট ইউনিফর্মটা খুলে ফেলল। নাবিকের সার্ট গায়ে চাপিয়ে ক্যানভাসের জুতো পরে নতুন কাজ সুরু করার জন্য হাজির হল মাদাম লুর্জাগিনার কাছে।

পরনে চওড়া ট্রাউজার। ঢিলে সার্টের বড়সড় কলারটায় তার শক্তিশালী, পেশীবহুল গলাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফেদোসের চেহারায় ফুটেছে একেবারে একটা আলাদা ভাব — তেজাল, অভিজ্ঞ নাবিকের এমন একটা স্বাধীন ও আস্থাশীল চেহারা, যে লোক যে কোন অবস্থার সমকক্ষ হতে সমর্থ। সবকিছু মিলে তাকে বেশ মানিয়েছে — চেহারায় এসেছে একটি পরিচ্ছন্নতা। তাকে ঘিরে আলকাতরা ও কড়া তামাকের যে একটা মিশ্র গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল শুরার কাছে সেটা মনে হল সবচাইতে মনোরম ও উদ্দীপক।

আপাদমস্তক পরীক্ষা করে মাদাম লুজগিনা এই সিদ্ধান্ত করল নতুন চাকরটা হয়ত তত খারাপ নয় এবং প্রথমটায় যে রকম মনে হচ্ছিল ততটা কুৎসিত ও গেঁয়ো নাও হতে পারে। সে রকম একরোখাও মনে হচ্ছে না।

একমাত্র যে জিনিষটা তাকে তখনও বিরক্ত করছিল তা ওর কদাকার হাত দুটো, সে দিকে চোখ পাকিয়ে রুষ্টভাবে বলল:

'আমার কথামত স্নানের ঘরে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, মাদাম, গিয়েছিলাম,' বলল চিজিক এবং যেন নিজেকে সমর্থন করার জন্য জানাল, 'আলকাতরাটা একবারেই উঠে আসবে না, মাদাম, যত জোরেই ঘষি না কেন, কোন লাভ নেই।'

'বেশ। তোমার হাত কিন্তু ঘন ঘন ধোবে। সাফ রাখা চাই।'

'হ্যাঁ, মাদাম।'

এরপর ক্যানভাসের জুতোর দিকে তাকিয়ে সে কঠোর উপদেশ দিল:

'আর মনে রাখবে, এখানে কখনো খালি পায়ে আসবে না। এখন তুমি আর জাহাজের কাজে নেই।'

'হ্যাঁ, মাদাম।'

'আচ্ছা, এবার গিয়ে চা খাও ... এই নাও তোমার চিনি।'

'অনেক ধন্যবাদ, মাদাম!' তার ধবধবে আঙুল যাতে না ছুঁয়ে ফেলে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চিনির টুকরোটা নিতে নিতে বলল চিজিক।

'আর শোন। রান্নাঘরে বেশী সময় থেক না। চা খাওয়া হলেই এখানে আলেক্সান্দ্র ভাসিলিয়েভিচের কাছে চলে আসবে।'

'চটপট চলে এসো, চিজিক,' শুরা যোগ করল।

'এখখুনি এসে যাব আমি, লেক্সান্দ্রা ভাসিলিচ!' ফেদোস জানাল।

প্রথমটায় শুরা তাকে নিয়ে গেল নার্সারিতে, দেখাল তার অসংখ্য খেলনা। এর কতকগুলি দেখে তার কৌতূহল হল, ঔৎসুক্য নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তাদের। শুরার আনন্দ দেখে কে! মিলের চাকা আর একটা স্টীমার গিয়েছিল ভেঙে, ও দুটোকে চালু করবে বলে ফেদোস কথা দিল।

'সত্যি পারবে তুমি?' অবিশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করল শুরা।

'যেমন করেই হোক, চেষ্টা করব।'

'তুমি গপ্প বলতে জান, চিজিক?'

'জানি।'

'আমাকে শোনাবে ত কয়েকটা?'

'কেন শোনাব না? অনেক গপ্প শোনাব।'

'গপ্প বললে আমি তোমাকে ভালবাসব...'

ছেলেটির মাথায় খসখসে হাত বুলাতে লাগল নাবিক। তার ঝুলে-পড়া ঘন ভ্রূর নীচে চোখ দুটিতে ফুটে উঠল শান্ত ও স্নেহ-ভরা হাসি।

চিজিকের এই ব্যবহার যে শুরার কাছে কেবল অপ্রীতিকর না তাই নয়। মা বলেছে চাকরদের সঙ্গে কখনো বেশী ভাব করতে নেই, তবু নতুন বন্ধুর উপর তার টান পড়ল খুব বেশী।

গলাটাকে একটু নীচু করে সে বলতে থাকে:

'একটা কথা জান, চিজিক?'

'কী খোকাবাবু?..'

'কখনো আমি মায়ের কাছে তোমার নামে নালিশ করব না ...'

'কিন্তু করবেই বা কেন? ... তোমার কোন অনিষ্টই আমি করব না... ছোটদের ক্ষতি করা অন্যায়। এ হচ্ছে সবচাইতে বড় পাপ... এমন যে জানোয়ার তারাও ছোটদের ভালবাসে... কখনো যদি আমাদের বনিবনা না হয়, নিজেরাই তার ফয়সালা করব,' ভাল মানুষের মত হেসে বলল ফেদোস। 'তোমার মাকে এর ভেতর টানব না ... তাই হবে ঠিক, নয় কি, খোকাবাবু? কেন আমরা একজন আর এক জনের নামে লাগাতে যাব?.. কথা লাগান নোংরা জিনিষ, খোকাবাবু... সত্যিই নোংরা!' নাবিকদের আইনকানুনের ঐতিহ্যের মতে চুকলি-কাটা নিষিদ্ধ। তাই অনুসরণ করে ফেদোস্ কথাটা শেষ করল।

কথা লাগান যে 'নোংরা জিনিষ' শুরা তা স্বীকার করল। আন্তোন ও আন্যুৎকা প্রায়ই তাকে এ কথা বলত। ফেদোসকে চটপট কথাটা বুঝিয়ে দেবার জন্য জানাল আন্তোন তাকে 'শয়তানের সাকরেদ' বললেও বেত খাওয়া থেকে ওকে বাঁচাবার জন্য মায়ের কাছে কথাটাকে সে গোপন রাখত ...

'তবু কিন্তু হামেসাই ওকে ওরা চাবুক মারত... মা'র সঙ্গে ওর ব্যবহার ছিল অভদ্র, তাছাড়া, প্রায়ই মাতাল হত ও!' বিশ্বাস করে খবরটা জানাল ফিসফিসিয়ে।

'ঠিক করেছ ছেলে ... একেবারে ঠিক!' নরম গলায় ফেদোস সমর্থন জানিয়ে ছেলেটির কাঁধে হাত বুলোয়। 'তোমার ছোট্ট মনটির ভিতর ছিল ওকে দয়া দেখাবার বুদ্ধি ... ও যে চলত ভুল পথে — ওই আন্‌তোন। একটা বাচ্চাকে নিয়ে পড়ার ওর কী দরকার ছিল?... তুমি কিন্তু ছোট্টটি হয়েও ওর কথা বলনি... ভাল করেছ, ছেলে!'

এ রকম তারিফ পেয়ে স্পষ্টতঃই শুরা আনন্দ পেল যদিও চিজিকের কথাগুলো মায়ের আদেশের উল্টো, তিনি বলেছেন তাঁর কাছ থেকে কোন কিছুই না গোপন করতে।

একটা ট্রাঙ্কের উপর সাবধানে বসে ফেদোস বলতে থাকে:

'আন্‌তোন যা বলেছে তা মাকে জানালে ওরা ওর চামড়া তুলে নিত।'

'এর মানে কী, চিজিক?..'

'এটা আমাদের নাবিকদের কথা। মানে, খুব বেশী রকমের পিটুনি খাওয়া...' হাসতে হাসতে জানাল চিজিক।

'ওরা কি কখনো তোমার চামড়া তুলেছিল?...'

'তা আমি যখন জোয়ান ছিলেম, তুলেছিল বটে... আমি ও সব হজম করেছি...'

'ওতে কি তুমি খুবই কষ্ট পেয়েছিলে?'

'নিশ্চয়ই। ব্যাপারটা আরামের নয়...'

'কেন তোমাকে ওরা চাবকাত?...'

'তা, যে কোন ব্যাপারের জন্য। নৌবিভাগের ওরা বিশেষ কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না...'

শুরা একটু চুপ করে থাকে। তারপর চিজিককে একটা মজার খবর দেবার জন্য গম্ভীর রহস্যময় গলায় বলল:

'আমিও বেত খেয়েছি, চিজিক।'

'তুমিও! আহা বেচারা!..'

'মা আমাকে বেতিয়েছেন... লেগেও ছিল বেশ...'

'কেন উনি এ কাজ করতে গেলেন?...'

'একবার পেয়ালা ভাঙায়, আর একবার কথা শুনিনি বলে। তুমি কিন্তু কাউকে বল না, চিজিক...'

'ভয় নেই। কাউকেই বলব না ...'

'বাবা কিন্তু কখনো আমাকে মারেননি।'

'তাঁর ভালো হোক। কেন মারবেন তোমাকে?'

'কিন্তু পেতিয়া গল্‌দোবিন। আচ্ছা—তুমি এডমিরাল গল্‌দোবিনকে জান? আমাকে বলেছে প্রায়ই সে বেত খায়... কেবল ওর বাবা ওকে সব সময় পিটোয়...'

ফেদোস বিরক্তির সঙ্গে মাথা নাড়ল। অবাক হবার কিছুই নেই। গল্‌দোবিনকে নাবিকরা পছন্দ করত না। লোকটা একটা সত্যিকারের জন্তু!

'বাবা কি 'কোপচিক'এর নাবিকদের সাজা দেন?'

'কখনো সখনো দিতেই হয়, খোকাবাবু।'

'তাদের কি চাবুকও মারেন?'

'মাঝে মাঝে। কিন্তু তোমার বাবা লোক ভাল... তাই লোকরা ওঁকে ভালবাসে...'

'সত্যিই তাই... বাবা খুব ভাল!... কিন্তু এখন বাইরে গেলে কেমন হয়, চিজিক?' হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে জানলার দিকে চোখ ছোট করে তাকিয়ে বলল ছেলেটি। জানলার ভিতর দিয়ে প্রলম্বিত সূর্যরশ্মি ঘরের ভিতর ঢুকে ঘরটিকে উজ্জ্বল করে তুলছে।

'নিশ্চয়ই। চল, বাইরে যাওয়া যাক... চমৎকার রোদ উঠেছে এখন। দেখে তোমার মন নেচে উঠছে তাই না?'

'কিন্তু মাকে ত আগে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে...'

'নিশ্চয়ই। অনুমতি নিতেই হবে।'

'তোমার কি মনে হয়, আমাদের যেতে দেবেন?'

'নিশ্চয়!'

শুরা ছুটে গেল। মিনিটখানেক বাদে ফিরে এল সোল্লাসে চেঁচাতে চেঁচাতে:

'মা বললেন, যাও! কিন্তু আমাকে গরম কোট চাপাতে হবে। মা আমাকে আগে ঐ পোষাকে দেখবেন। পরিয়ে দাও, চিজিক!.. ঐ যে ঝুলছে... টুপি আর স্কার্ফটাও ওখানে...'

'কত রাজ্যের পোষাকই না পরতে হচ্ছে, খোকাবাবু! বরফ ঝড়ের পক্ষেও যথেষ্ট, তাই না?' পোষাক পরাতে পরাতে চিজিক হাসল।

'আমিও মাকে এ কথা বলেছি। বলেছি বড্ড গরম লাগবে...'

'তা ঠিক।'

'মা কিন্তু আমাকে অন্য কোট পরতে দেবেন না। জিজ্ঞেস করে দেখেছি। চল, তাহলে... মার কাছে যাওয়া যাক!'

মাদাম লুজগিনা শুরার পোষাক পরীক্ষা করে ফেদোসের দিকে চেয়ে বলল:

'বাচ্চার দিকে খেয়াল রেখো। পড়ে গিয়ে যেন ব্যথা না পায়।'

'তাই কি সম্ভব? আর যদি পড়েও যায় কী ক্ষতি হবে ওর?' মাদাম লুজগিনার অনর্থক 'বকবকানি' বিন্দুমাত্র পছন্দ না করে ফেদোস ভাবল মনে মনে। যথার্থ শ্রদ্ধার সুরে সে জবাব দিল:

'হ্যাঁ, মাদাম। না, মাদাম!'

'আচ্ছা, এসো তাহলে...'

দু'জনা সানন্দে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাচ্চা কোলে আন্যুৎকা ওদের দিকে চেয়ে রইল ঈর্ষার দৃষ্টিতে।

'জুতোটা বদলে আসছি। ততক্ষণ বারান্দায় একটু অপেক্ষা কর। এলাম বলে।'

চিজিক দ্রুত চলে গেল রান্নাঘরের পাশের ঘরে, পরল তার বুটজোড়া। তারপর জ্যাকেট আর জাহাজী টুপি চাপিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে ঢুকল চওড়া উঠোনের মাঝখানে। তারই শেষ প্রান্তে একটা বাগান, সেখানে ন্যাড়া গাছগুলোতে বসন্তের প্রথম সবুজ কুঁড়ি ধরেছে।

## ৬

বাইরেটা মনোরম।

হাল্কা নীল আকাশ থেকে বাসন্তী সূর্য উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে। আকাশে ভেসে চলেছে রেশমের মত সাদা টুকরো মেঘের দল, বেশ উষ্ণ বোধ হচ্ছে। বাতাসে একটা উল্লাসময় তীক্ষ্ণতা, তার ভেতর পাওয়া যাচ্ছে সারের গন্ধ আর আশেপাশের ব্যারাক থেকে আসা কালো রুটি আর বাঁধাকপির সুপের সৌরভ, এরই সঙ্গে মিশে আছে বসন্তের সজীবতা। বাড়ির ছাদ থেকে জল চুঁইয়ে গর্তের উপর ঝিকমিক করছে, তৈরী হচ্ছে আঁকাবাঁকা জলধারা। বরফ-গলা, ধূমায়িত মাটির উপর দিয়ে তা ছুটে চলেছে এদিক ওদিকে। মাটির বুকে সবে নতুন ঘাস গজাতে সুরু করেছে। প্রাঙ্গণ জুড়ে জীবনের স্পন্দন।

চালাঘরের কাছে খুশিভরে কুক কুক করতে করতে মুর্গিগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুন্দর-ল্যাজ একটা ছটফটে মোরগ বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করছে, খুঁজছে তার মেয়ে বান্ধবীদের জন্য শস্যবীজ। জলার ভেতর হাঁসগুলো প্যাক প্যাক করছে। থেকে থেকে এক এক ঝাঁক চড়ুই সাঁ করে বাগান থেকে উঠোনে নেবে আসছে আর কিচিরমিচির শব্দে এদিক ওদিক লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, ঝগড়া করছে। চালাঘরের ছাদে ঘুঘুরা চলাফেরা করছে, রোদে ধূসর-নীল পাখনা মেলে ডাকছে। জলের পিপের পাশে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে একটা বড়সড় লাল লোমশ কুকুর, মাঝে মাঝে মাথা তুলছে মাছি তাড়াবার জন্য।

'খুবই সুন্দর, তাই না চিজিক?' চিৎকার দিয়ে উঠল শুরা, কণ্ঠে জয়োল্লাস। হঠাৎ ছাড়া-পাওয়া বাচ্চা ঘোড়ার মত ছুটে গেল উঠোনের আর এক কোণায় — চালাঘরের দিকে। ভয় পাওয়া চড়ুই আর মুর্গিগুলো আওয়াজ তুলে পাগলের মত যে যেদিকে পারল ছুট মারল আর বাহারে মোরগটা এই কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'সত্যি, জায়গাটা সুন্দর!' ফেদোস বলল।

চালাঘরের বাইরে একটা উল্টোন পিপের উপর বসে সে তার পকেট থেকে ছোট্ট পাইপ আর তামাকের থলেটা বার করল, পাইপটাকে ঝেড়ে ফেলে বুড়ো

আঙুল বাঁকিয়ে তামাক ঠেসে দিব্যি মৌজ করে পাইপ টানতে লাগল। দেখতে লাগল উঠোনটা — হাঁস, মুর্গি, পাহারাদার কুকুর, নতুন ঘাস, স্রোতধারা। প্রকৃতি আর পশুকে যারা ভালবাসতে জানে তাদের মত স্নেহদৃষ্টি তার চোখে।

'সাবধান, খোকাবাবু!... গর্তের ভেতর পড়ো না যেন... চারদিক জলে ভর্তি... হাঁসদের জন্য এগুলো বহুৎ আচ্ছা!'

শুরা চারদিকে ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, ফিরে এসে বসল ফেদোসের পাশে। ফেদোস যেন ওকে যাদু করেছে।

সারা দিনটাই প্রায় ওরা বাইরে কাটাল। শুধু খেতে গেল ভিতরে। দিনভর ফেদোস হাঁসমুর্গি আর আকাশে রেশমের মত টুকরো মেঘ নিয়ে এমন জ্ঞানের পরিচয় দিল, তাদের কথা বুঝিয়ে বলার এমন ক্ষমতা দেখাল যে শুরা তার বন্ধুর পাণ্ডিত্য দেখে প্রশংসা ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। কী করে সে এত সব মজার কথা জানল? থ মেরে গেল সে।

পুরো একটা নতুন জগৎ উদ্ঘাটিত হল তার সামনে। উঠোনের ভেতর মজাদার জিনিষগুলোর দিকে চিজিক সর্বপ্রথম তাকে চোখ মেলে চাইতে শেখাল।

পশুপাখী, ঘাসের ডগা যা কিছু নিয়ে চিজিক কথা বলে শুরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে—তার এই সহজ স্বাভাবিক জ্ঞান দেখে মনে হল সে যেন ওদেরই একজন...

শুরা খেয়ালের মাথায় হঠাৎ কথাটা পেড়েছিল। একটা হাঁসকে সে পাথর ছুঁড়ে মারল আর হাঁসটা পাগলের মত চেঁচাতে চেঁচাতে সেখান থেকে ছুটে পালাল...

'ওরকম করা তোমার ঠিক হয়নি, লেক্সান্দ্রা ভার্সিলিচ!' ভ্রু কুঁচকিয়ে মাথা নেড়ে বলল চিজিক। 'এটা অন্যায়,' আবার বলে সে, কণ্ঠে মৃদু তিরস্কার।

শুরা লাল হয়ে উঠল। বুঝতে পারল না এ কথায় কিছু মনে করবে কি করবে না, সুতরাং শুনতে না-পাওয়ার ভান করে ইচ্ছাকৃত উদাসীন ভাব দেখিয়ে জলার উপর পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাটি ছিটোতে লাগল।

'নির্দোষ পাখিটাকে কেন এভাবে মারলে?... বেচারা এখন খোঁড়াচ্ছে আর

মনে মনে বলছে, "ছেলেটি কেন আমাকে পাথর ছুঁড়ে মারল?..." এখন গেছে ওর স্বামীর কাছে নালিশ করতে।'

শুরা একটু অস্বস্তি বোধ করল, বুঝল সে অন্যায় করেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিজিকের কথা শুনে কৌতূহল হল এই ভেবে যে হাঁসরা আবার চিন্তা করতে পারে, কথাও বলতে পারে না কি!

কিন্তু বেশীর ভাগ অহঙ্কারী ছেলের মত সে যে অন্যায় করেছে তা স্বীকার করতে চায় না। উদ্ধতভাবে জবাব দিল:

'বাজে কথা, চিজিক! হাঁসরা যেন ভাবতে পারে, নিজেদের ভেতর যেন কথা কইতে পারে!'

'তুমি কি ভাবছ?... ঈশ্বরের সব প্রাণীদেরই মন আছে ... নিজের মত করে ভাবতে পারে তারা ... এমনকি নিজেদের ভেতর কথাও কইতে পারে। চড়াইটা যে ওখানে কিচিরমিচির করছে চেয়ে দেখো তার দিকে,' বাগান থেকে সদ্য উড়ে-আসা চড়াইটাকে দেখিয়ে চিজিক বলল। 'তুমি বুঝি ভাবছ ঐ পুঁচকে দুষ্টুটা শুধুই কিচির কিচির করছে? তা নয়, বলছে, কিছু খাবার ও বার করেছে, সঙ্গীদের ডাকছে তারই ভাগ দেবার জন্যে। "এসো ভাইসব, এসে ঠোকর মারো!" এই ওর বক্তব্য। সামান্য একটা চড়াই হলে কি হবে, সে জানে খাবার খেতে হবে ভাগ করে। "আমি খাব, তুমি খাবে, আমরা সবাই খাব একসঙ্গে," একথাই ও বলতে চায়...'

শুরা ফেদোসের পাশে পিপের উপর বসল, স্পষ্টই ওর মন লেগেছে।

চিজিক বলতে থাকে:

'এবার কুকুরদের কথা ধরা যাক ... ঐ যে লাইকা রয়েছে ওখানটায় ... তুমি কি ভাবছ ইভান যে ওর গায়ে গরম জল ঢেলেছিল তা ও বোঝেনি? ... নির্লজ্জ কুঁড়েটা!... ওর মত একটা অসহায় জীবের সঙ্গে দুর্ব্যবহার!' চিজিক রাগ জানাল। 'এখন থেকে দেখতে পাবে, লাইকা আর রান্নাঘরের কাছে যাবে না... ওখানে কি ঘটবে সে জানে... কিন্তু চেয়ে দেখো, তোমাকে বা আমাকে সে ভয় পাবে না!'

এই বলেই সে কুকুরটাকে ডাক দিল—একটা লোমশ, সাদাসিধে চেহারার জানোয়ার, চোখ দুটো বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে সে বলে চলল:

'আহা বেচারী, মুখ্যুটা তোর সঙ্গে কী কাণ্ডই না করেছে? ... দেখি ত তোর পিঠটা!...'

কুকুরটা ওর হাত চাটল, চিজিক ঝলসান পিঠটা ভাল করে পরীক্ষা করল।

'শোন লাইকা, আঘাতটা তেমন বেশী নয়... মনে হচ্ছে অপমানের জন্যই অত বেশী চেঁচিয়েছিলি ... কিছু ভাবিস না। ওকে আর কষ্ট দিতে দেব না তোকে ...'

কুকুরটা কৃতজ্ঞভাবে আবার ওর হাত চেটে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

'দেখছ, কুকুররাও ভালবাসা বুঝতে পারে ... আর শুধু কুকুররাই নয় ... এমন যে পোকামাকড় তাদেরও অনুভূতি আছে — ওরা শুধু কথা কইতে পারে না ... পা দিয়ে মাড়ালে এমন যে ঘাস সেও এক রকম শব্দ করে কাতরিয়ে ওঠে...'

সোৎসাহে বিষয়টা নিয়ে অনেকক্ষণ এভাবে কথা চালাল চিজিক। শুরা মুগ্ধ হল, কিন্তু হাঁসটার চিন্তা তাকে পীড়া দিচ্ছে। উদ্বেগের সঙ্গে চিজিককে জিজ্ঞেস করল:

'আমাদের কি গিয়ে দেখা উচিত নয় হাঁসটা ঠিক আছে কি না? হয় ত ওর পা ভেঙে দিয়েছি...'

'না, ও ঠিক আছে... ওই যে ওখানে হেলে দুলে বেড়াচ্ছে... কি গো শ্রীমতী হাঁস, সুস্থ হবার জন্য তোমার ত ডাক্তার লাগেনি, কি বল?' ফেদোস হাসল। ছেলেটি তার নিজের কাজের জন্য লজ্জা পাচ্ছে দেখে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'তোমার উপর ওর আর এখন রাগ নেই, খোকাবাবু। তোমাকে ও ক্ষমা করেছে। কাল যদি আবার তোমার মা আমাদের বাইরে আসতে দেন, ওর জন্য একটু রুটি নিয়ে আসব...'

ইতিমধ্যে চিজিক শুরাকে পুরোদস্তুর মুগ্ধ করে ফেলেছে। পরে যখন সে

সত্যিকারের শিক্ষকদের সংস্পর্শে আসত তখনো প্রায়ই সে তার আগেকার 'নার্সের' কথা বলত আর ভাবত তার সঙ্গে আর কারো তুলনাই হয় না।

আটটা বাজতে ফেদোস ওকে বিছানায় শুইয়ে ঘুমপাড়ানী গল্প বলতে লাগল। কিন্তু শুরা এতই ক্লান্ত যে ওর আর গল্প শোনার অবস্থা ছিল না। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এই কথা বলে:

'আর আমি হাঁসদের মারব না ... গুড নাইট, চিজিক! ... তোমাকে আমি ভালবাসি।'

সে রাতে রান্নাঘর পেরিয়ে তার নিজের ঘরে গেল চিজিক।

সার্ট আর প্যান্ট রেখে, সব ছেড়ে সে তার বাক্স খুলল।

ভেতরের অংশটায় শস্তা রঙের ছবি আর পমেটম কৌটোর লেবেল লাগান। (তেল ছবির কপি বা নক্সা-আঁকা কাগজ ছিল না তখনকার দিনে।) কোন কিছু করার আগে নাবিকদের আরাধ্য ঠাকুর নিকলাইয়ের সামান্য কালো-হওয়া খুদে মূর্তিটিকে নিয়ে সে ক্রুশচিহ্ন আঁকল, তারপর টাঙিয়ে দিল বিছানার উপরকার দেয়ালে। এরপর ঝোলাল আয়না আর তোয়ালে, কাঠের পায়া-লাগান খাটের উপর মাদুর পেতে বিছোল চাদর আর তুলোর কম্বল।

এ সব সেরে খুশি মনে নিজের নতুন থাকার জায়গাকে পরখ করল, জুতো খুলে বিছানায় বসল পাইপ খেতে।

ইভান তখনও রান্নাঘরে কাজ করছিল, ঠিক সেই সময়েই সে সামোভারটা ঠিক জায়গায় বসাল। ঘরের দিকে চেয়ে বলল:

'আপনি কি রাতের খাওয়া খেতে আসবেন না, ফেদোস নিকিতিচ?'

'না, ধন্যবাদ। আমার খিদে নেই...'

'আন্যুৎকাও খাবে না ... আমাকে তাহলে একা একাই খেতে হবে দেখছি ... তা এক পেয়ালা চাও চলবে না? চিনির আমার অভাব নেই, জানেন!' ধূর্তভাবে চোখ টিপে বলল সে।

'ধন্যবাদ... এখন নয়...'

'ঠিক আছে, যেমন আপনার খুশি!' আহত গলায় বলে ইভান রান্নাঘরে ফিরে গেল।

ইভানের এই নতুন ঘরো সঙ্গীটিকে ভাল লাগে না মোটেই। ইভানও ফেদোসের পছন্দসই নয়। চাকর আর আর্দালিদের এমনিতেই সে অপছন্দ করে, তার উপর এই বদমায়েস, উদ্ধত রাঁধুনীর প্রতি তার বিশেষ ঘেন্না। ওর একটা জিনিষ ওকে খুব বেশী পীড়া দেয়। তিনজনা মিলে একসঙ্গে খেতে বসলে আন্যুৎকাকে নিয়ে ওর কুৎসিত ঠাট্টা। চিজিক কিছু বলেনি, শুধু ভ্রূ কুঁচকিয়েছে। ইভানের অবশ্য বুঝতে দেরী হয়নি যে এতে চিজিক চটেছে। ঠাট্টা বন্ধ রেখে সে চেষ্টা করল 'সুন্দর আদবকায়দার' দ্বারা ওকে ভুলোতে, সগর্বে বলতে লাগল প্রভু ও প্রভুপত্নী তাকে কতখানি পছন্দ করে, তাদের কাছে তার কদর কতটা।

চিজিক চুপচাপ থাকল কিন্তু ভিতরে ভিতরে লোকটাকে 'স্রেফ অপদার্থ” বলে মনে হতে লাগল। লাইকাকে সে যা করেছে সে সম্পর্কে সরাসরি জানিয়ে বলেছিল ওটা 'জঘন্য লজ্জার' বিষয়:

'নিজে ওরকম ছ্যাঁকা খেলে কেমন লাগে তোমার? আর তুমি কিনা বলে বেড়াও তুমি একজন নাবিক!'

ইভান কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে গজরাতে লাগল সে। আরও বেশী করে খেপে গেল কারণ আন্যুৎকার সামনে ওকে সে অপমান করেছে। আন্যুৎকা ফেদোসের কথায় স্পষ্ট সায় দিয়েছে।

'এবার শুয়ে পড়া দরকার!' পাইপটা শেষ করে বলে উঠল চিজিক।

উঠে দাঁড়িয়ে উঁচু, গম্ভীর গলায় প্রার্থনা শেষ করে ক্রুশচিহ্ন এঁকে ঘুমোবে বলে শুয়ে পড়ল সে। কিন্তু ঘুম আসতে অনেক সময় লাগল: তার মনে ভেসে এল নাবিক জীবনের পনেরটি বছরের কথা আর সেই সঙ্গে এখনকার নতুন জীবন।

'বাচ্চাটা চমৎকার, কিন্তু ঐ "সোনালী চুলওয়ালী" আর এই "কুঁড়েটার" সঙ্গে পোষাবে কী করে?' প্রশ্ন করল নিজেকে।

শেষটায় স্থির করল ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটুক। 'ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক,' শান্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

## ৭

ভূমিদাসপ্রথা যখন একেবারে লোপ পায়নি, অন্যান্য জায়গার মত নৌবাহিনীর সাধারণ লোকদের উপর চলেছে কঠোর এমনকি নির্মম অত্যাচার, বেশীর ভাগ রুশ নাবিকদের মত ফেদোস চিজিকও ছিল দার্শনিক আর অদৃষ্টবাদী।

তার সারা জীবনের একমাত্র কাজ ছিল শরীরটাকে ঘুষি আর প্রহার এবং মুখটাকে সাংঘাতিক আঘাত থেকে বাঁচান (সামান্য আঘাত তার কাছে কিছুই না), নাবিকদের কঠোর কর্তব্য পালন আর সৎ আচরণের ভিত্তিতে সে তার জীবনের ছক তৈরী করে নিয়েছিল, বাকি সবকিছু সে ছেড়ে দিয়েছিল 'ঈশ্বরের ইচ্ছার' উপর।

রুশ চাষীদের মত ঈশ্বরের দয়াময় সততায় তার এই মর্মস্পর্শী বিশ্বাস, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্পর্কে তার সব সন্দেহ ও অনিশ্চয়তাকে দূর করে দেয়। চিজিকের কথামত 'হতাশার বুকে আত্মসমর্পণ ও কয়েদী দলের স্বাদের' হাত থেকে বাস্তবিকপক্ষে একমাত্র এই বিশ্বাসই তাকে রক্ষা করত।

এই বিশ্বাসের জোরে সৎ নাবিক হিসেবে সুখদুঃখে উদাসীন থেকে সে তার জীবন চালাতে পেরেছিল, অত বেশী নিষ্ঠুরতা ও অন্যায় দেখে উত্তেজিত হয়ে, এমনকি রুশ নাবিকের যথার্থ খৃষ্টীয় ধৈর্যের কঠোরতম পরীক্ষার সময়েও মানসিক অবস্থাকে শান্ত করার জন্য শুধু অভিশাপই দিত সে।

তার বুড়ী জমিদার-কর্ত্রীর খেয়ালে লাঙ্গল ছেড়ে সৈন্যদলে যোগ দিতে যখন সে বাধ্য হয়েছিল, খাট চেহারার জন্য আগে কখনো সমুদ্র না দেখেই চালান হয়েছিল নৌবাহিনীতে, সে সময় থেকে তার জীবন সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্যের বহু বিচিত্র পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে চলে আসছে। সেই মন্দ ভাগ্য থেকে দুঃখের অবস্থা, নাবিকরা যাকে বলে 'নরকে ভাসা' এবং তা থেকে আবার সৌভাগ্যে ফেরা।

'ঈশ্বরের ইচ্ছেয়' যদি সে এমন একজন ক্যাপ্টেন, প্রধান অফিসার বা পাহারা

অফিসার পেত যে সে সময়কার ব্যাপক পাশবিকতার সাধারণ নিয়ম সত্ত্বেও তত বেশী পশুর মত কাণ্ড না করত এবং কারণ না থাকলে কাউকে চাবুক হাঁকাত না তাহলে এই চমৎকার নাবিক ফেদোস শান্তি ও সুখ পেত। সদা প্রহারের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে তার ভেতর প্রকাশ পেত তার দেশসুলভ অমায়িকতা ও রসিকতা, তার পরিচয় মিলত জাহাজের অগ্রমাস্তুলের পুরোবর্তী ডেকের সবচাইতে প্রিয় গল্পবলিয়ে হিসেবে।

কিন্তু 'ঈশ্বরের ইচ্ছেয়' যদি কোন ক্যাপ্টেন বা প্রধান অফিসার নাবিকদের ভাষায় হয়ে দাঁড়াত 'ক্ষ্যাপা কুকুর', পাল তুলতে বা পাল মেলতে এক ফোঁটা দেরী করলে যে চাবুক হাঁকাত, তাহলে ফেদোসের খোশ মেজাজ যেত নষ্ট হয়ে, বিষণ্ণ আর মনমরা হয়ে উঠত সে। চাবুক খাবার পর পারে পৌঁছে সে হত হাল্কা ধরনের লোক। তখনও কিন্তু সে মনমরা জোয়ান নাবিকদের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করত। নিজের পিঠভর্তি চাবুকের রক্তাক্ত দাগ আর ক্ষত নিয়েও এক আশ্চর্য বিশ্বাসের জোর নিয়ে বলত:

'ঈশ্বরের ইচ্ছেয় ওরা আমাদের এই ক্ষ্যাপা কুকুরটাকে অন্য কোন জাহাজে বদলী করে দেবে... তখন আমরা ভাল কাউকে পাব। কুছ পরোয়া নেই, ছেলের দল। চিরকাল এমন যাবে না!'

নাবিকরা ওর কথা বিশ্বাস করত, বিশ্বাস করতে চাইত ওর এই কথা, 'ঈশ্বরের ইচ্ছেয়' 'ক্ষ্যাপা কুকুরটা' অন্য কোন জাহাজে বদলী হবে, ওরা মুক্তি পাবে।

এই বিশ্বাস ওদের জীবনকে কিছুটা সহনীয় করেও তুলত।

তীরে কিংবা জাহাজে ফেদোস চিজিককে তার সঙ্গীরা 'খাঁটি' লোক হিসেবে এবং 'বুদ্ধি আছে' বলে উঁচু নজরে দেখত। সাহস ও নৌবিদ্যার প্রচুর প্রমাণ সে দিয়েছে। ওর সুভতা, উন্নত চরিত্র আর বিনয়ের জন্য সবাই শ্রদ্ধা করত ওকে, ভালবাসত। যে সব তরুণ নাবিক চাকুরী জীবনে ঝানু হয়নি তারা তাকে বিশেষ করে পছন্দ ও তারিফ করত। চিজিক সব সময় ওদের রক্ষাকর্তা হিসেবে দাঁড়াত এবং সারেঙ্গ ও পাতি অফিসারদের জ্বালাতন থেকে ওদের বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করত।

প্রসঙ্গত বলা চলে সারেঙ্গদের 'সংস্কারের' ব্যাপারে চিজিক তার স্বাভাবিক অদৃষ্টবাদী মনোভাব থেকে কিছুটা সরে এসেছিল, কারণ তাদের 'সংস্কার' করার আশাকে কেবলমাত্র 'ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর' ছেড়ে না দিয়ে মূলতঃ মানুষের ক্ষমতার উপর ন্যস্ত করেছিল।

'মানুষের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারের জন্য' যখন অনুরোধ ও একান্ত আবেদনের ফলেও সারেঙ্গ-পশুর উপর আশানুরূপ কোন ফল ফলত না ফেদোস ওদের সাবধান করে দিতে বাধ্য হত:

'জলার বড় ব্যাঙ হবার চেষ্টা করো না, সারেঙ্গ! পতনের মূল অহঙ্কার, বলেছেন বাইবেল। তাই মনে রেখো কেউ তোমাকে কিছু শিক্ষাও দিয়ে দিতে পারে। নিশ্চয় তোমার জানা আছে এই শিক্ষাটির মানে কী!'

কথাটা কেউ যদি কানে না তুলত তাহলে চিজিক চিন্তাভরে মাথা নেড়ে কোন একটা গোপন সিদ্ধান্ত করত।

দয়ালু ও সৎ প্রকৃতির লোক হওয়া সত্ত্বেও, নীচু ডেকের অলেখা নিয়মের ঐতিহ্য রক্ষার প্রশ্ন যখন আসত চিজিক কঠোর ব্যবস্থা নিতে পিছপাও হত না। বিশ্বাসী নাবিকদের জোগাড় করে সে গোপন সভা ডাকত, সারেঙ্গের দুষ্ট ব্যবহারের জন্য কী করা যায় তা স্থির করত। সাধারণত এই সব বে-সরকারী বিচারে ঠিক হত, 'সারেঙ্গকে শিক্ষা দেওয়া হবে'। নাবিকরা তীরে পৌঁছলেই যথারীতি তা করা হত।

ক্রনস্টাড্‌ট বা রেভেলের কোন গলির ভেতর ওকে কেবল প্রাণে না মেরে বেদম প্রহার দিয়ে জাহাজে টেনে আনা হত। তখনকার দিনে সারেঙ্গরা কদাচিৎ অফিসারদের কাছে এ নিয়ে অভিযোগ জানাবার কথা ভাবত। প্রহার-জর্জরিত অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে বলত মাতাল অবস্থায় বিদেশী নাবিকের সঙ্গে তার লড়াই হয়ে গেছে। সাধারণত এই গম্ভীর শিক্ষার পর সারেঙ্গ বুঝেসুঝে ঘুষি চালাত। আগেরই মত কায়দাসই তর্জন-গর্জন, শাপান্ত করত বটে কিন্তু তাতে কেউ কিছু মনে করত না।

ব্যাপারটা যখন এরকম দাঁড়াত ফেদোস প্রায়ই তার দেশসুলভ অমায়িকতা নিয়ে বলত:

'দেখো ওকে কেমন মানুষ বানিয়েছি। এখন ও রীতিমত ভাল সারেঙ্গ ...'

নিজের পদোন্নতির আকাঙ্ক্ষা তার ছিল না। তার মত লোকের চরিত্রের সঙ্গে এটা আদৌ খাপ খেত না। একবার প্রধান অফিসার যখন তাকে পাতি অফিসার বানাতে চাইল অফিসারটিকে সে আন্তরিক অনুরোধ জানাল তা যেন না করা হয়।

'দয়া করে এরকম করবেন না, স্যার। আপনার কাছে এই অনুরোধ', বলেছিল সে।

প্রধান অফিসার অবাক হয়ে কারণটা জিজ্ঞেস করল:

'এ পদ আমার উপযুক্ত নয়, স্যার। আমার লাইন নয় এটা। নাবিক হিসেবেই আমাকে থাকতে দিন, স্যার', কেন সে গররাজী তার আসল কারণ না জানিয়ে বলেছিল সে।

'যা তোমার ইচ্ছে ... কাজের পুরস্কার হিসেবে পদটা দিতে চেয়েছিলাম ...'

'ধন্যবাদ, স্যার! নাবিক হিসেবে থাকতে দেওয়ায় আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, স্যার।'

'বেশ। কিন্তু ভারি বোকা তুমি,' প্রধান অফিসার বলেছিল।

ওরকম একটা পদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ায় অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে প্রধান অফিসারের কেবিন থেকে সে বেরিয়ে এসেছিল। এ পদ পেলে তাকে বাধ্য হয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে 'অসভ্য চিৎকার' করতে হত, চালাতে হত সম্ভ্রান্ত অফিসারদের সঙ্গে একটু মেলামেশা।

'ও জাতের লোকদের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল!' এই হল ওর মনোভাব।

তার দীর্ঘ কর্মজীবনে সে সুখ-দুঃখের ভেতর দিয়ে এগিয়ে এসেছে। কখনও জুটেছে প্রহার, কখনো বা প্রশংসা, কখনো চাবুক কখনো সম্মান। 'কোপচিক' যুদ্ধজাহাজে ক্যাপ্টেন লুজগিনের অধীনে তার শেষ তিন বছর ছিল সবচাইতে সুখের। কারণ তখনকার দিনের বিচারে লুজগিন ও প্রধান অফিসার

ছিল দয়ালু লোক, 'কোপচিকের' নাবিকদের জীবন ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। রোজ রোজ চাবুক চলত না, বাস করতে হত না অহরহ শঙ্কার মধ্যে, ছিল না সেই কঠোর বিবেচনাহীন মহড়া যা নৌবাহিনীর লোকদের জীবনকে নরক বানিয়ে ছাড়ে।

লুজগিন চিজিককে ভাল নাবিক বলে জানত, পরে চিজিককে তার নৌকোর মাঝি বানাবার পর আরও ভালো করে জানতে পারে ওকে। ওর দৃঢ় ও উন্নত চরিত্র সম্পর্কে খুবই উঁচু ধারণা ছিল তার।

ফেদোস ভেবেছিল 'ঈশ্বরের ইচ্ছেয়' আরও তিন বছর সে ক্যাপ্টেন লুজগিনের সঙ্গে থাকতে পারবে তার নৌকোর কর্ণধার হিসেবে। তারপর পঁচিশ বছরের বাধ্যতামূলক চাকুরী শেষ হবার আগেই তাকে দেওয়া হত চিরকালের ছুটি, সে ফিরে যেতে পারত সিম্বির্স্ক প্রদেশে নিজের ছোট্ট গ্রামটিতে। এই গ্রামটির সঙ্গে বরাবরই সে এক ধরনের যোগাযোগ রেখে এসেছে। প্রতিবছর নিয়মিতভাবে এক লেখাপড়া জানা জাহাজী সঙ্গীকে দিয়ে তার 'প্রিয়তম পিতামাতার' কাছে সে চিঠি পাঠাত। সে চিঠির সবটাই ছিল আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের জন্য শুভকামনা ও শ্রদ্ধায় ভরা।

কিন্তু 'কোপচিকের' একজন নাবিক তার জীবনধারা সম্পূর্ণ পাল্টে দিল। চিজিক তখন মাস্তুলের উপর, নাবিকটি হঠাৎ একটা দড়ি ছেড়ে দেওয়ায় তার দুটো আঙুল গেল থেঁৎলে।

নাবিকটা খেল প্রচণ্ড প্রহার। চিজিককে চটপট ক্রনস্টাডটের নৌ-হাসপাতালে নেওয়া হল, সেখানে তার আঙুল দুটোকে কেটে বাদ দেওয়া হয়। চিজিক দাঁত কামড়ে, একবারও না কাৎরিয়ে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রণা সহ্য করে, যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে স্বেদবিন্দু।

সে আশা করেছিল 'ঈশ্বরের ইচ্ছেয়' 'অকেজো' বলে নৌবাহিনী থেকে ওরা ওকে সরিয়ে দেবে। দপ্তরের কেরানিটি তাকে এরকম আশা দিয়ে পরামর্শ দিয়েছিল। বলেছিল 'ওর জন্য দু কথা' বলে এরকম একটি লোককে সে যেন ধরে। এমন উদাহরণ অনেক আছে!

নিজের হয়ে কথা বলবে এরকম কাউকেই সে জানত না। জানত না কে তার হয়ে বলবে। নিজের উপরিওলার বিরক্তিভাজন হতে একেবারেই চায়নি সে। সেটার ফল কী হবে কেউ জানে না।

অতএব সে নৌবাহিনীতেই বহাল রইল, হল নার্স।

## ৮

এক মাস হয়ে গেল ফেদোস লুজগিনদের কাছে এসেছে।

বলা বাহুল্য যে শুরা তার নতুন নার্সের গড়া জগতে তন্ময়। শুরা ওর মায়ায় সম্পূর্ণ মুগ্ধ। সমুদ্র জীবনে যে প্রচণ্ড ঝড় ঝাপ্টার অভিজ্ঞতা চিজিকের হয়েছে একান্ত আগ্রহ নিয়ে সে তা শুনত; শুনত জাহাজের আর নাবিকদের জীবনের কথা, ভারত মহাসাগরের পরপারের দ্বীপের কালো মানুষ নিগ্রোদের কথা, যারা প্রায় ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়ায়, গভীর জঙ্গল আর অন্য দেশের ফলের গাছ, বানর, কুমীর ও হাঙ্গরদের গপ্প, আশ্চর্য তারায় ভরা আকাশ এবং জ্বলন্ত সূর্যের কাহিনী। বড় হয়ে সে নাবিক হবার সঙ্কল্প জানাল। ইতিমধ্যে চিজিকের হাবভাব নকল করতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল সে। চিজিকই তার আদর্শ।

শিশুর স্বার্থজ্ঞান নিয়ে শুরা ওকে চোখের আড়াল হতে দিত না, দিনভর রাখতে চাইত নিজের কাছে। চিজিক আসার পর থেকে ওর জীবনে মায়ের স্থান হল গৌণ।

এতে অবাক হবার কিছু নেই! মা ত আর চিজিকের মত গপ্প বলতে জানে না। নানা রকমের আশ্চর্য খেলনা, নৌকো, লাটিম, ঘুড়ি প্রভৃতি তৈরীর কথা ছেড়েই দেওয়া যাক ... শুরার কখনো মনে হত না সে একজন খুঁৎখুঁতে স্বভাবের নার্সের কাছে রয়েছে। ওরা দু'জনা ছিল বন্ধুর মত। ওদের কৌতূহল ছিল একই ধরনের — কল্পনাও তাই।

ওদের সম্পর্কের এই ঘনিষ্ঠতা মাদাম লুজগিনাকে অস্থির করে তুলল। সে লক্ষ্য করেছে তার উপর ছেলের টান কমে এসেছে, তাতে সে ঈর্ষাও বোধ

করেছে। তাছাড়া, উঁচু শিক্ষাপ্রাপ্ত আর সম্ভ্রান্ত মহিলাসুলভ স্বভাবের ফলে ভয় হতে লাগল নাবিকটার সঙ্গে মেলামেশা করে ছেলে চাষাড়ে হয়ে যাচ্ছে।

ঐ সঙ্গে একথাও তাকে স্বীকার করতে হল চিজিক বিবেচকের মত তার কর্তব্য করে চলেছে। ওর দেখাশুনোর ফলে শুরাও অনেক ভাল আছে, আগের মত কাঁদুনে বা খিটখিটে নয়। কোন সময় বাইরে যেতে হলে ওর হাতে ছেলেকে রেখে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

এত গুণ থাকা সত্ত্বেও চিজিক কিন্তু মাদাম লুজগিনার কাছে অপ্রীতিকর লোক হয়েই রইল। শুরার খাতিরে ওকে সহ্য করতে হত। কথা বলার দরকার হলে সমাজের সম্ভ্রান্ত মহিলারা যে ভাবে কাটখোট্টা চাষাড়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলে সে রকম কড়া মেজাজ আর স্পষ্ট ঘেন্না নিয়ে ওর সঙ্গে কথা কইত।

ফেদোসের প্রতি তার রাগের আসল কারণ চাকরদের ভিতর যে বাধ্যতা তার পছন্দ, বিশেষ করে তার প্রিয় চাকর ইভানের বিষয়ে যেটা বলা চলে, ফেদোসের মধ্যে তার সম্পূর্ণ অভাব।

চিজিকের হাবভাব ছিল এর সম্পূর্ণ উল্টো। মাদামের সামনে দাঁড়িয়ে অধীনস্থ লোকের মত তার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত, যন্ত্রবৎ উত্তর দেবার সময় বা চুপচাপ গালাগালি খাবার সময় তাকে সব সময়েই মনে হত বিষণ্ণ, গম্ভীর ত বটেই (চিজিক ভাবত 'সোনালী চুলওয়ালী' বৃথাই তার মুখ খারাপ করছে), মাদাম লুজগিনা যেমনটি চাইত সে রকম আদৌ ছিল না সে। মাদাম মনে মনে এই ধারণা করেছিল চিজিক তার কর্তৃত্বকে মোটেই মানে না, ব্যারাক থেকে তাকে বাড়ির কাজে নিয়ে আসায় তার যে উপকার হয়েছে — মাদামের অন্ততঃ সেরকমই ধারণা — তার জন্য এতটুকু কৃতজ্ঞও নয় সে। এ কথা ভেবে তার মেজাজ যেত বিগড়ে।

তার প্রতি 'সোনালী চুলওয়ালীর' মনোভাবটা চিজিকের জানা ছিল। মহিলাটির প্রতি তারও বিশেষ সহানুভূতি ছিল না। তার প্রধান কারণ অল্পবয়সী বেচারা আন্যুৎকাকে সে নির্যাতন করত। প্রতিটি ছোটখাট ব্যাপারে ওকে দিত গালাগালি, ওকে উদ্দেশ করে গলা ফাটাত আর প্রায়ই চড় কষাত ওর গালে — রাগে নয় বিদ্বেষ থেকে, ইচ্ছে করে — মুখে ফুটে উঠত একটা নিষ্ঠুর হাসি।

'জঘন্য খেঁকশেয়ালী!' আন্যুৎকার ভয় পাওয়া মুখের উপর বড় বড় ধূসর আর দুষ্ট চোখ দুটো স্থির করে ওর পাতলা পাণ্ডুর গালের উপর মাদাম লুর্জাগিনাকে তার পুষ্ট, ধবধবে, আংটি-পরা হাত দিয়ে চড় কষাতে দেখে কঠোরভাবে ভ্রূ কুঁচকিয়ে মনে মনে বহুবার এ কথা সে বলেছে।

এই ভ্রূ-তাড়িতা তরুণী মেয়েটার ভয় পাওয়া নীল চোখ দুটো দেখে সে দুঃখ পেত, হয়ত দুঃখের চাইতেও বেশী কিছু, মাদাম লুর্জাগিনা না থাকলে তাকে আদর করে বলত:

'কিছু ভেবো না, লক্ষ্মী মেয়ে ... ঈশ্বরের ইচ্ছেয় বেশী দিন এমন চলবে না ... লোকে বলাবলি করছে শীগগিরই আমরা মুক্তি পাব। আর একটু সহ্য কর — তারপর এ জায়গা ছেড়ে যেখানে খুশি যেতে পারবে। ঈশ্বর জারকে সুবুদ্ধি দিয়েছেন!'

চিজিকের সহানুভূতি-ভরা কথায় ও সান্ত্বনা পেত — কৃতজ্ঞতায় হৃদয় উঠত ভরে। সে জানত চিজিক ওর জন্য দুঃখ পায়। এটাও বুঝেছিল সে থাকায় ঘৃণ্য ইভানটা আগের মত সাহস করে প্রেম জানিয়ে ওকে উত্যক্ত করতে পারছে না।

অন্য দিকে, ইভান তার নীচ মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিজিককে ঘৃণা করতে লাগল। এ ছাড়া, সে ওকে হিংসে করত কারণ তার ধারণা চিজিক এসেছে বলেই তার উপর আন্যুৎকার এত অবহেলা — নিজের চেহারাটাকে সে চোখে-পড়ার-মত মনে করত।

এই ঘৃণা আরও বেড়ে গেল যেদিন চিজিক দেখতে পেল, রান্নাঘরে সে আন্যুৎকাকে জাপ্টে ধরে আছে আর আন্যুৎকা ছটফট করছে।

ফেদোসকে দেখেই সে আন্যুৎকাকে ছেড়ে দিল, কিছুই হয়নি এমনি ভাব দেখিয়ে বলল:

'মুখ্যুটা রসিকতাও বোঝে না ...'

ফেদোসের চেহারা বজ্রগর্ভ মেঘের মত ভয়ঙ্কর।

একটা কথাও না বলে সে সোজা হাজির হল ইভানের কাছে, প্রকাণ্ড লোমশ মুঠিটাকে ওর ফ্যাকাশে চমকান মুখের উপর ধরে কোন রকমে নিজেকে সামলে বলল:

‘এটা দেখতে পাচ্ছিস?’

সেই প্রকাণ্ড মুঠির সামনে ইভান আতঙ্কে চোখ বুজল।

‘ফের কখনো ওকে ছুঁয়েছিস কি, তোর ঐ পচা মুখ থেঁৎলে জেলি বানাব, নোংরা শুয়ার!’

‘আমি ... আমি ... আমি ত কিছু করছিলাম না ... একটু রসিকতা মাত্র...’

‘রসিকতা টের পাওয়াব! ... বেলজ্জ নেড়ি কুত্তা, মেয়েটাকে অপমান করার এতখানি আস্পর্ধা?’

বিচলিত ও কৃতজ্ঞ আন্যুৎকার দিকে ফিরে বলল:

‘ফের যদি ও তোমাকে জ্বালাতে আসে, আমাকে জানাবে। আমি ওর ডগডগে মাংসপিণ্ড সাবাড় করব। আমার যে কথা সেই কাজ!’

রান্নাঘর ছেড়ে চলে গেল সে।

সেদিন সন্ধ্যায় আন্যুৎকা ফিস ফিস করে ফেদোসকে জানাল:

‘এখন ও তোমার নামে আগের চেয়ে অনেক বেশী লাগাবে ... আগে থেকেই সে এটা সুরু করেছে ... সেদিন মাদামকে বলতে শুনেছি রান্নাঘরটাকে তুমি তামাকের দুর্গন্ধে ভরাট করেছ ...’

‘ওর যা খুশি বলুক!’ ঘেন্নার সঙ্গে বলল সে। ‘ইচ্ছেমত বুঝি পাইপও খেতে পাব না?’

‘শস্তা তামাকের গন্ধ মাদাম সইতে পারেন না ...’

‘কি আসে যায় তাতে? আমি ত আর ও ঘরে খেতে যাচ্ছি না ... পাইপ ছাড়া নাবিকের চলে না।’

এ ঘটনার পর ইভানের প্রধান লক্ষ্য হল যেমন করে হোক তার এই ঘৃণ্য গৃহসঙ্গীটিকে বিদেয় করা। মাদাম লুজগিনা ফেদোসকে পছন্দ করে না জেনে তার কানে ফিস ফিস করে ওর নামে লাগাতে লাগল।

খোকাবাবুর সঙ্গে ওর বড় বেশী মাখামাখি, মাদামকে সে বুঝিয়ে বলে, ‘চাকরের মত মোটেই নয়’। মাদাম ওকে যে অত দয়া করেছে তার জন্য ও আদৌ কৃতজ্ঞ নয়। সে আর আন্যুৎকা হামেশাই ফিসির ফিসির করছে ... জঘন্য ব্যাপার।

ইঙ্গিত আর বক্রোক্তির সাহায্যে এসব কথা লাগাল সে, সেই সঙ্গে নিজের বিশ্বস্ততার কথা আবেগের সঙ্গে যোগ করল।

'সোনালী চুলওয়ালী' তার সমস্ত কথাই বিশ্বাস করে বসল, ফেদোসের উপর বেশী করে কঠোর হতে লাগল, কাজ আদায়ের ব্যাপারে কড়া হল। আন্‌্যৎকার উপর রাখল তীক্ষ্ন নজর। যেন হঠাৎ করে, অপ্রত্যাশিতভাবে প্রায়ই হাজির হতে লাগল নার্সারীতে, শুরাকে জিজ্ঞেস করল চিজিক ওকে কি কি কথা বলে। কিন্তু তার দোষের নির্দিষ্ট কোন পরিচয় না পেয়ে মেজাজ হত আরও তিরিক্ষি। এর উপর আবার সে যে চিজিকের উপর চটেছে চিজিকের সেদিকে কোন খেয়ালই দেখা যাচ্ছে না, শ্রদ্ধা দেখাবার আদবকায়দাতেও নেই কোন পরিবর্তন।

চিজিক মনে মনে ভাবত, 'ঈশ্বরের ইচ্ছেয় সোনালী চুলওয়ালী ঠাণ্ডা হয়ে আসবে', যদিও তার রাগী আর অসন্তুষ্ট মুখ দেখে মনে তার আশঙ্কা জাগল।

'সোনালী চুলওয়ালী' কিন্তু চিজিকের দোষ ধরা বন্ধ রাখল না, কিছুদিনের ভেতরেই তার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল।

## ৯

একদিন শনিবারের সন্ধ্যায় ফেদোস স্নানের ঘর থেকে ফিরে এসে শুরাকে শোয়াতে গেল। শুরা তার মনের কথা, সংসারের সবকিছু খবর জানাত চিজিককে। সে বলল:

'তোমাকে এখন কোন্ খবর দেব তা জান, চিজিক?..'

'না, খোকাবাবু। বলত শুনি,' হেসে বলল চিজিক।

'কাল আমরা যাচ্ছি পিটার্সবুর্গে ... ঠাকুরমার কাছে। তুমি আমার ঠাকুরমাকে জান?'

'না, খোকাবাবু।'

'শোনো তাহলে। উনি তোমারই মত দয়ালু, চিজিক ... বাবার মা উনি ... সকালের স্টীমার করে যাচ্ছি আমরা ...'

'ওঃ কী মজা! ঠাকুরমাকে দেখতে পাবে, স্টীমারেও চড়তে পারবে ... প্রায় সমুদ্রে বেড়াবার সমান ...'

একসঙ্গে হলে ফেদোস শুরার সঙ্গে সব সময়েই মিশত অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। ছেলেটির পছন্দও তাই, তাদের বন্ধুত্বের যে নিবিড়তা তার সঙ্গে এটা দিব্যি খাপ খেত। কিন্তু মাদাম লুজগিনার সামনে সে যাতে এতটা আন্তরিকভাবে কথাবার্তা না বলে সেদিকে চিজিক খেয়াল রাখত আর শুরাও জানত মায়ের কাছ থেকে তাদের এতটা ভাবের কথা লুকিয়ে রাখা দরকার।

'এ নিয়ে সে একটা হৈচৈ বাধাবে,' ফেদোস ভাবত। 'একবার ভেবে দেখ বড় লোকের ছেলেকে একটা নাবিক কি না "তুমি!" বলে ডাকছে। যে নাক উঁচু ওর!'

'কাল আমাকে ভোরে তুলে দিও, চিজিক। পরিয়ে দেবে নতুন কোট আর নতুন জুতো...'

'কিছু ভেবো না, তোমার সবকিছু গুছিয়ে রাখব ... নতুন জুতোয় লাগাব একস্ট্রা স্পেশাল পালিশ... চেহারাটাকেও বানাব দারুণ ছিমছাম, দারুণ স্মার্ট।' ওর পোষাক ছাড়াতে ছাড়াতে সানন্দে ও সস্নেহে বলতে থাকে চিজিক। 'আচ্ছা, এবার তোমার প্রার্থনা শেষ কর, লেক্সান্দ্রা ভাসিলিচ।'

শুরা প্রার্থনা বলে বিছানায় ডুব মারল।

'খুব ভোরে তোমায় জাগাব না,' জানাল চিজিক, 'সাড়ে সাতটার আগে নয়। তোমার পুরো ঘুম দরকার। নইলে ক্ষতি হবে ...'

'খোকন আমাদের সঙ্গে যাবে, আন্যুৎকাও — কিন্তু মা তোমাকে রেখে যাবেন, চিজিক। তোমাকেও সঙ্গে নিতে বলেছিলাম কিন্তু মা শুনলেন না ...'

'কেন আমাকে নেবেন? বাড়তি খরচ শুধু।'

'তুমি এলে কী মজাই না হত, চিজিক।'

'আরে, আমাকে ছাড়াও কত আনন্দ পাবে দেখো ... একদিন আমাকে ছেড়ে থাকলে কি ক্ষতি বল... তাছাড়া, আমিও একদিনের ছুটি চাইব। তোমার কি মনে হয় না, আমারও একটু ছুটি দরকার?'

'নিশ্চয়ই, চিজিক। মা তোমাকে আলবৎ যেতে দেবেন ...'

'আমারও তাই মনে হয়। একমাস হয়ে গেল, একবারও বাইরে যাইনি ...'

'কোথায় তুমি যাবে, চিজিক?'

'কেন, প্রথমেই যাব গির্জেয় তারপর দেখা করব কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে ... এর ভেতর আছেন একজন সারেঙ্গ আর তাঁর স্ত্রী... উনি আমার এক পুরোনো বন্ধু... একসঙ্গে আমরা জাহাজে করে পৃথিবী ঘুরেছি। ওদের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে যাব ডকে, হয়ত সেখানে দু'চারজন সঙ্গী পাব ... এই ভাবে কাটিয়ে দেব দিনটা। এবার ঘুমিয়ে পড়, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!'

'গুড নাইট, চিজিক! ঠাকুরমার কাছ থেকে তোমার জন্য কেক আনব ... সব সময়েই আমাকে সুন্দর কিছু দেন তিনি ...'

'তুমিই বরং ওটা খেও, খোকাবাবু!.. কিংবা আনুৎকাকে দিও ... ও খুশি হবে।'

'ওকেও দেব, তোমার জন্যও আনব!' ঘুম-জড়ান গলায় বলল শুরা।

প্রায়ই সে তার নার্সের জন্য মিঠাই নিয়ে আসত, প্রায়ই আনত চিনির তাল। জিনিষটি ফেদোস নিতে চাইত না, শুরাকে 'ভাঁড়ারে হাত' দিতে নিষেধ করে বলত ওতে বিপদ আছে।

ছেলেটির কথায় গভীরভাবে মুগ্ধ সে, তার হেঁড়ে গলা কোমল হয়ে এল:

'তোমার এই দয়ার জন্য ধন্যবাদ... তোমার শিশু হৃদয়টি খাঁটি আর বয়েসের তুলনায় জ্ঞানও তোমার যথেষ্ট ... ঈশ্বর করুন, তুমি সৎ হও, ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তেমনি হয়ে ওঠ ... লোকদের কোন অমঙ্গল তুমি করবে না ... ঈশ্বর তোমাকে ভালবাসবেন। কি, এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে?'

কোন জবাব নেই। শুরা ইতিমধ্যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

বুড়ো নাবিক ওর উপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

শুরারই মত খুশি আর নিরুদ্বেগ বোধ করল সে।

তার নিজের স্নেহ-না-জানা কঠিন নাবিকের জীবনে শিশুটির প্রতি তার গভীর ও আন্তরিক আসক্তি।

## ১০

পরের দিন সকালে মাদাম লুর্জগিনাকে দেখাতে লাগল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও গোলাপি। গন্ধ মাখল সে, পরল সুচারু নীল সিল্কের পোষাক। সোনালী চুলে বিস্তৃত কুঞ্চন, সুডৌল সাদা হাত দুটিতে ব্রেসলেট আর আংটি। পাছে স্টীমার ফেল করে তাই তাড়াতাড়ি কফি খেতে লাগল — এমন সময় ফেদোস ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল:

'মাদাম কি আজ আমাকে বাইরে যাবার ছুটি দেবেন?'

তরুণী চোখ তুলে অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করল:

'কেন বাইরে যেতে চাইছ?'

মুহূর্তের জন্য চিজিক অপ্রস্তুত বোধ করল। এরকম 'বোকা' প্রশ্নের কি জবাব দেওয়া যায়?

'কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করব, মাদাম,' শেষ পর্যন্ত বলল সে।

'কি ধরনের বন্ধু?'

'আমাদেরই দু'একজন খালাসী, মাদাম...'

'বেশ,' একটু ভেবে বলল মাদাম লুর্জগিনা, 'কিন্তু আমি যা যা বলেছি মনে থাকে যেন। এদের কাছে গিয়ে যেন মাতাল হয়ে ফিরো না!' মেজাজটা কড়া।

'কেন তা করতে যাব, মাদাম? সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসব, মাদাম!'

'তোমার মুখদ্য ওজর শুনতে চাইনে। সাতটার ভেতর ফিরে আসা চাই,' ঝট করে বলে উঠল মাদাম লুর্জগিনা।

'হ্যাঁ, মাদাম,' যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে জবাব দিল ফেদোস।

শুরা অবাক হয়ে মায়ের দিকে চেয়ে রইল। সে বুঝতে পারল না মা কেন চিজিকের উপর এত চটে উঠলেন, এমন চমৎকার লোকটিকে তিনি অপছন্দ করেন বলে মনে হচ্ছে অথচ ঐ জঘন্য ইভানটাকে একটা রূঢ় কথাও বলেন না। ওকে খুশি করার শত কৌশল সত্ত্বেও সে ইভানকে সহ্য করতে পারে না।

সবাই চলে গেলে শুরাকেও বিদায় জানিয়ে ফেদোস এল তার শোবার ঘরের

বাক্সটির কাছে, বার করল এক টুকরো কাপড়। এর ভেতর সে রেখেছিল জুতো তৈরী করে রোজগার করা তার 'মূলধন' — কয়েকটি রুবল। (এ কাজে সে ছিল ওস্তাদ। চালু ফ্যাশনের জুতো তৈরী করতে জানায় মাঝে মাঝে অর্ডার পেত কেরানিবাবু, খালাসী আর ভাঁড়ারীর কাছ থেকে)।

'মূলধন' পরীক্ষা করে চর্বি-মাখা একখানা রুবলের নোট রাখল তার ট্রাউজারের পকেটে। এ দিয়ে দু'আউন্স চা, এক পাউণ্ড চিনি আর সামান্য কিছু তামাক কিনবে সে।

বাকি টাকাটা জড়িয়ে রেখে বাক্সে তালা মারল। তারপর বিছানার কাছে মূর্তির সামনে রাখা প্রদীপের শিখা ঠিক করে তৈরী হল বাইরে যাবার জন্য। কয়লা-কালো গোঁফ জোড়া আর জুলপী আঁচড়ে পরল নতুন বুট জোড়া। চকচকে পালিশ-করা তামার বোতাম আঁটা ধূসর নাবিকের কোট গায়ে চড়িয়ে, একটু বেঁকিয়ে টুপিটাকে মাথায় দিয়ে খোশ মেজাজে বাড়ি ছাড়ল।

'আপনি কি লাঞ্চ খেতে আসবেন না?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল ইভান।

'না!..'

'কি মুখ্যু। আচ্ছা চাষাড়ে লোক ত!' ওকে চলে যেতে দেখে ইভান মন্তব্য করল।

নিজে পরেছে ছাই-রঙা ছিমছাম একটা জ্যাকেট, সাদা সার্ট আর জমকাল টাই, পেতলের ঘড়ির চেন শোভা পাচ্ছে ওয়েস্টকোটের উপর। চিজিককে জানলার পাশ দিয়ে যেতে দেখে ঘেন্নায় মোটা ঠোঁট কোঁচকাল। হঠাৎ চোখ দুটো উঠল চকচক করে, মাখন দিয়ে আচ্ছা করে জাবড়ান লালচে চুলের গোছা-ভরা মাথা নাড়তে লাগল সে।

## ১১

সব প্রথমেই ফেদোস গেল সেণ্ট আন্দ্রেইয়ের গির্জায়, পৌঁছল প্রার্থনা সুরু হবার একটু আগে।

একটা মোমবাতি নিয়ে এগিয়ে গেল গির্জার আসনের মাঝখান দিয়ে, মোমবাতিটা রাখল সেণ্ট নিকলাসের মূর্তির সামনে। তারপর ফিরে এল গির্জার

পেছনে। ওখানে ভিড় করে আছে গরীবের দল। যতক্ষণ উপাসনা চলল, দাঁড়িয়ে রইল সে। নিবিষ্ট ও গম্ভীর। চেষ্টা করল পবিত্র চিন্তায় মনকে স্থির রাখতে। প্রবল আবেগে আঁকতে লাগল ক্রুশচিহ্ন। গসপেলের বাণী তার মর্ম স্পর্শ করল, যদিও স্লাভ ভাষার পাঠ বোঝা তার পক্ষে দুষ্কর। গির্জার গাইয়ে দলের সুন্দর সঙ্গীতে মুগ্ধ সে। সব মিলিয়ে জীবনের সমস্ত দুঃখকষ্ট ছাড়িয়ে দূরে চলে যাওয়া মানুষের মত একটি সুউন্নত মানসিক অবস্থায় পেঁাছে গেল চিজিক।

গির্জার সঙ্গীত আর যাজকের নরম মিষ্টি কণ্ঠে প্রেম ও করুণার কথা শুনে মনে হল সে যেন ঢেউয়ে ভেসে ভেসে সম্পূর্ণ এক আলাদা জগতে চলে গেছে। সেই অন্য জগতে, ভাবল সে, তার আর অন্য সব নাবিকদের জীবন হবে অত্যাশ্চর্য—এই পাপে-বোঝাই পৃথিবীর চাইতে অনেক বেশী সুখের...

উপাসনা শেষ হতে, অন্তরে একটি আনন্দময় উন্নত ভাব নিয়ে সে গির্জা থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দা আর সিঁড়িতে ভিখিরিদের ভিড়। বেশীর ভাগ পুরুষ আর বুড়োদের বেছে জনা দশেককে সে এক কোপেক করে দিল।

যাকে সে বলত 'ঐশ্বরিক' ভাব সেই সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বরের চিন্তায় তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগল তিনি যদি পৃথিবীতে অন্যায়ের স্থান রেখে থাকেন তা হল মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য, ধৈর্যশীল ও বহু-ক্লিষ্ট মানুষ পরে যে সুখের জীবন লাভ করবে তারই প্রস্তুতির জন্য (সে জীবনে অবশ্যই 'ক্ষ্যাপা কুকুর' জাতীয় ক্যাপ্টেন বা অফিসারের স্থান নেই)। চিজিক দ্রুত এগিয়ে গেল পাশের রাস্তার একটা ছোট্ট কাঠের বাড়ির দিকে। সেখানে থাকে তার বন্ধু অবসর নেয়া সারেঙ্গ ফ্লেগোন্ৎ নিলিচ আর তার বউ আভ্দোতিয়া পেত্রোভনা। একটি ঘর ভাড়া করে তারা রয়েছে। তার স্ত্রী বাজারে একটা ছোট দোকান চালায়।

দেখতে খাট আর কৃশ কিন্তু ষাট বছর বয়সেও দিব্যি সতেজ শক্তিশালী—বুড়ো নিলিচ রঙীন ঢাকনা দিয়ে মোড়া টেবিলের পাশে বসেছিল। গায়ে ধবধবে সূতির সার্ট, পরনে ঢিলেঢালা ট্রাউজার, খোলা পায়ে জুতো, অস্থিসার ঈষৎ কাঁপা হাতে ভদকা ঢালছে গ্লাসে বিশেষ সাবধানে যাতে এক ফোঁটাও না গড়িয়ে পড়ে।

দিনটা রবিবার। ভাঁজ-পড়া বয়স্ক মুখে বার্ধক্যের ছাপ, বাঁকান নাক আর পরিষ্কার কামান গাল, তারই একটাতে একটা বড় আঁচিল, ক্ষুদে কিন্তু উজ্জ্বল চোখ—তাতে এমন একটি তদ্‌গত ও একাগ্র দৃষ্টি যে ফেদোসকে সে খেয়ালই করল না।

আর ফেদোসও যেন ওর এই পবিত্র কার্যটির মহিমা বুঝতে পেরে যতক্ষণ না নিলিচ সুস্পষ্ট তৃপ্তি নিয়ে কানা-ভর্তি গ্লাসটি শেষ করল, তার উপস্থিতির জানান দিল না।

'ফ্‌লেগোন্‌ৎ নিলিচ! নমস্কার!'

'কে, নির্ঘাৎ ফেদোস নিকিতিচ!' আনন্দে লাফিয়ে ওঠে নিলিচ (এই নামেই বন্ধুরা ওকে ডাকত)। 'এসো ইয়ার, বসো! আভ্‌দোতিয়া পেত্রোভনা এখুনি শিচ নিয়ে আসবেন...'

ভদকার গ্লাসটিকে আবার ভর্তি করে দিল ফেদোসের হাতে।

'আমি এক ঢোঁক খেয়েছি, বুড়ো।'

'তোমার স্বাস্থ্য পান করছি, নিলিচ!' বলল ফেদোস। সানন্দ আওয়াজ তুলে ধীরে ধীরে ভদকায় চুমুক দিল সে।

'এদ্দিন কোথায় ডুব মেরেছিলে?..' জিজ্ঞেস করল নিলিচ। 'ভেবেছিলেম দপ্তরে খোঁজ নেব... যা বাব্বা, লোকটা কি আমাদের ভুলেই মেরে দিল? তোমার মত একজন পুরোনো ইয়ার...'

'ওরা আমাকে চাকর বানিয়েছে, নিলিচ...'

'চাকর?.. কার চাকর?...'

'ক্যাপ্টেন লুজগিনের। জান তাকে?'

'হ্যাঁ, শুনেছি ওর নাম। লোকে বলে ভন্দর। আর এক গ্লাস হোক, কি বল?..' আরও কিছুটা ভদকা ঢালল সে।

'তোমার স্বাস্থ্য, নিলিচ!..'

'আর তোমার, ফেদোস,' নিজেরটা শেষ করতে করতে বলে নিলিচ।

'ওর সঙ্গে থাকতে হাঙ্গামা নেই, কিন্তু ওর বউটি। বলছি দাঁড়াও ...'

'ক্যাঁটকেটে, তাই না?'

'খেঁকশেয়ালী — দারুণ হিংসুক আর ভাবসাবই বা কি! সুন্দরী আর ডবকা, ভাবে ওর আর জুড়ি নেই!..'

'কী করতে হয় তোমাকে?'

'ক্যাপ্টেনের ছেলের নার্স আমি। ছেলেটা ভাল, ফুর্তিবাজ,... ওর ক্যাঁটকেটে মা'টা না থাকলে দিব্যি থাকা যেত ওখানে... কিন্তু শ্রীমতী হলেন ও বাড়ির হর্তাকর্তা বিধাতা ...'

'ক্যাপ্টেন কেমন?'

'বউ তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়। টুঁ শব্দ করার ক্ষমতা নেই। লোকটার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, হলে হবে কি, বউয়ের হাতের মুঠোয়।'

'এই ত হয়ে থাকে, বুড়ো,' ধীরে ধীরে জানাল নিলিচ।

আগে নিলিচও যখন ছিল নামজাদা সারেঙ্গ আর 'বুদ্ধিশুদ্ধিওয়ালা' মানুষ সেও ছিল বউয়ের আঁচলেবাঁধা, যদিও বাইরের লোকদের সামনে এমন ভাব দেখাত যেন নিজেই সে বাড়ির কর্তা।

'মেয়েমানুষ যদি তোমার মাথায় চড়ে বসে, সে হয় আসল শয়তান। তুমি ত জান পুরুষদের মত ওদের বোধশক্তি নেই, একেবারে বাজে,' নিলিচের গলার স্বর নেবে আসতে লাগল, ভয়-পাওয়া চোখে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে সে। 'মেয়েদের ব্যাপারে তোমাকে শক্ত হতে হবে, বোঝাতে হবে আসল কর্তা কে। কিন্তু আমার বুড়ীটা দেরী করছে কেন? যাই, ওকে একটু তাগাদা মারি!..'

কিন্তু সেই মুহূর্তে দরজা গেল খুলে—ঘরে ঢুকল আভ্দোতিয়া পেত্রোভনা। লম্বা, মোটা, বলিষ্ঠ-গড়ন, প্রায় বছর পঞ্চাশেকের শক্তিশালী স্ত্রীলোক কিন্তু সুশ্রী মুখের উপর একটি আশ্চর্য করিৎকর্মা ভাব। আস্তিন গুটোন লাল হাতে একটা সুপের পাত্র ঢাকনা দিয়ে মোড়া। চেহারাটা গরমে সেদ্ধ-হওয়ার মত। ওর পাশে নিলিচ একটা বামন, মনে হল তাকে 'কাজের তাগাদা মারা' ওর পক্ষে একটা অসম্ভব ব্যাপার।

'মনে মনে ভাবছিলাম নিলিচ কার সঙ্গে বকবক করছে। আর সে কি না তুমি, ফেদোস নিকিতিচ!.. শুভদিন, নিকিতিচ!.. ভেবেছিলেম আমাদের তুমি ভুলেই গেছ,' ভরাট, পুরুষালী গলায় বলল সারেঙ্গের বৌ।

পাত্রটাকে টেবিলের উপর রেখে সে পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করল। কর্তাকে জিজ্ঞেস করল:

'বন্ধুকে পান করতে দিয়েছ কি?'

'নিশ্চয়ই! তোমার জন্য বসে থাকব তাই কি ভেবেছিলে?'

আভ্‌দোতিয়া পেত্রোভনা তার স্বামীর দুঃসাহস দেখে যেন অবাক হয়ে গেল, ধোঁয়া-ওঠা সুস্বাদু সুপ ঢালতে লাগল সে, তারপর ছোট্ট তাক থেকে আরও দুটো গ্লাস এনে তিনটে গ্লাসই ভদকা দিয়ে ভর্তি করল।

'এইই ত চাই! আমার পেত্রোভনার বুদ্ধি আছে!' নিলিচের গলায় অনুগ্রহপ্রার্থীর ভাব, ভদকার বোতলের দিকে আদর-ভরা চাউনি।

'আর এক গ্লাস নাও, ফেদোস নিকিতিচ,' বলল সারেঙ্গের বৌ।

চিজিক আপত্তি করল না।

'তোমার স্বাস্থ্য, আভ্‌দোতিয়া পেত্রোভনা! তোমার স্বাস্থ্য নিলিচ!'

'তোমার স্বাস্থ্য, ফেদোস নিকিতিচ!'

'তোমার স্বাস্থ্য, ফেদোস!'

সবাই পান করল গম্ভীর মুখ করে। তারপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে খাওয়া সুরু হল, নিঃশব্দে খেতে লাগল সুপ। মাঝে মাঝে কেবল আভ্‌দোতিয়া পেত্রোভনার গলা শোনা যেতে লাগল:

'আর এক গ্লাস হোক, ফেদোস নিকিতিচ!'

সুপ খাওয়া শেষ হতে হতে ভদকার বোতল খালি হয়ে গেল।

আভ্‌দোতিয়া পেত্রোভনা রান্নাঘর থেকে ভাজা মাংস আর আর এক বোতল ভদকা নিয়ে এল।

স্ত্রীর এই দিল্‌দরিয়াভাবে মুগ্ধ হয়ে নিলিচ চেঁচিয়ে উঠল:

'সত্যি ফেদোস, পেত্রোভনা একটি রমণী রত্ন।'

ভোজনের পর কথাবার্তা বেশ সজীব হয়ে উঠল। নিলিচের কথা গেল জড়িয়ে — বেশী মদ টানায় হতবুদ্ধি। চিজিক আর আভ্‌দোতিয়া — দু' জনার মুখই রক্তবর্ণ, একটু নেশাও ধরেছে কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়নি।

'সোনালী চুলওয়ালী'র সবকিছুই চিজিক ওদের বলল, আন্যুৎকার উপর তার দুর্ব্যবহার, শয়তান ইভানটার কথা এবং ঐ সঙ্গে এই দার্শনিক তত্ত্ব যে ঈশ্বর সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন, মাদাম লুজগিনা যদি এখনও নিজেকে সামলে স্বভাব না শুধরোয় তাহলে নির্ঘাৎ তার নরকবাস হবে।

'তোমার কি মনে হয়, আভ্‌দোতিয়া পেত্রোভনা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ওই বেহায়ার একমাত্র স্থান নরক,' তেজের সঙ্গে জানাল সারেঙ্গের বৌ। 'আমার এক ধোপানী বন্ধুও বলেছে কুত্তীটার মেজাজ কত খারাপ ...'

'নরকে গেলে নির্ঘাৎ ওরা ওকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবে! যত জোরে পারে চাবুক চালাবে যেমন আমাদের দারুণ পেটায় নৌবাহিনীতে!' বলল নিলিচ। সে কল্পনা করল নরক এমন একটি জায়গা যেখানে রুশ রণপোতের মত পাশবিক প্রহার চলে। 'আর ঐ রাঁধুনী ব্যাটার জ্বলজ্বলে মুখটাকে থেঁৎলে দাও। তাহলেই ওর পিছু-লাগা স্বভাব দূর হবে!'

'দরকার হলে, আমিই তা করব ... নোংরা কুত্তা ব্যাটা হল তাই! মায়া বলে কিছুই নেই,' আন্যুৎকার ঘটনাটা মনে করে বলল চিজিক।

পেত্রোভনা তার ব্যবসা সম্পর্কে অভিযোগ জানাল। আজকালকার দোকানদারগুলো পুরো জোচ্চোর, বিশেষ করে কমবয়েসী ছুকরীগুলো। ওরা খদ্দেরকে ভাঙিয়ে নেয় চোখের সামনে।

'আর পুরুষগুলো কি বেহদ্দ জান! সৈনিক আর নাবিকের কাছে এই ছুকরীরা হল মাছের কাছে টোপের মত। কিনবে দু' কোপেকের জিনিষ আর ফুর্তি করতে চাইবে রুবলের, বেহায়ার দল... কোন কোন ছুকরীর আবার এসবের ভারি পছন্দ, ওদের দেখে চোখ টিপছে...'

হঠাৎ যেন ভয়ঙ্কর একটা কিছু স্মরণ করে পেত্রোভনা 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব নিয়ে মাংসল হাতখানা কটির নীচে রেখে চেঁচিয়ে উঠল:

'এখনো পর্যন্ত ব্যাপারটা সহ্য করে আছি কিন্তু এরই মধ্যে একদিন কালো চুলওয়ালী গ্লাশকার চোখ দুটো খুবলে নেব! কার কথা বলছি বুঝতে পারছ? ..' চিজিককে জিজ্ঞেস করে সে। 'ওর ভাতার ত তোমাদেরই মত এক নাবিক ... কোভশিকভ ...'

'বুঝতে পেরেছি কার কথা বলছ... কেন ওর চোখ খুবলাতে চাইছ, পেত্রোভ্না?'

'বদ মেয়েছেলে, তাই! আমার খদ্দের ভাগায়, যত রকম শয়তানী। এই ত কাল আমার দোকানে এসেছিল এক গোলন্দাজ ... আর লোকটাও বুড়ো, মনে হয় বুদ্ধিশুদ্ধি রাখে, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—হতভাগা বুড়োও আচ্ছা... ও ত এল আমার দোকানে, অতএব আমার খদ্দের সে, যে কোন খাঁটি দোকানীর কাজ হল ওকে গেলার জন্য ওর উপর ঝাঁপিয়ে না পড়ে আমারই কাছে থাকতে দেয়া, কিন্তু ওই ছিনাল গ্লাশকাটা বুক ফুলিয়ে ওকে মজাল, ডাক দিল: "আমার কাছে এসো গো, ভদ্দরলোক! এসো বীর সৈনিক!.. আমার জিনিষ শস্তা!" দাঁত দেখিয়ে হাসল... কি হল বলে মনে করছ। ছুকরী ওকে "বীর সৈনিক" বলে ডাক দেওয়ায় ঐ থ্যাবড়া বুড়ো কুত্তাটা ডগমগ হয়ে ওর দোকান থেকে জিনিষ কিনল। এ জন্যে ওদের যা বলা উচিত তার অর্ধেকও আমি বলিনি। ওরকম বেহায়াকে কথা বলেই বা কি লাভ!'

ওরা দু'জনে (বিশেষ করে নিলিচ) জানে ক্ষেপলে আভ্দোতিয়া যে কোন সারেঙ্গের মতই মুখ খারাপ করতে পারে এবং তার রসনার শক্তি এমনই যে যে কোন লোক তাতে শায়েস্তা হয়। এজন্যে খদ্দের বা দোকানী দু তরফই সন্ত্রস্ত থাকত।

তাই পুরুষরা চক্ষুলজ্জার জন্যই থাকত চুপ করে।

'হ্যাঁ, এমনি কাজ আবার করলে আমি ওর চোখ খুবলে নেব!' পেত্রোভনার পুনরুক্তি।

'এরকম করতে আর ও সাহস পাবে না!.. বিশেষ করে তোমার মত চতুর রমণীর সঙ্গে!' বলল নিলিচ।

যদিও তাকে ইতিমধ্যে 'বেশ নেশায় ধরেছে' সে কূটনীতিকের চাতুরী নিয়ে তার বউয়ের বহুবিধ গুণ বর্ণনা করতে সুরু করল... আশ্চর্য চতুর সে, অপূর্ব গৃহিণী, রান্নায় পাকা... সব মিলিয়ে ক্রনস্টাড্টে তার সমান রমণী নেই। এরপর সে একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করল — এক গ্লাস করে বিয়ার — কেবল ছোট্ট একটি গ্লাস ঠিক এই মুহূর্তে অসম্ভব ভাল লাগবে ...

'তোমার কি মত, পেত্রোভনা?' মন ভুলান কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে স্ত্রীকে।

'বুড়ো বাজটার মজা দেখো!.. ও, এই তাহলে তোমার মতলব? বুঝি মন ভেজাতে চাইছ আর তারই জন্য এই তোষামোদ, বুড়ো শেয়াল!'

কিন্তু পেত্রোভনার কথাতে রঙ ধরেছে, স্পষ্টই বোঝা গেল বিয়ারের প্রস্তাবটি ভালই মনে হল তার। একটা শাল গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

কয়েক মিনিট বাদেই ফিরে এল, সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো বিয়ারের বোতল টেবিলের উপর শোভা পেতে লাগল।

'আহা কত দ্রুত, কী চটপটে আমার এই পেত্রোভনা... ঈশ্বর, কী রমণীই না সৃষ্টি করেছ!' দু'গ্লাস বিয়ার মেরে মাতালের আবেগ নিয়ে একই কথা আওড়াতে লাগল নিলিচ।

'দেখো, এর মধ্যেই একেবারে সাবাড়!' বিদ্রূপ করে বলল পেত্রোভনা।

'কে, আমি? আমার মত ঝানু সারেঙ্গ হবে সাবাড়? দিয়ে দেখো না আরও দু' বোতল... একটানে মেরে দেব... আচ্ছা প্রিয়ে, ঢাল ত আর একটি গ্লাস...'

'না, ঢের হয়েছে ...'

'পেত্রোভনা! তোমার স্বামীর কথা শোনো ...'

'যথেষ্ট!' পেত্রোভনার রূঢ় জবাব।

নিলিচের ক্ষুব্ধ ভাব।

চারটে বাজতে ফেদোস বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিল। আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। মাথা ঘুরছিল তার কিন্তু শক্ত হয়ে হাঁটতে লাগল সে। রাস্তায় সেলাম জানাতে লাগল অফিসারদের সৈনিকসুলভ ফুর্তি নিয়ে। সবচেয়ে খোশ মেজাজে থাকা সত্ত্বেও সবার জন্যই তার ভয়ঙ্কর দুঃখ হতে লাগল: দুঃখ আন্যুৎকার জন্য, রাস্তায় দেখা একটা ছোট্ট বাচ্চার জন্য, পাশ দিয়ে দৌড়ে-পালান বিড়ালটার জন্য এবং স্বয়ং অফিসারদের জন্য যারা তাদের আসন্ন সর্বনাশের দিকে খেয়াল করছে না, ভুলে আছে সর্বদর্শী ঈশ্বরকে ...

দরকারী জিনিষ কিনে পেত্রোভস্কি জেটিতে হাজির হল সে, সেখানে গপ্প করল তার জানা কয়েকজন নাবিকের সঙ্গে। এরা হল অফিসারদের ছুটির সময়কার

নৌকোর দাঁড়ী, এদের কাছ থেকে শুনল 'কোর্পাচিক' তখন রেভেলে। সাতটায় লুজগিনদের কাছে সে ফিরে এল।

সানন্দে ঘেউ ঘেউ করে লাইকা তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

'শুভ সন্ধ্যা, লাইকা! কি খবর বল্?' সস্নেহে পিঠ চাপড়িয়ে বলল সে। 'খাওয়া জুটেছে কিছু? আমি বলতে পারি ওরা তোকে খেতে দেয়নি ... সবুর কর একটু, তোকে কিছু এনে দিচ্ছি ... রান্নাঘরে নিশ্চয়ই কিছু আছে ...'

ইভান বসে আছে রান্নাঘরের জানলায় — বাজাচ্ছে হার্মনিয়াম। ফেদোস মদ খেয়েছে দেখে তৃপ্তির সঙ্গে হেসে জিজ্ঞেস করল:

'সময়টা বেশ কাটল, কি বলুন?'

'মন্দ নয়।'

ইভানকে সারাদিন একা একা কাটাতে হয়েছে ভেবে দুঃখ পেয়ে ফেদোস বলল:

'মাদাম যখন ফিরে আসেননি, তুমি এখন একটু বাইরে যেতে পার। বাড়ি দেখব আমি ...'

'এখন আর সময় নেই ... সাতটা বেজে গেছে! মাদাম এলেন বলে ...'

'যেমন ইচ্ছে। কুকুরটার জন্য হাড়টার আছে কি? ..'

'ওখানে, তাকে রয়েছে ...'

চিজিক লাইকাকে হাড় দিয়ে রান্নাঘরে ফিরে হঠাৎ বলে উঠল:

'বলছিলাম কি, ভদ্রভাবে থাকার চেষ্টা করো না, ভাই ... সত্যি বলছি, অহঙ্কারের ভাবটা বাদ দিতে পারো না? একদিন ত আমাদের সবাইকেই মরতে হবে ... পরলোকে কিন্তু এরকম স্বভাব বরদাস্ত করবে না, জেনো।'

'কোন স্বভাবের কথা বলছেন আপনি?'

'সব রকমেরই ... ধরো, আন্যুৎকার উপর জবরদস্তি ... পশুবলের দ্বারা কোন মেয়ের মন পাওয়া যায় না ... তাছাড়া, দেখতে পাচ্ছ ও তোমাকে চায় না... বরং অন্য কোন মেয়ে দেখো ... কমবয়েসী মেয়ের সঙ্গে ওরকম ব্যবহার লজ্জার কথা ... এমনিতেই ত কত খারাপ ব্যবহার ও পাচ্ছে!' চিজিক বন্ধুভাবে কথা বলতে থাকে। 'আর আমাদের উচিত একসঙ্গে শান্তিতে বাস করা ... সব সময় ঝগড়াঝাঁটির কী দরকার ... রাগ করে এ সব বলছি না, জেনো।'

'হয়ত আন্নুৎকার উপর আপনার নিজেরই নজর পড়েছে? তাই কি তাকে নিয়ে আপনার এত মাথা ব্যথা?..' বিদ্রূপ করল ইভান।

'বোকার মত কথা বলো না !.. আমি ওর বাবার বয়েসী।'

যাই হোক, চিজিক আর এ সব নিয়ে কথা বলল না, কিছুটা বিব্রত হল সে।

ইভান মন ভোলান মিষ্টি গলায় বলতে থাকে:

'আপনার সঙ্গে শান্তিতে বাস করার চাইতে আমার আর কোন ইচ্ছে আছে, ফেদোস নিকিতিচ ... কিন্তু আপনিই ত আমাকে অত ঘেন্না করেন ...'.

'তাহলে তোমার এ সব অভ্যেস ছেড়ে দাও ... মনে রেখো তুমি একজন নাবিক, তাহলে কেউ আর তোমাকে ঘেন্না করবে না... চাকর হয়েছ বলে কি ভদ্রতাবোধ জলাঞ্জলি দেবে?.. কর্ত্রীর কানে কথা লাগাচ্ছ। ভেবে দেখো ত জিনিষটা... লজ্জার ব্যাপার নয়কি!..'

এমন সময় সামনের দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। ইভান দৌড়ে গেল দরজা খুলতে।

ফেদোসও গেল শুরাকে আনতে।

মারিয়া ইভানভনা ফেদোসের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে বলল:

'তুমি মাতাল হয়েছ!'

শুরা ওর দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল কিন্তু মা সজোরে ওর হাত ধরে টেনে রাখল।

'যাসনে ওর কাছে। ও মাতাল!'

'আমি মাতাল নই, মাদাম... আদৌ মাতাল নই। কেন ও রকম ভাবছেন?.. আমার সব কাজ ঠিক ঠিক করব... বাচ্চা মাষ্টারকে বিছানায় শুইয়ে আগেরই মত গপ্প বলব... সারেঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে একটু খেয়েছি সত্যি কিন্তু মাত্রা রেখে, মাদাম... সত্যিই তাই।'

'দূর হও!' চেঁচিয়ে উঠল মাদাম লুজগিনা। 'কাল কথা হবে।'

'মা ... মা ... চিজিক আমাকে শুইয়ে যাক!'

'আমি নিজে তোমাকে শুইয়ে দেব! মাতালের হাতে এ কাজ দেওয়া চলে না।'

শুরা কেঁদে ফেলল।

'থামাও কান্না, বদমাস ছেলে!' মা চেঁচিয়ে উঠল। 'আর এই মাতাল, এখনো ওখানে দাঁড়িয়ে আছো? এই মুহূর্তে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

'ও, মাদাম, মাদাম,' চিজিকের মুখে এমন একটি ভাব যাতে দুঃখ ও তিরস্কার মেশান। রান্নাঘরে চলে গেল সে।

শুরা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ইভান হাসল জয়ের হাসি।

## ১২

পরের দিন সকালে ফেদোস যথারীতি ছ'টায় উঠল। মানসিক অবস্থা খুবই বিষণ্ণ। বুঝল গত রাতের ঘটনা নিয়ে মাদাম লুর্জাগিনা তার সঙ্গে 'কথা বলবেন' বলে যে শাসিয়েছে, তাতে তার কোন মঙ্গল হবে না। গোড়া থেকেই তার জানা আছে তাকে দেখলেই ওর ঘেন্না হয়, তার সবতাতেই দোষ বার করে। মনমরা অবস্থায় সে টের পেল তার ঐ 'কথার' মানে কি দাঁড়াবে। যতই এ নিয়ে ভাবতে লাগল ততই বিষণ্ণ হয়ে উঠল। সে যে কত অসহায় এবং এই 'সোনালী চুলওয়ালীর' উপর কতখানি নির্ভরশীল তা হাড়ে হাড়ে টের পেল, যেমন করেই হোক সে তার 'কর্ত্রী' হয়ে বসেছে, তার ভাগ্য ওরই হাতের মুঠোয়।

'মুস্কিল এই যে ও আমাকে ঘেন্না করে, মানুষের চরিত্র বোঝার মত লোক নয় সে,' মনে মনে বলল সে। ও যে নির্ঘাৎ নরকে যাবে এ চিন্তায় বিশেষ সান্ত্বনা পেল না, স্ত্রীরূপী এই 'শয়তানীকে' আদর দিয়ে মাথায় তোলার জন্য মনে মনে ক্যাপ্টেন লুর্জাগিনকে শাপান্ত করল। ঠিক ভাবে নিজের হাতে না রেখে, সে...

অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায় ফেদোস বাইরে গিয়ে বারান্দার সিঁড়িতে বসে রইল। সামোভারটি গরম হওয়ার আশায় পাইপের পর পাইপ তামাক টানতে লাগল।

ইতিমধ্যে উঠোনে প্রাণের সাড়া জেগেছে। একটা মোরগ থেকে থেকে পাগলের মত ডাক ছাড়ছে — অভ্যর্থনা জানাচ্ছে আনন্দ-ভরা বাসন্তী ভোরকে। সবুজ বাগানে চড়ুইদের কিচিরমিচির আর রোবিনের গান চলেছে। বাবুইরা সাঁ করে

এখানে সেখানে হাজির হচ্ছে, মুহূর্তের জন্য বাসার ভিতর ডুব মেরে একটু বাদেই খাবারের খোঁজে বাইরে আসছে।

সাধারণতঃ এই সব দৃশ্য তার মনে যে আনন্দময় অনুভূতি জাগাত আজকের সকালটিতে ফেদোসের মনে সে অনুভূতি এল না। লাইকা যখন ঘুম থেকে উঠে, গা টান করে সানন্দে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে তার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল, বুড়ো নাবিক ওর গায়ে চাপড় মেরে বলল (নিজে সে যে চিন্তায় নিবিষ্ট তারই যেন প্রতিধ্বনি):

'আমাদের জীবনও তোরই মত, বুড়ো... আপন কর্তাকে আমরা বাছতে জানি না...'

রান্নাঘরে ফিরে সদ্য-জাগা ইভানের দিকে তাকাল ঘেন্নার সঙ্গে, সত্যিই সে কতটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তা ওকে না দেখাবার জন্য একটা রুক্ষ, উদাসীন ভাব নিল। মাদাম লুর্জাগিনা যখন গত সন্ধ্যায় তাকে গালাগালি দেয় সে লক্ষ্য করেছে ইভানের তখন কত আনন্দ। ওকে আমল না দিয়ে রান্নাঘরের টেবিলে বসে চা খেতে লাগল সে।

আন্যুৎকা এল রান্নাঘরে, তখনও ঘুম ঘুম ভাব, চুল এলোমেলো, ফ্যাকাশে গাল দুটো ঈষৎ রক্তাভ, হাতে মাদাম লুর্জাগিনার পোষাক ও বুট জুতো। গত সন্ধ্যার ঘটনার পর ফেদোসকে সে সম্ভাষণ করল বন্ধুর মত কিন্তু ইভানের ভদ্রতা দেখান 'শুভপ্রভাতের' কোন জবাব দিল না।

চিজিক তাকে কিছুটা চা আর এক টুকরো চিনি দিল। তাড়াতাড়ি দু' পেয়ালা শেষ করে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল সে।

'আর একটু খাও... অনেক চিনি আছে,' বলল ফেদোস।

'ধন্যবাদ, ফেদোস নিকিতিচ। কিন্তু আমাকে এখখুনি যেতে হবে, মাদামের পোষাক ধুতে হবে এখন। বাচ্চাটাও উঠতে পারে ...'

'তোমার কাজটা আমি করে দিচ্ছি, তুমি ততক্ষণ চা খাও,' ইভান প্রস্তাব জানাল।

'তোমার সাহায্যে আমার দরকার নেই,' চট করে কথাটা বলে আন্যুৎকা বেরিয়ে গেল।

'কি রাগ রে, বাবা!' বলল ইভান।

বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠে চিজিকের দিকে চোরা চাউনি ফেলে সাহ্লাদে ভাবল:

'আজকে টের পাবে, বাছাধন!'

ঠিক আটটায় চিজিক শুরাকে তুলতে গেল। ছেলেটি এর মধ্যেই জেগেছে, গত রাতের কথা ভেবে সে অস্বস্তি আর দুঃখ পাচ্ছে। এই বলে সে ফেদোসকে সম্বোধন জানাল:

'ভয় পেয়ো না, চিজিক!.. কিছু হবে না তোমার!..'

এমনি করে সে বন্ধুকে ও নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চাইল। কিন্তু 'কিছুই যে হবে না' সে সম্বন্ধে ততটা নিশ্চিত সে নয়।

'ভয় পাই চাই নাই পাই, ঈশ্বরের যা ইচ্ছে তাই হবে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল চিজিক। 'সব কিছুই নির্ভর করছে আজ সকালে তোমার মা বিছানার কোন দিক দিয়ে নাবেন তার উপর!'

'তার মানে?'

'এটা একটা প্রবাদ: মানে, উনি কি রকম মেজাজে আছেন তাই ... কিন্তু গত রাতে আমি মাতাল ছিলাম, এটা তোমার মা ভুল ভেবেছেন ... মাতালরা ওরকম থাকে না। কোন লোক যদি তার কাজ ঠিক ঠিক করতে পারে তাহলে তাকে মাতাল বলবে কি করে?..'

শুরা সম্পূর্ণ একমত হয়ে বলল:

'আমিও মাকে তাই বলেছি। তুমি আদৌ মাতাল নও, নাম না করাই ভাল ... আন্‌তোন যখন মদ খেত হাঁটবার সময় তার পা টলত কিন্তু তুমি মোটেই টলনি ...'

'ঠিক তাই ... তুমি বাচ্চা হলেও বুঝেছিলে আমি ঠিক ছিলাম ... আমার মাত্রাজ্ঞান আছে ... আর তোমার বাবাও আমাকে কাল দেখলে কিছু মনে করতেন না, বুঝতেন আমি মাত্রা রেখে খেয়েছি ... তিনি জানেন ছুটির দিনে নাবিকদের একটু আনন্দ করা স্বাভাবিক ... এতে কেউ খারাপ হয়ে যায় না। তবুও তোমার মা রাগ করেন। কেন? কী করেছি আমি তাঁর?..'

'আমি মাকে বলব তোমার উপর রাগ না করতে ... সত্যি বলব আমি!..'

'ধন্যবাদ, খোকাবাবু... আমি নিশ্চয় জানি তুমি বলবে। তোমার মনটা ভালো ... কিন্তু এখন গিয়ে চট করে তোমার প্রাতরাশ খেয়ে নাও। ততক্ষণে আমি তোমার ঘর ঠিক করে ফেলি,' ছেলেটিকে পোষাক পরাতে পরাতে বলল সে।

কিন্তু যাবার আগে শুরা তার নার্সের হাতে একটা আপেল আর লজেন্স দিয়ে বলল:

'এ হল তোমার, চিজিক! আন্যুৎকার জন্যও এনেছি!'

'ধন্যবাদ, খোকাবাবু। তুমি অন্য সময় খাবে বলে রেখে দিই, সেই ভাল।'

'না, না। এ তোমার জন্য। আপেলটা ভালো, খুব মিষ্টি ... আমি যাচ্ছি মাকে বলতে তিনি যেন তোমার উপর রাগ না করেন। আমি চললাম।'

এই বলে ছেলেটি প্রাতরাশ খেতে চলে গেল, চেহারায় তার উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা।

'একটা বাচ্চা মাত্র, তবু জানে মা তার কী রকম!' ফেদোস বিড় বিড় করে বলল, ঘর সাফ করতে লাগল দারুণ উৎসাহে।

## ১৩

পাঁচ মিনিটও হয়নি আন্যুৎকা ছুটে এল নার্সারীতে চোখের জল মুছতে মুছতে।

'ফেদোস নিকিতিচ! মাদাম তোমাকে ডাকছেন!'

'কাঁদছ কেন?'

'উনি আমাকে মেরেছেন, চাবুক লাগাবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন ...'

'জানোয়ার!.. কিন্তু কেন?'

'আমার মনে হয় শয়তান ইভানটা আবার কান ভাঙিয়েছে ... উনি এইমাত্র রান্নাঘরে গিয়েছিলেন, বেরিয়ে এলেন একেবারে উন্মাদ ...'

'নীচ লোক নীচু কথা শোনে।'

'কিন্তু ফেদোস নিকিতিচ... গত রাতের জন্য ওঁর কাছে ক্ষমা চাও। নইলে, উনি ...'

'কী করেছি যে ক্ষমা চাইব?' চিন্তিতভাবে বলল ফেদোস, গেল খাবারঘরে।

স্পষ্টই মাদাম লুর্জাগিনা সেদিন সকালে খারাপ দিক দিয়ে বিছানা থেকে নেবেছিল কারণ সে টেবিলের সামনে বসেছিল জ্বলন্ত চোখ নিয়ে। চিজিক যখন ঘরে ঢুকে সমীহভরে তার সামনে টান হয়ে দাঁড়াল, সে এমন ভয়ঙ্কর আর কঠিন চোখে চাইল তার দিকে যে চিজিক আরও বিষণ্ণ হয়ে গেল।

বিচলিত, স্তব্ধ হয়ে আছে ছোট্ট শুরা, একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে বলে আশঙ্কা করছে। জল-ভরা চোখে অনুনয়ের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মায়ের দিকে।

কয়েক সেকেন্ড কাটল তীক্ষ্ন স্তব্ধতায়।

মাদাম লুর্জাগিনা নিশ্চয়ই আশা করছিল মদ খাওয়ায় আর তার কথার পিঠে কথা বলায় চিজিক তার কাছে ক্ষমা চাইবে।

কিন্তু বুড়ো নাবিকটার ভেতর দোষী লোকের হাবভাবের নামগন্ধও নেই।

আর এই 'চাষাড়ে লোকটার' 'একগুঁয়েমীতে' সে ভাবল; চিজিক ওর কর্তৃত্ব মানে না — এতে চটে গেল আরও। চাকরবাকরদের পুরোপুরি দাস মনোভাবে সে অভ্যস্ত।

'কাল রাতে কী বলেছি মনে আছে?' শান্ত, তেজাল গলায় শেষ পর্যন্ত বলে উঠল মাদাম লুর্জাগিনা।

'হ্যাঁ, মাদাম। মনে আছে। আমি ত মাতাল হইনি, সুতরাং মনে কেন থাকবে না?'

'মাতাল নও?' বিদ্রূপের সুরে বলল মাদাম লুর্জাগিনা। 'বোধ করি পায়ের উপর খাড়া থাকতে না পারলেই কেবল তুমি তাকে মাতাল ভাব?..'

ফেদোস কিছুই বলল না। এই হাস্যকর প্রশ্নের কী জবাব সে দেবে?

'যখন প্রথম এখানে এসেছিলে, কী বলেছিলাম তোমাকে? বলেছিলাম কি না যে কিছুতেই মদ খাবে না। কাঠের মত দাঁড়িয়ে থেকো না! জবাব দাও!'

'হ্যাঁ, মাদাম।'

'আর ভাসিলি মিখাইলভিচ কি বলেননি তুমি আমার কথামত চল্বে — কখখনো আমার কথার উপর কথা বলবে না?' একই নিরুদ্বিগ্ন গলায় জেরা চলতে লাগল।

'হ্যাঁ, মাদাম।'

'আর এই বুঝি তোমার আদেশ পালনের কায়দা?.. কর্ত্রীর সঙ্গে কী করে কথা কইতে হয়, আমি তোমায় শেখাব!.. আমার সঙ্গে ফাঁকিবাজী আর পেছনে প্রেমের খেলা চালাতে দেব না... সবকিছুই আমি জানি!' আন্যুৎকার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল মাদাম।

এটা ফেদোসের সহ্যের বাইরে।

'এ সত্যি নয়, মাদাম ... ভগবানের নামে শপথ নিয়ে বলছি এরকম কিছুই ঘটেনি এখানে... পাজি রাঁধুনীটার সব কথা বিশ্বাস করা আপনার ইচ্ছে, মাদাম... আরও অনেক বেশী মিথ্যে সে আপনাকে লাগাবে!'

'চোপরাও! আমার সঙ্গে এভাবে কথা কও — এত বড় আস্পর্ধা তোমার! আন্যুৎকা! আমাকে কালি কলম আর কাগজ এনে দে!'

'মা!' অনুনয়-ভরা কাঁপা গলায় কেঁদে উঠল শুরা।

'দূর হ আমার সামনে থেকে!' চেঁচিয়ে উঠল মাদাম।

'মা ... সোনা মা আমার!.. দয়া করো, দয়া করো... আমায় ভালবাসলে ... চিজিককে দপ্তরে পাঠিও না ...'

শুরার শরীর কাঁপছে থর থর করে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে ছুটে গিয়ে সে মায়ের হাতে চুমো খেতে লাগল।

ফেদোসের গলা আবেগে ভারি হয়ে এল। বাচ্চার প্রতি কৃতজ্ঞতার উষ্ণ আবেগে মুখের বিষণ্ণ ভাব এল নরম হয়ে।

'বেরিয়ে যা!.. এ তোর ব্যাপার নয়!'

ছেলেটাকে এক পাশে ঠেলা মেরে মাদাম চেঁচিয়ে উঠল। মা সত্যিই এ কাজ করতে পারে একথা তার বিশ্বাস করা অসম্ভব। শুরা চলে গেল ঘরের আর এক কোণায় — কাঁদতে লাগল আকুলভাবে।

ইতিমধ্যে মাদাম লুজগিনা দ্রুত, কাঁপা হাতে নৌদপ্তরের সহকারী অফিসারকে একখানা চিঠি লিখল — তাতে অনুরোধ জানাল 'সামান্য একটু অনুগ্রহ করে' তার আর্দালিকে মাতলামি আর ঔদ্ধত্যের জন্য তিনি যেন চাবুক লাগান। চিঠির শেষে যোগ করল সঙ্গীত জলসায় আসছে কাল সে যাচ্ছে ওরানিয়েনবাউমে, আশা করছে উনিও দয়া করে তাঁর সঙ্গ দেবেন।

চিঠিটাকে খামে পুরে চিজিকের হাতে দিয়ে বলল:

'এখুনি নৌদপ্তরে গিয়ে এ্যাডজুটেণ্টকে চিঠিখানা দাও।'

'হ্যাঁ, মাদাম,' ঘন ভ্রূ কুঁচকে, উত্তেজনা গোপন রাখার চেষ্টা করে ধরা গলায় বলল চিজিক।

শুরা ছুটে এল মায়ের কাছে।

'মা! এ কাজ করো না মা!.. চিজিক!.. একটু থাম! যেও না!.. ও যে কত ভালো, মা ... কত আশ্চর্য ... মা-মণি আমার ... দয়া করো ... এটা করো না মা!'

'যাও!' মাদাম চেঁচিয়ে বলল চিজিককে। 'কি করে আমার এই মুখ্যু ছেলেটাকে এরকম বানিয়েছ, আমার জানা আছে ... ভেবেছিলে ওকে দিয়ে আমাকে নরম করবে, তাই না?..'

'আমি ওকে ওরকম বানাইনি, বানিয়েছেন ভগবান! আপনিও তাঁকে একদিন স্মরণ করবেন, মাদাম!' বলল ফেদোস, কণ্ঠে কঠোর গাম্ভীর্য। শুরার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে দরজা খুলে সে চলে গেল।

'তুমি বিকট ... তুমি দুষ্টু ... তোমাকে আর ভালবাসি না!' শুরা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। এ রকম অন্যায় দেখে রাগে আর বিরক্তিতে সে ক্ষেপে গেল। 'আর তোমাকে ভালবাসব না!' সে যোগ করল, জল-ভরা চোখ দুটো চক চক করছে।

'ও, এখন তুই এই ব্যবহার শিখেছিস! পাজিটা তোকে তবে এই শিক্ষাই দিচ্ছিল! মায়ের সঙ্গে তুই এ ভাবে কথা বলিস?'

'চিজিক পাজি নয়... সে ভাল লোক! তুমিই হলে বদ... তুমি দুষ্টু!' হতাশ অবস্থার বেপরোয়া সাহস নিয়ে শুরা বলতে থাকে।

'কী করে মায়ের সঙ্গে কথা কইতে হয়, তোকে শেখাচ্ছি, বাঁদর! আনুৎকা! ইভানকে বল একটা ডাল আনতে...'

'বেশ ত, পেটাও না আমাকে ... তুমি জঘন্য ... দুষ্টু ... মার না আমাকে!' শুরা পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে তার ছোট্ট মুখখানা মরার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল, সারা শরীর কাঁপতে লাগল থর থর করে, বিস্ফারিত আতঙ্কে চেয়ে রইল দরজার দিকে ...

ফেদোস তার কোটের আস্তিনের কফে মাদাম লুর্জাগিনার চিঠি নিয়ে উঠোন পেরিয়ে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে প্রহার খাওয়া বাচ্চাটার মর্মভেদী কান্না শুনতে পেল। চিঠিতে কী আছে, তা নিয়ে তার কোন সন্দেহই ছিল না।

সেই মুহূর্তে ছোট্ট ছেলেটির জন্য দারুণ অনুকম্পা আর ভালবাসা টের পেল সে। চাকুরীর মেয়াদ শেষ হবার মুখে সে নিজেই যে চাবুক খেতে চলেছে সে কথা একেবারেই ভুলে গেল। যে শিশু তারই জন্য এত কষ্ট আর শাস্তি পাচ্ছে তার উপর মায়া পড়ল আগের চাইতেও বেশী।

'কত বড় পশু! নিজের সন্তানের জন্যও মায়া নেই,' ঘেন্নার সঙ্গে কথাটা ভাবতে লাগল সে। ছেলেটির কান্না কখনও করুণ, মিনতি-ভরা, কখনো বা শিকার-করা ক্ষুদে জানোয়ারের চিৎকারের মত। একে এড়াবার জন্য দ্রুত পা চালাল সে।

## ১৪

দপ্তর অফিসের ভারপ্রাপ্ত তরুণ অফিসার মাদামের চিঠি পড়ে অবাক হল। এক সঙ্গে চিজিকের সাথে সে কাজ করেছে, তাকে জানে সেরা নাবিক বলে, মাতলামি বা অশ্লীলতার নামগন্ধও নেই ওর ভেতর।

'এ সব কি, চিজিক? তুমি মদ খেতে শুরু করেছ?'

'না, স্যার ...'

'কিন্তু মারিয়া ইভানভনা লিখছেন ...'

'হ্যাঁ, স্যার ...'

'কী ব্যাপার তাহলে? খুলে বল।'

'কাল উনি আমাকে বাইরে যাবার ছুটি দিয়েছিলেন। একটু মদ খেয়েছিলাম, স্যার, কিন্তু সন্ধ্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসি, সম্পূর্ণ সজ্ঞানে, স্যার ...'

'তারপর?'

'কিন্তু মাদাম ভাবলেন আমি মাতাল হয়েছি ... মেয়ে বলে ওঁর ধারণা নেই মাতলামি কি জিনিষ ...'

'আর তোমার এই অসভ্যতার ব্যাপারটা কী? তুমি কি ওঁর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছ?'

'না, স্যার। আমি ত অভদ্র হইনি। শুধু বলেছিলাম উনি ওঁর রাঁধুনীটার কুৎসিৎ কথায় কান দিচ্ছেন ...'

যা যা ঘটেছে চিজিক তার সঠিক বর্ণনা দিল।

অফিসারটি কয়েক মিনিট ব্যাপারটা ভেবে দেখল। মারিয়া ইভানভনাকে সে জানত। এক সময় 'ওর উপর ঝোঁকও ছিল' তার, এও জানা ছিল চাকরবাকরদের ব্যাপারে সে অত্যন্ত কড়া আর খামখেয়ালী। ক্যাপ্টেন লুর্জাগিন প্রায়ই চাকরদের পাঠাত শাস্তির জন্য। ওটা স্পষ্টই মাদামের প্ররোচনায় কারণ ক্যাপ্টেন লোকটা ভদ্র ও দয়ালু কিন্তু জঘন্য স্ত্রৈণ।

'সে যাই হোক, চিজিক, আমাকে মাদামের কথামতই চলতে হবে,' অস্বস্তির সঙ্গে চিজিকের উপর থেকে চোখ সরিয়ে শেষ পর্যন্ত জানাল তরুণ অফিসার।

'হ্যাঁ, স্যার।'

'বুঝতে পারছ, চিজিক, উনি যা বলেছেন তা বিশ্বাস করতেই হবে ...' 'করতেই' কথাটার উপর জোর দিয়ে বলল, 'আর ভাসিলি মিখাইলভিচ আমাকে বলেছেন চাকরদের শাস্তির ব্যাপারে তাঁর স্ত্রীর আদেশকে নিজের বলে মনে করতে।'

চিজিক শুধু একটা জিনিষই বুঝতে পারল — 'সোনালী চুলওয়ালীর' আদেশমত সে চাবুক খেতে চলেছে। কিছুই বলল না সে।

'এ ব্যাপারে সত্যি আমার কিছু করার নেই,' অনেকটা ক্ষমা চাওয়ার ভাবে জানাল অফিসার।

সে ভাল করেই জানত একজন মেয়ের আদেশে নাবিককে শাস্তি দেওয়া অন্যায় — আইনবিরুদ্ধ। সাহস থাকলে কর্তব্য ও বিবেকমতে তার এ কাজ করতে অস্বীকার করা উচিত কিন্তু সে ছিল ভীরু, অন্যান্য দুর্বল লোকের মত এই বলে তার বিবেককে সান্ত্বনা দিল, চিজিককে এখন ছেড়ে দিলে ক্যাপ্টেন লুজগিন রেভেল থেকে ফিরে এলে ওকে অনেক বেশী কঠোর শাস্তি পেতে হবে। তাছাড়া, এরকম করার মানে লুজগিনদের সঙ্গে কলহ সৃষ্টি আর দপ্তরের কম্যাণ্ডারের সঙ্গে গোলমাল পাকান। সে জানত এই শেষোক্ত ব্যক্তিটি লুজগিনদের বন্ধু, বুড়োর নিজের চেহারা দেশলাইয়ের কাঠির মত সরু কিন্তু গোপনে সেও মাদাম লুজগিনার প্রেমাসক্ত, তার হৃষ্টপুষ্ট চেহারার উপর ওর ভারি লোভ। তাছাড়া, বুড়োর স্বভাবটাও মানুষের মত নয়, ওর বিশ্বাস চাবুক মারলে নাবিকদের কোন ক্ষতি হয় না।

অতএব ডিউটি আর্দালিকে সে হুকুম দিল অস্ত্রশালায় শাস্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে।

বড় হলঘরের মাঝখানে চাবুক মারার বেঞ্চটাকে রাখা হল। দু'জন পাতি অফিসার দাঁড়াল এর দু'পাশে। দু'জনার মুখেই ক্লিষ্ট অস্বস্তির ভাব, হাতে ধরা সদ্য-আনা বার্চ গাছের ডাল। নতুন চাবুকের যদি দরকার হয় এজন্য বাড়তি কতকগুলো ডাল রাখা আছে মেঝের একপাশে।

নৌবাহিনীতে তরুণ অফিসারটির বেশীদিন হয়নি, এখনও পুরো 'শক্ত' হয়ে ওঠেনি সে। একপাশে দাঁড়িয়ে রইল বিচলিত অবস্থায়।

যে শাস্তি সে পেতে যাচ্ছে তা যে অন্যায় একথা জেনে কিছুটা বিষণ্ণ আত্মসমর্পণের ভাব এবং লজ্জা ও আহত মর্যাদার ক্লিষ্টতা নিয়ে অস্বাভাবিক দ্রুততায় চিজিক তার পোষাক খুলে ফেলল, যেন সে পাতি অফিসার দু'জনকে (উভয়কেই সে ভাল করে জানে) এবং তরুণ অফিসারটিকে দাঁড় করিয়ে রাখতে চায় না।

এরপর শুধু সার্ট পরে সে ক্রুশচিহ্ন আঁকল, বেঞ্চের উপর মুখ নীচু করে, জোড় করা হাত দুটোর ওপর মাথা রেখে চোখ বুজল।

শেষবারের মত সে যে চাবুক খেয়েছে তা আজ অনেকদিনের কথা। তার

অসহায় ও অপমানজনক অবস্থার কথা ভেবে আঘাতের আগে প্রথম কয়েকটি মুহূর্ত তার পক্ষে বর্ণনাতীতভাবে মর্মান্তিক ... নিরানন্দ জীবনের সবটা চোখের সামনে সবেগে ভেসে এল।

ইতিমধ্যে অফিসারটি একজন পাতি অফিসারকে একপাশে ডেকে কানে কানে বলল:

'আস্তে!'

ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে আবার পাল্টা কথাটা জানিয়ে দিল তার সঙ্গীকে।

মুখ ফিরিয়ে তরুণ অফিসারটি হুকুম দিল:

'সুরু কর!'

ডজনখানেক বাড়ির পর অফিসারটি চেঁচিয়ে উঠল:

'যথেষ্ট হয়েছে। পোষাক পরে আমার সঙ্গে দেখা করবে, চিজিক!'

এই বলেই অফিসে চলে গেল সে।

চিজিক কিন্তু আসলে এতটুকু ব্যথাও পায়নি, কারণ সবুজ ডালগুলোকে খুব জোরের সঙ্গে উপরে তোলা হলেও সেগুলি এমনভাবে ওর উপর পড়ছিল যাতে শুধু চামড়াটুকুকেই স্পর্শ করে।

আগের মতই বিষণ্ণ এবং শাস্তির লজ্জায় ম্রিয়মাণ, (শাস্তির প্রহসন সত্ত্বেও) চিজিক চটপট পোষাক পরে বলল:

'আমাকে তোমরা মারনি, ভাই, ধন্যবাদ সেজন্য ... এর লজ্জাটুকুই নিয়ে গেলাম ...'

'এ্যাডজুটেন্টের আদেশ,' পাতি অফিসারদের একজন বলল। 'কিন্তু ওরা তোমাকে এখানে পাঠাতে গেল কেন, ফেদোস নিকিতিচ?'

'কারণ একটা মুখ্যু খেঁকশিয়ালী এখন আমার কর্ত্রী ...'

'কে সে?..'

'ক্যাপ্টেন লুজগিনের বউ ...'

'ঐ মেয়েছেলেটা এক মহা আতঙ্ক,' বলল ওদের একজন। 'সবসময়েই লোক পাঠাচ্ছে চাবুক খাওয়াবার জন্য। ভাবছি, ওখানে টিকবে কী করে?'

'ঈশ্বরের যা ইচ্ছে, তাই হবে ... মানুষকে ত বাঁচতেই হবে ... এর উপর ত কোন হাত নেই ... কিন্তু আমি যার নার্স সেই ক্যাপ্টেনের ছেলেটি চমৎকার ... ওকে ছাড়তেই আমার দুঃখ ... আমারই জন্য সে মার খেয়েছে ... আমারই জন্য মাকে বলতে গিয়েছিল ...'

'কী বলছ হে! মার মত নয় মোটেই!'

'আদৌ না। এক্কেবারে সোনার মত সাচ্চা।'

চিজিক অফিসে ফিরে এসে এ্যাডজুটেণ্টের ঘরে ঢুকল। তার হাতে একখান চিঠি দিয়ে অফিসার জানাল:

'এটা মাদাম লুর্জাগিনাকে দিও ... এতে লেখা আছে তোমাকে কঠোর সাজা দেয়া হয়েছে ...'

'এই বুড়ো নাবিকটাকে এত দয়া করলেন, আমি কৃতজ্ঞ, স্যার,' চিজিকের কথায় আবেগ।

'তা, আমিও কি মানুষ নই ... উপায় থাকলে তোমাকে আদৌ শাস্তি দিতাম না... আমি জানি তুমি ভাল!' বলল অফিসার। তখনও তাকে বিব্রত দেখাচ্ছে। 'আচ্ছা, এবার যাও তোমার কর্ত্রীর কাছে ... ঈশ্বর করুন ভবিষ্যতে যেন ভালভাবে থাকতে পার ... আর মনে রেখো, কাউকে যেন বলতে যেয়ো না কী ভাবে তোমাকে শাস্তি দিয়েছি ...'

'কোন চিন্তা নেই, স্যার! আমার বিনীত ধন্যবাদ, স্যার!'

## ১৫

শুরা নার্সারীর এক কোণায় জড়সড় হয়ে বসেছিল, চেহারাটা ভয় পাওয়া বাচ্চা জানোয়ারের মত। থেকে থেকে সে ফুঁপিয়ে উঠছে। তার যে অবমাননা ঘটেছে সে কথা মনে হতেই গলার কাছে কি একটা পোটলা পাকিয়ে উঠল। সারা শরীর কাঁপছে, বুকের ভিতর উদ্বেলিত একটা পঙ্গু ক্রোধ। তার মায়ের উপর ঘেন্না জন্মাচ্ছে, বেশী করে ইভানের উপর। ইভানটাই আহ্লাদ দেখিয়ে, হাসতে হাসতে বার্চ গাছের ছড়ি এনে দিয়েছে আর পিটুনি খাওয়ার সময় তার দোমড়ান

শরীরটাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। সে দৌড়ে পালাত নিশ্চয়ই ঐ জঘন্য লোকটা যদি তাকে অমন শক্ত করে ধরে না রাখত।

ইভানটার উপর কেমন করে প্রতিশোধ নেওয়া যায় সেই চিন্তা মাথায় ঘুরতে লাগল ... প্রতিশোধ সে নেবেই নেবে ... বাবা ফিরে এলে বলবে চিজিকের উপর মা কী অন্যায় করেছে ... বাবা সবকিছু শুনবেন ...

থেকে থেকে কোণা থেকে বেরিয়ে এসে জানলা দিয়ে দেখতে লাগল চিজিক ফিরছে কি না। 'বেচারা চিজিক!' ভাবতে থাকে সে। 'তাকেও নিশ্চয় কষে চাবুক মেরেছে... সে ত জানে না আমি তার জন্য বেত খেয়েছি। আমি তাকে বলব... সবকিছু বলব!'

চিজিক সম্পর্কে এই চিন্তায় সে কিছুটা সান্ত্বনা পেল, অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল বন্ধুর ফিরে আসার জন্য।

মাদাম লুজগিনা নিজেও বিব্রত। তার বড় শোবার ঘরটাতে সে পায়চারি করছে। যে চাকরটার জন্য তার ছেলে তাকে ওই সব কথা বলেছে তার প্রতি ঘেন্নায় সে জ্বলতে লাগল। ওই লোকটা নির্ঘাৎ তার ছেলেটাকে খারাপ করেছে, ওর হাত থেকে ছাড়াতে হবে ছেলেকে ... ভাসিলি মিখাইলভিচ আসামাত্রই তাকে দিয়ে ওর বদলে অন্য লোক লাগাবে। ইতিমধ্যে এই চাষাড়ে, উদ্ধত লোকটাকে নিয়ে কোন রকমে চলতে হবে। আর যাই হোক, এই চাবুক খাওয়ার পর সে আর মদ খেতে বা মাথা তুলতে সাহস পাবে না ... ব্যাটাকে শিক্ষা দেওয়ার দরকার ছিল!

দু'একবার চুপচাপ নার্সারীর দিকে তাকিয়ে সে ফিরে এল, বৃথাই আশা শুরা তার কাছে এসে ক্ষমা চাইবে।

বিরক্ত হয়ে আন্যুৎকাকে গালাগালি দিয়ে চিজিকের সঙ্গে 'ঢলাঢলি' সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল সে।

'অস্বীকার করার চেষ্টা করিসনে, ছুকরী! সত্যি যা বল আমাকে!'

আন্যুৎকা জোরের সঙ্গে জানাল সে নির্দোষ।

'যদি শুনতে চান, মাদাম, ত বলি রাঁধুনীটাই সব সময় আমাকে জ্বালায়! ওর

নোংরামীর হাত এড়িয়ে রান্নাঘরে ঢোকাই দায়। চিজিক এ কথা ভাবতেও পারে না, মাদাম...'

'আগে আমাকে রাঁধুনীর কথা বলিসনি কেন?' সন্দেহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল মাদাম লুজগিনা।

'সাহস পাইনি, মাদাম ... তাছাড়া, ভেবেছিলাম ওসব ও ছেড়ে দেবে ...'

'আচ্ছা, আমাকে দেখছি সবকিছুই তলিয়ে দেখতে হবে ... তুই সাবধানে থাকবি ... যা এখন, দ্যাখ গিয়ে আলেক্সান্দ্র কী করছে।'

আন্যুৎকা নার্সারীতে গিয়ে দেখল শুরা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ফিরে-আসা চিজিককে দেখে মাথা নাড়ছে।

'খোকাবাবু! তোমার মা আমাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন তুমি কী করছ ... কী বলব তাঁকে?'

'বল, আমি বাগানে বেড়াতে গেছি...'

এই বলে চিজিকের দিকে ছুট মারল।

## ১৬

শুরা দৌড়ে গেল উঠোনের ফটকে চিজিকের সঙ্গে দেখা করতে, অনুকম্পা নিয়ে তাকাল বন্ধুর দিকে। তার শক্ত, খসখসে হাত জড়িয়ে চোখের জল সামলাতে সামলাতে সস্নেহে বলল:

'চিজিক!.. আমার চিজিক, আমার আদরের চিজিক।'

ফেদোসের ভারাক্রান্ত মুখ রূপান্তরিত হল অনির্বচনীয় কোমলতায়।

'আহা, কত ভালবাসা তোমার!' মৃদু স্বরে কোনো রকমে সে বলল।

এই ভালবাসা তার মর্ম স্পর্শ করল। 'সোনালী চুলওয়ালী' দেখছে কি না নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য চট করে জানলার দিকে তাকিয়ে দ্রুত সে ছেলেটিকে জড়িয়ে বুকের উপর চেপে ধরল, খোঁচা খোঁচা গোঁফে যাতে ব্যথা না পায় সেদিকে খেয়াল রেখে আলতোভাবে চুমো খেল ওকে। তারপর তেমনি চটপটভাবে ওকে নাবিয়ে দিয়ে বলল:

'যাও আমার সোনামণি।'

'কেন, আমরা একসঙ্গে যাব না?'

'না, তা ঠিক হবে না। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ জানলে মা আবার রাগ করবেন।'

'দেখুক না ... করুক না রাগ!'

'এ সব কী? মার বিরুদ্ধে কথা বলছ? ছিঃ, লেক্সান্দ্রা ভাসিলিচ, কখখনো এরকম করবে না! সব সময় মাকে সম্মান করবে ... যাও এখন ... পরে আমরা কথা কইব ...'

শুরা সব সময়েই চিজিককে মেনে চলে, যা বলে তাই শোনে। সে রাজী হল ওর কথায়। কিন্তু যাবার আগে বন্ধুর দুর্ভাগ্যে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দেবার জন্য কিছুটা গর্বের সঙ্গে বলল:

'আমিও চাবুক খেয়েছি, চিজিক!'

'আমি জানি। আহা বেচারা, আমি তোমার কান্না শুনেছি... আমারই জন্য তুমি শাস্তি পেলে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন! কিন্তু এখন দৌড়ে পালাও, সোনামণি, নইলে দু'জনারই ফ্যাসাদ...'

চিজিকের উপর আরও বেশী টান নিয়ে শুরা ঘরে গেল। যে অন্যায় শাস্তি তারা দু'জনে মিলে পেয়েছে তাতে তাদের বন্ধুত্ব আরও নিবিড় হল।

কয়েক মিনিট বাইরে থেকে শক্ত ও কঠিন হয়ে চিজিক ঢুকল রান্নাঘরে। একটা কঠোর ঘৃণার আড়ালে তার চাবুক খাওয়ার অপমানকে ঢাকতে চাইল।

চোখে বিদ্রূপের হাসি, ইভান ওকে লক্ষ্য করল। ও যে ওখানে আছে তার পরোয়া না করে চিজিক ঢুকল নিজের শোবার ঘরে।

'মাদাম বলেছেন আসামাত্রই তাঁর কাছে আপনাকে খবর দিতে!' রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল ইভান।

চিজিক কোন জবাব দিল না।

ধীরেসুস্থে কোট খুলে ক্যানভাসের জুতো পায়ে দিল। তারপর শুরার দেওয়া আপেল ও মিঠাই সিন্দুকের ভিতর থেকে বার করে পকেটে পুরল, ওভারকোটের কফ থেকে অফিসারের চিঠি বার করে ঢুকল খাবারঘরে।

মাদাম লুর্জগিনা খাবারঘরে নেই। শুধু আন্যুৎকা ছেলেটিকে কোলে নিয়ে ঘরের ভেতর পায়চারি করছে আর তার সুরেলা গলায় গুন গুন করে গান গাইছে।

ফেদোসকে দেখে চাইল তার দিকে, ভয় পাওয়া মুখে দুঃখ ও অনুকম্পা।

'আপনি কি মাদামকে চাইছেন, ফেদোস নিকিতিচ?' ফিসফিসিয়ে বলল সে।

'তাঁকে বল, আমি দপ্তর থেকে ফিরেছি,' চোখ নাবিয়ে অপ্রস্তুতভাবে বলল চিজিক।

আন্যুৎকা শোবার ঘরের দিকে এগুল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই দরজা গেল খুলে, ঘরে ঢুকল মাদাম লুর্জগিনা।

ফেদোস নিঃশব্দে চিঠিখানা ওর হাতে দিয়ে দরজার দিকে পিছিয়ে এল।

মাদাম লুর্জগিনা চিঠি পড়ল। তার কথা রাখা হয়েছে এবং 'বেয়াদপ' চাকরটা চাবুক খেয়েছে দেখে খুশি হয়ে বলল:

'আশা করি এই শাস্তির পর তুমি আর বেয়াদপি করবে না।'

চিজিক বিষণ্ণভাবে চুপচাপ।

মাদাম লুর্জগিনা গলা নরম করে বলতে থাকে:

'ভবিষ্যতে ঠিকভাবে চলবে যেমন চলা উচিত ভাল চাকরের। ভদকা খাবে না, কর্ত্রীকে সম্মান করবে... তাহলে আর তোমাকে শাস্তি দেবার দরকার হবে না...'

চিজিক একটা কথাও বলল না।

'বুঝলে?' নাবিকের নীরবতা ও গম্ভীরভাবে চটে গিয়ে গলা চড়িয়ে বলল মাদাম লুর্জগিনা।

'হ্যাঁ, মাদাম!'

'তাহলে কথা কইছ না কেন?.. কিছু বললে তার উত্তর দেবে।'

'হ্যাঁ, মাদাম,' আপনা থেকেই চিজিকের উত্তর এসে গেল।

'আচ্ছা, যাও এখন... দেখো গিয়ে খোকাবাবু কোথায়... বাগানে যেতে পার...'

চিজিক চলে গেল। চাষাড়ে লোকটার 'উদাসীনভাবে' রুষ্ট হয়ে শোবার ঘরে ঢুকল মাদাম। তার স্বামী যে লোক চেনে না সেটা নিঃসন্দেহ! ওর তারিফ করে

ওকে আকাশে তুলেছিল। আর এখন দেখা যাচ্ছে ও মদ খায়, বেয়াদপি করে, অনুশোচনা বলে কিছুই নেই ওর ভেতর।

'এই নাবিকগুলো কী চাষাড়ে!' মনে মনে বলল সে।

লাঞ্চের পর বাইরে যাবার জন্য তৈরী হল। বেরোবার আগে আন্যুৎকাকে বলল খোকাকে নিয়ে আসতে।

আন্যুৎকা বাগানে দৌড়ে গেল।

ঘন গাছপালা বোঝাই বাগানের মাঝখানে একটা ঝুলে-পড়া লাইম গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর বসে আছে চিজিক আর শুরা। চিজিক একটা কাগজের ঘুড়ি বানাচ্ছে আর ধীরেসুস্থে এটা সেটা বলছে, শুরা শুনছে মন দিয়ে।

'মা তোমাকে ডাকছেন, খোকাবাবু!' দৌড়ে এসে জানাল আন্যুৎকা, মুখটা একেবারে লাল।

'কেন?' অসন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করল শুরা। এখানে কত আনন্দ, শুনছে চিজিকের বলা অসম্ভব সব মজার খবর।

'জানিনে, খোকাবাবু, উনি বাইরে যাচ্ছেন, বোধহয় তোমার সঙ্গে দেখা করে যেতে চান...'

শুরা অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

'এখনও রাগ করে আছে না কি?' আন্যুৎকাকে সে জিজ্ঞেস করল।

'না, খোকাবাবু... উনি নরম হয়েছেন...'

'মা ডেকে থাকলে, ছুটে যাও, খোকাবাবু... আর মনে রেখো তাঁর উপর একটি কথাও কইবে না। মা আর ছেলের ভেতর যাই ঘটুক না কেন সব সময়েই মাকে সম্মান দেখাতে হবে ছেলের,' ঘুড়িটা রেখে পাইপ ধরাতে ধরাতে নরম গলায় বলল চিজিক্।

শুরা ভীরুর মত শোবার ঘরে ঢুকল, মুখের উপর ক্ষুব্ধ ভাব, সংকোচের সঙ্গে মায়ের কাছ থেকে কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

পরনে ছিমছাম সিল্কের পোষাক, মাথায় সাদা টুপি, সুন্দরী, উদ্ভিন্ন-যৌবনা আর গন্ধে ভরপুর মাদাম লুজগিনা ছেলের কাছে গিয়ে তার গালে সস্নেহে হাত বুলিয়ে হেসে বলল:

'আচ্ছা শুরা, মনে মনে ত অনেক রাগ করেছ... এবার মিটমাট করে ফেলি, কি বল? মাকে গালমন্দ করেছ বলে ক্ষমা চাও, আমার হাতে চুমো খাও...'

শুরা তার মায়ের পুষ্ট, সাদা, আংটি-পরা হাতে চুমো খেল, জল এসে গেল চোখে।

সত্যিই ত সে অন্যায় করেছে। মাকে বলেছে 'জঘন্য' আর 'দুষ্টু' — আর চিজিক কি তাকে বলেনি খারাপ ছেলে হওয়ার মত দোষ আর নেই?

আবেগের আতিশয্যে তার অপরাধের গুরুত্ব বড় হয়ে উঠে ওকে অভিভূত করল, আকুল আগ্রহে বলল:

'আমার দুঃখ হচ্ছে মা! দয়া করে আমায় ক্ষমা করো!'

ওর কথায় আন্তরিকতা আর চোখে জল চক চক করতে দেখে তার মায়ের মন গলে গেল, প্রথম ছেলেকে এত কঠোর শাস্তি দেওয়ায় নিজেকে অপরাধী মনে করল সে। চাবুক খাওয়ার সময় তার কষ্ট পাওয়া, আতঙ্ক-ভরা ছোট্ট মুখখানা আর সেই মর্মভেদী আর্তনাদ তার মনে পড়ে গেল আর সেই সঙ্গে এই যুবতীর বুকে জেগে উঠল মাতৃত্বসুলভ করুণা। ইচ্ছে হল তখনই ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খায়।

কিন্তু বাইরে যাবার জন্য ব্যস্ত সে, ভয় হল ছিমছাম নতুন ফ্রকটা যদি কুঁচকে যায়। অতএব ঝুঁকে পড়ে আলতোভাবে ওর কপালে চুমো খেল এই বলে:

'আমরা এর সবকিছুই ভুলে যাব, কি বল? কখনো তুমি মাকে গালমন্দ করবে না?'

'না, মা।'

'আগের মতই তোমার মাকে ভালবাসবে?'

'হ্যাঁ, মা।'

'ওরে আমার ছোট্ট সোনা, তোকে আমি ভালবাসি রে। আচ্ছা, আসি এখন। বাগানে যাও আবার...'

আবার ওর গালে হাত বুলিয়ে, ওর দিকে চেয়ে হেসে রেশমী ফ্রকের খসখস আওয়াজ তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মাদাম লুর্জাগিনা।

শুরা বাগানে ফিরে গেল একটা আনমনা অস্বস্তি নিয়ে। তার অনুভূতিপ্রবণ মনে মায়ের কথা আর তার আদর কেমন যেন অপর্যাপ্ত মনে হল, যে অনুশোচনা ওকে অভিভূত করেছে তার তুলনায় এ যেন যথেষ্ট নয়। এছাড়াও, যা তাকে আরও বেশী কষ্ট দিচ্ছিল তা হল এই যে ওর তরফ থেকে মিলনটা সম্পূর্ণ হয়নি। যদিও মাকে সে বলেছে ঠিক আগেরই মত ভালবাসবে তবু তার মনে মায়ের উপর কেমন যেন একটা শত্রুর ভাব থেকে যাচ্ছে, নিজের জন্য ততটা নয় যতটা চিজিকের জন্য।

## ১৭

'এই যে, কী খবর, খোকাবাবু? মার সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেছে ত?' শুরা শান্তভাবে ফিরে আসতে ফেদোস জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, চিজিক। মাকে গাল দিয়েছিলাম বলে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছি...'

'তুমি তাঁকে গালও দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, ওকে বলেছিলাম জঘন্য আর দুষ্টু।'

'বাপরে, কী বেপরোয়া ছেলে! কী করে বললে মাকে ওসব!..'

'তোমারই জন্য, চিজিক,' শুরা চটপট কারণটা জানাল।

'বুঝেছি আমি। আসলে কিন্তু তোমার ছোট্ট হৃদয়টি অবিচার সইতে পারছিল না ... এরই জন্য তুমি আমার হয়ে দাঁড়িয়েছিলে। আন্তোনের জন্যও ঐ একই কারণে তুমি দুঃখ পেতে... মায়ের সঙ্গে অভদ্র হলেও ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করবেন। তবু ক্ষমা চেয়ে তুমি ঠিকই করেছ। শত হলেও উনি তোমার মা... আর লোকে যখন জানে সে অন্যায় করেছে তখন তা স্বীকার করাই সবচেয়ে ভাল। তাতে যাই হোক না কেন, অনেক বেশী শান্তি পায় সে... কী বল, সত্যি নয়? এখন কি তোমার ভাল লাগছে না?..'

'হ্যাঁ, চিজিক,' ইতস্তত করে বলল ছেলেটি।

ওর দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে ফেদোস জিজ্ঞেস করল:

'তাহলে এত গম্ভীর কেন? কী হয়েছে লেক্সান্দ্রা ভাসিলিচ? বলো আমাকে, দুজনে মিলে আলোচনা করা যাক। মিটমাট করলেই মন সহজ হয়, ওতে মনের

ভার দূর হয়... কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে বর্ষার মেঘ... মা আবার বকেছিলেন না কি?..'

'না, চিজিক... উনি আমাকে একেবারেই বকেননি...'

'তাহলে কী ব্যাপার?.. এসো, এখানে বসে সবটা আমায় বলো, ততক্ষণে ঘুড়িটা শেষ করি... চমৎকার হবে ঘুড়িটা আর কাল বাতাস পেলেই উড়োব এটাকে...'

শুরা ঘাসের উপর বসে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

'তুমি বললে মনের ভার কেটে যায়, কিন্তু আমার ত কাটল না!' হঠাৎ বলে উঠল সে।

'কেন এমন হচ্ছে?'

'মানে, এখনো আমি মায়ের উপর চটে আছি। আগের মত ওঁকে ভালবাসিনে। এটা খারাপ, তাই না চিজিক? তাঁর উপর রাগ করতে চাইনে কিন্তু রাগ ত যাচ্ছে না...'

'মন ঠিক করে থাকলে কেন রাগ করবে?'

'তোমার জন্য, চিজিক...'

'আমার জন্য?'

'কেন মা তোমাকে বিনা কারণে দপ্তরে পাঠালেন? তুমি খারাপ নও তবু কেন বললেন তুমি খারাপ?'

বালকের ভালবাসা আর ঘৃণার জোর দেখে বুড়ো নাবিকের বুক ভরে গেল। তার জন্য শুরা শুধু কষ্টই পায়নি তখনো পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছে না সে।

'এ হল ওর ভিতরে ঈশ্বরের শক্তি!' মনে মনে সে ভাবল, ছেলেটিকে শান্ত করার জন্য কী সে বলতে পারে কিছুক্ষণ তা বুঝতেই পারল না।

ছেলেটির উপর তার যে ভালবাসা তাই থেকেই একটা জবাব বেরিয়ে এল।

সবচাইতে অভিজ্ঞ শিক্ষকের চাইতেও তার অনুভূতিময়, আসক্ত হৃদয় ভালো করে বুঝতে পারল মায়ের বিরুদ্ধে এই অকাল বিরক্তি বোধের হাত থেকে ছেলেটিকে বাঁচাতে হবে এবং যে 'সোনালী চুলওয়ালী' তার নিজের জীবনকে এত

দুঃখময় করে তুলছে তাকে তার সন্তানের চোখে যে কোনভাবেই দাঁড় করাতে হবে।

তাই সে বলল:

'কিন্তু রাগ তোমাকে বন্ধ করতেই হবে! জিনিষটা একবার ভেবে দেখো, তাহলেই রাগ পড়ে যাবে। জেনো, একই জিনিষ নিয়ে মানুষের আলাদা ধারণা থাকে। তুমি আর আমি ভাবছি তোমার মা আমাকে শাস্তি দিয়ে অন্যায় করছেন, কিন্তু উনি হয়ত মনে করছেন উনি ঠিকই করছেন। আমাদের মতে আমি মাতাল বা বেয়াদপ হইনি, কিন্তু ওঁর ধারণা উল্টো আর তারই জন্য আমার চাবুক খাওয়া দরকার।'

এই কথার ফলে শুরার সামনে একটা নতুন দিক খুলে গেল, কিন্তু চিজিকের কথা ওর মনে বসতে না বসতেই কৌতূহল নিয়ে গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করল:

'ওরা কি তোমাকে খুব জোরে মেরেছে, চিজিক? তোমার চামড়া তুলেছে? কেঁদেছিলে তুমি?'

'চামড়া তোলা ত দূরের কথা ওরা আমাকে মোটেই জোরে মারেনি।' চিজিক হেসে জবাব দিল।

'সত্যি? কিন্তু তুমি যে আমাকে বলেছ, নাবিকরা সাংঘাতিক মার খেত?'

'সত্যি খেত তারা ... কিন্তু আসলে এবার ওরা আমাকে মারেইনি। কেবল নিয়ম মানতে হবে আর তোমার মা বলেছেন বলে আমাকে কয়েকটা হাল্কা বাড়ি লাগায়। আমি কিন্তু টেরও পাইনি... এজন্য দপ্তর অফিসারকে ধন্যবাদ... উনি আমার জন্য দুঃখ পেয়েছিলেন ... ওদের বলেছিলেন আস্তে মারতে ... কিন্তু তোমার মাকে বলো না যেন ... তিনি যেন এ কথাই জানেন যে আমি ঠিকই মার খেয়েছি ...'

'সাবাস অফিসার!.. কি চালাক উনি! আমি কিন্তু সাংঘাতিক পিট্টি খেয়েছি, চিজিক ...'

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে চিজিক বলল:

'জানি আমি। তোমার কান্না শুনেছি, কত দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু এখন আর ও কথা বলে লাভ কি? যা হবার হয়ে গেছে।'

কিছুক্ষণ ওরা চুপ করে রইল।

ফেদোস দুরাক* খেলার কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু শুরার মনের ভার তখনও কাটেনি। জিজ্ঞেস করল:

'তোমার কি তাহলে মনে হয় চিজিক, মা জানেন না যে তিনি অন্যায় করছেন?'

'হয়ত জানেন না। হয়ত বা জানেন, কিন্তু সাধারণ লোককে সেটা দেখাতে চান না। এরকম অহংকারী লোক আছে বটে। তাদের অন্যায় তারা বোঝে, কিন্তু বলে না কখনো ...'

'ও, তাহলে মা জানেন না তুমি ভাল লোক আর তাই তোমাকে ভালবাসেন না?'

'এটা হল তাঁর মানুষকে বিচার করার রীতি— এই আর কি। কিন্তু এ জন্য তোমার মায়ের উপর রাগ করা উচিত নয়। তাছাড়া, মেয়ে বলে আমাদের পুরুষের চাইতে ওর ধারণাও অন্যরকম ... লোককে সোজাসুজি বুঝবার ক্ষমতা নেই তাঁর ... ঈশ্বরের ইচ্ছায়, পরে উনি আমাকে ভাল বুঝতে পারবেন, দেখতে পাবেন সত্যি আমি কী রকম লোক। তখন টের পাবেন আমি তাঁর ছেলেকে ঠিকই দেখছি, ওর যত্ন নিচ্ছি, গপ্প বলছি, ওকে এমন কিছু শেখাচ্ছি না যা তার শেখা উচিত নয়, দুজনে এক সঙ্গে চলেছি ঠিক রাস্তায়। ওঁর মায়ের মন একথা বুঝতে পারবে, লেক্সান্দ্রা ভাসিলিচ। সন্তানকে ভালবেসে তার নার্সের সঙ্গেও করবেন ভাল ব্যবহার। সবকিছুতেই সময় লাগে, ঈশ্বর সময়ে সবাইকে বুদ্ধি দেন। সুতরাং মায়ের উপর আর রাগ রেখো না, মণি!' বক্তব্য শেষ করল সে।

চিজিককে ধন্যবাদ, তার কথায় শুরার চোখে মায়ের দোষ কিছুটা লঘু হল। আনন্দ ও আশ্বস্ত বোধ করে, যেন এভাবে তার সন্দেহ দূর করায় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আবেগভরে শুরা চিজিককে চুমো খেল। বিশ্বাস নিয়ে বলল:

'মা তোমাকে নিশ্চয়ই পছন্দ করতে থাকবেন, চিজিক! তিনি বুঝতে পারবেন তোমাকে! এতে কোন সন্দেহ নেই আমার!'

এ ব্যাপারে বালকের আশার সঙ্গে ফেদোস একমত হতে পারল না, শুধু সস্নেহে চাইল ছেলেটির দিকে। শুরা উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল:

---

* দুরাক— বোকা। এক ধরনের মজার তাস খেলা।

'তখন সবকিছুই হবে চমৎকার, চিজিক ... মা আর তোমাকে দপ্তরে পাঠাবেন না ... ইভান বদমাসটাকে দেবেন দূর করে জানো ... সব সময় তোমার নামে ও মায়ের কাছে লাগায়... ওকে আমি ঘেন্না করি... মা যখন আমায় মারছিল ও আমাকে শক্ত করে ধরে রেখেছিল ... বাবা এলেই ওর সব কথা তাঁকে বলব ... তাই ঠিক হবে, না চিজিক?'

'না বলাই ভাল ... কারো নামে বলতে নেই, লেক্সান্দ্রা ভাসিলিচ। এ রকম না করাই উচিত। এতে কখনো কারো ভাল হয় না...' বিরক্তি ও ঘেন্না জানিয়ে হাত নেড়ে বলল চিজিক। 'সত্যের জয় সর্বদা, খোকাবাবু। পারলে চাকরদের নিয়ে অভিযোগ করা উচিত নয় ... এমন অনেক মুখ্যু আর দুষ্টু ছেলে আছে যারা এমনিতেই চাকরের নামে লাগায় আর তাদের মা বাবারা কিছু বিচার না করেই তাদের পিট্টি খাওয়ায়। যা বলছি—এটা রসিকতা নয়। ইভানের কথাই ধরা যাক ... লোকটা নীচ, চাকরদের নামে লাগিয়ে বেড়ায় কিন্তু জিনিষটা যদি বিচার কর, দেখবে ও যে নীচ এর জন্য ও নিজে সম্পূর্ণ দোষী নয়। যখন ও কান ভাঙান সুরু করে তখন যদি দাঁতগুলোর উপর ঘুষি খেত, তারপর পড়ত আরও একটা যতক্ষণ না রক্ত আসত বেরিয়ে,' ঘৃণায় উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে ফেদোস, 'আমি বলতে পারি বাছাধনের কদভ্যাস দূর হত। তাছাড়া, ইভান বরাবরই চাকরের কাজ করছে, যেটুকু ভদ্রতাবোধ ওর ছিল তা শেষ হয়ে গেছে... তুমি ত জান, চাকররা কী ধরনের জীব—সবটাই ওদের ফাঁকিবাজী—সত্যিকার মানুষের কাজ নয়। সবটাই চাটুকারিতা, বার দেখান বাহ্যিক ভড়ং, মিথ্যে ভান আর পেটভর্তি করা, কর্তার টেবিলে পড়ে-থাকা ভালমন্দ খাবার ইচ্ছে—এছাড়া, আর কোন চিন্তা নেই ... সত্যিকারের নাবিক হলে ইভান হয়ত এসব নোংরা কাজ করত না ... জাহাজের সঙ্গীরা তাকে ঠিক পথে নিয়ে আসত ... ওকে সিধে করে ছাড়ত!.. এই ইভানই তখন অন্য ইভান হত ... কিন্তু বড্ড বেশী আমার বুড়ো জিভটাকে নেড়ে তোমায় বিরক্ত করছি, লেক্সান্দ্রা ভাসিলিচ ... এসো, এক হাত "বোকা" কিংবা "ভিখিরি আমার প্রতিবেশী" খেলা যাক।'

পকেট থেকে এক জোড়া তাস বার করল আর ছেলেটির দেওয়া আপেল ও মিঠাই নিয়ে ওর হাতে দিয়ে বলল:

'এই যে, তোমার জন্য কি ভালো জিনিষ, দেখ...'

'কিন্তু এত তোমার, চিজিক ...'

'নাও, খাও দিকি!.. তোমার মত আমি মিষ্টির স্বাদ বুঝতে পারি না। শুরু করো।'

'আচ্ছা, ধন্যবাদ তোমায় ... কিন্তু আদ্দেকটা নাও!..'

'সামান্য একটু দাও আমাকে ... ব্যস্, আর নয়। আচ্ছা তোমার বাট, লেক্সান্দ্রা ভাসিলিচ... আর মনে রেখো, গতবারের চাইতে এবার তোমার নার্সকে একটু বেশী দয়া করো ... প্রতিবারই ত তুমি আমাকে 'বোকা' বানাও! তাসে ভারি ওস্তাদ তুমি!'

লাইম গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর আরাম করে বসে খেলা সুরু করল ওরা।

কিছুক্ষণের ভেতরেই বাগানটি মুখরিত হল বালকের আনন্দময় উচ্চ হাসি আর ইচ্ছে করে হেরে-যাওয়া বৃদ্ধের ঘ্যাড়ঘ্যাড়ে কণ্ঠে।

'দ্যাখো কাণ্ড, আবার তুমি আমায় বোকা বানালে... নাঃ, তোমার সঙ্গে পারার জো নেই, লেক্সান্দ্রা ভাসিলিচ!'

## ১৮

আগস্টের শেষ। আবহাওয়া শীতল, বৃষ্টি-ভেজা ও নিরানন্দ। সমস্ত আকাশ-ছাওয়া সীসের মত মেঘের আবরণ ভেদ করে সূর্য একবারও দেখা দিচ্ছে না। ক্রনস্টাড্টের কাদা-ভর্তি রাস্তা ও গলিতে চাপা সুরে শরতের বিষণ্ণ গান গেয়ে বাতাস বয়ে চলেছে আর থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে সমুদ্রের গর্জন।

তখনকার নামজাদা এডমিরালের পরিচালনায় পুরনো জাহাজের এক বিরাট বহর আর রণপোত বাল্টিক সাগরে দীর্ঘ সফর করে সবে ফিরে এসেছে। এই এডমিরালটি দারুণ মদ খায় আর বাড়িতে খেতে বসে বলে: 'যারা মাতাল হতে চাও, বসো আমার পাশে আর যারা পেট ঠাসতে চাও তারা যাও আমার ভাইয়ের কাছে!' তার ভাইও একজন এডমিরাল আর নামজাদা পেটুক।

জাহাজগুলো বন্দরে এসেছে। শীতকালে তাদের রেখে দেওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে দড়িদড়া খুলে ফেলা হচ্ছে।

ক্রন্‌স্টাড্‌টের জাহাজঘাট নির্জন, কিন্তু গ্রীষ্মে খুব চুপচাপ এই সহরটি এখন অনেক বেশী জীবন্ত।

'কোপাচিক' গ্রীষ্ম সফর থেকে এখনো ফেরেনি, যে কোন দিন এসে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

লুজগিনদের বাড়ি নিস্তব্ধ। এ সেই পীড়াদায়ক গভীর নিস্তব্ধতা যা নেবে আসে বাড়িতে কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে। লোকজন পা টিপে হাঁটছে, অস্বাভাবিক নীচু গলায় কথা কইছে।

শুরার অসুখ করেছে — ভয়ঙ্কর অসুখ। হামের পর ডবল নিউমোনিয়া জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পক্ষকাল ধরে বিছানায় শুয়ে রুগ্ন ও ফ্যাকাশে সে। বড় বড় বিষণ্ণ চোখ জ্বরে জ্বল জ্বল করছে, আহত ছোট্ট পাখীর মত শান্ত ও অসহায়। দিনে দুবার করে ডাক্তার তাকে দেখছে, প্রতিবারই তার সদাশয় মুখখানা আরও বেশী গম্ভীর হচ্ছে, হাস্যকরভাবে ঠোঁট কুঁচকে যেন তার রোগীর কঠিন অবস্থার কথা ফুটিয়ে তুলছে।

এই পক্ষকাল ধরে চিজিক সব সময়েই ছেলেটির পাশে রয়েছে। শুরা কেবলই ওর খোঁজ করে। চিজিক ওষুধ দিলে সে খুশি হয় আর মজার গল্প শুনে মাঝে মাঝে হাসে। রাতে চিজিক একটা আর্মচেয়ারে বসে থাকে ওর পাশে, সমুদ্রে পাহারা দেওয়ার মত ওর উপর নজর রাখে। কখনো সে ঘুমোয় না, কেবল সযত্নে জ্বরগ্রস্ত ঘুমন্ত ছেলের প্রতিটি হাবভাবের উপর লক্ষ্য রাখে। দিনের বেলা সে যায় শুরার ওষুধ আনতে সহরে, অন্যান্য কাজের ফাঁকে সময় করে তার আদরের ধনটিকে আমোদ দেবার জন্য খেলনা বানায়। এ সবকিছুই সে করে থাকে চুপচাপ, লোক না দেখিয়ে কোন রকম হৈচৈ না করে অথচ কাজে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা, মুখে প্রশান্ত গভীর তৃপ্তি যা তার রোগীকে দেয় সান্ত্বনার প্রলেপ।

এই সময়টিতে শুরা বাগানে বসে যে কথা বলেছিল তা সত্যি হল। মাদাম লুজগিনা দুঃখ ও হতাশায় উদভ্রান্ত, উদ্বেগে ঘুম না আসায় দুর্বল ও কৃশ, এই আসল 'চাষাড়ে লোকটাকে' বুঝতে শুরু করল। নাবিকটি রাতের পর রাত যে

রকম দয়া নিয়ে ভদ্রভাবে তার ছেলের দেখাশুনো করছে তাতে মা অবাক না হয়ে পারল না, সে যা করছে তাতে কৃতজ্ঞ বোধ না করে উপায় নেই।

সেদিন রাতে চির্মনির ভিতর দিয়ে বাতাস আগের চাইতে বেশী জোরে গর্জে চলেছে। সমুদ্র উত্তাল। দুঃখভারাক্রান্তা মাদাম লুর্জগিনা বসে আছে তার শোবার ঘরে ... বাতাসের প্রতিটি ঝাপ্টায় শিউরে উঠছে সে — একবার ভাবছে রেভেল থেকে এই প্রচণ্ড ঝড়ে জাহাজে করে ফিরে-আসা স্বামীর কথা, একবার ভাবছে অসুস্থ ছেলের কথা।

ডাক্তার আগের চাইতেও গম্ভীর হয়ে এইমাত্র চলে গেল ...

'সঙ্কট কাটাবার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে,' বলে গেছে সে। 'ঈশ্বরের দয়ায় ছেলেটি সামলে উঠবে... ওকে কস্তুরী ও স্যাম্পেন দিতে থাকুন... আপনার নার্সটি চমৎকার... ওকে বলুন ছেলের কাছে রাতের বেলা থাকতে আর আমার ব্যবস্থামত ওষুধ দিতে ... কিন্তু আপনাকে বিশ্রাম নিতেই হবে। সকালে আবার আসব ...'

ডাক্তারের কথাগুলো আপনা থেকে মনে পড়ে ওর চোখে জল এল... ক্রুশচিহ্ন এঁকে অনুচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা বলল, হৃদয় দুলছে আশা নিরাশায়।

কাঁদতে কাঁদতে নার্সারীতে গিয়ে শুরার বিছানার পাশে এল সে।

ফেদোস উঠে দাঁড়াল।

'বসো, বসো দয়া করে,' চুপিসারে বলল মাদাম লুর্জগিনা, চাইল শুরার দিকে।

সে অচৈতন্য, অনিয়মিত শ্বাস টানছে। কপালে হাত রাখল—জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

'হায় ঈশ্বর!' কেঁদে উঠল তরুণী মহিলা—দর দর জল গড়াতে লাগল চোখ বেয়ে ...

নার্সারী নিস্তব্ধ, মৃদু আলোকিত। একমাত্র শব্দ শুরার ভারি শ্বাস প্রশ্বাসের আর বাইরে বাতাসের বিষণ্ণ গোঙানির।

'আপনার এখন গিয়ে একটু ঘুমোন উচিত, মাদাম,' ফিস ফিস করে বলল ফেদোস। 'ভয় নেই, মাদাম ... আমি খোকাবাবুর দেখাশুনো ঠিক করব।'

'তুমি নিজেও ত বহুরাত ঘুমোওনি।'

'আমরা ত নাবিক। এ অভ্যেস আমাদের আছে ... তাছাড়া, আমার মোটেই ঘুম পায়নি। আপনি গিয়ে বিশ্রাম করুন, মাদাম,' ভদ্রভাবে অনুরোধ জানাল চিজিক। অনুকম্পার সঙ্গে ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল:

'আর আমায় যদি অনুমতি দেন ত বলি হতাশ হবেন না। খোকাবাবু ভাল হয়ে উঠবে।'

'তুমি সত্যি তাই মনে কর?'

'নিশ্চয়ই ভাল হবে। ওর মত ছেলে কি মরতে পারে? ওর ত জীবনই এখনও সুরু হয়নি।'

এমন জোরের সঙ্গে কথাগুলো বলল যে তরুণী মহিলার মনে আশা ফিরে এল।

কয়েক মিনিট বসে আবার সে উঠে দাঁড়াল:

'কী সাংঘাতিক ঝড়,' রাস্তার উপর বাতাসের গর্জন শুনে ফিস ফিস করে বলল সে। 'জানি না "কোর্পাচিক" কী করে এই ঝড় সামলাবে। ওদের বিপদ নেই ত? তোমার কী মনে হয়?'

'"কোর্পাচিক" এর চাইতে অনেক খারাপ ঝড় সামলিয়েছে, মাদাম। ওরা এখন পাল গুটিয়ে থাকবে। জাহাজটা পিপের মত উঠছে আর নাবছে ... কোন ভয় নেই, মাদাম ... ভাসিলি মিখাইলভিচ চমৎকার ক্যাপ্টেন, ধন্যবাদ ঈশ্বরকে।'

'বেশ, আমি তাহলে বিশ্রাম করতে যাচ্ছি কিন্তু দরকার হলেই আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ডাক দেবে।'

'হ্যাঁ, মাদাম। গুড নাইট, মাদাম।'

'ধন্যবাদ, চিজিক। সবকিছুর জন্য তোমায় ধন্যবাদ,' আবেগের সঙ্গে বলল মাদাম লুজগিনা এবং অনেক বেশী শান্ত মনে নিজের ঘরে ফিরল।

চিজিক কিন্তু রাতভর পাহারা দিল। পরের দিন সকালে শুরা জেগে উঠে যখন হেসে বলল সে ভাল বোধ করছে এবং একটু চা খেতে চায়, সে আবেগভরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে ছেলেটিকে চুমো খেল — চোখ-ভরা আনন্দের অশ্রু গোপন করার জন্য মুখ নিল ফিরিয়ে।

* * *

পরের দিন ফিরে এল ক্যাপ্টেন লুজগিন।

তার স্ত্রী ও ডাক্তারের কাছে এই খবর শুনল যে প্রধানত চিজিকের শুশ্রূষার জন্যই শুরা জীবন ফিরিয়ে পেয়েছে এবং এখন তার আর বিপদ নেই। আনন্দের আতিশয্যে লুজগিন তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল এবং একশ রুবল দিতে চাইল।

'কাজ থেকে অবসর নেবার পর এটা তোমার কাজে লাগবে,' বলল সে।

'আমি দুঃখিত স্যার, টাকা আমি নিতে পারব না,' আহত কণ্ঠে বলল চিজিক।

'কেন নিতে পারবে না?'

'টাকার জন্য আমি আপনার ছেলের দেখাশুনা করিনি, স্যার। যা করেছি ওকে ভালবাসি বলে।'

'জানি, চিজিক, কিন্তু তবু... নিতে পারবে না কেন?'

'না, স্যার। আমাকে আর আঘাত দেবেন না। টাকা আমি নিতে পারব না।'

'নারে ভাই, তোমাকে কোন কিছুর জন্যই আঘাত দেব না... তোমার যা ইচ্ছে... উদ্দেশ্যটা ছিল আমার ভালো!' কিছুটা বিচলিত বোধ করে বলল ক্যাপ্টেন লুজগিন।

চিজিকের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল:

'কী আশ্চর্য লোক তুমি, চিজিক!..'

## ১৯

চিজিক আরও তিনবছর লুজগিনদের সঙ্গে আনন্দে কাটাল। তদ্দিনে শুরা নৌ-কলেজে যাবার মত বড় হল। পরিবারের সকলের শ্রদ্ধা পেতে লাগল সে। ইভানের বদলিতে যে নতুন রাঁধুনীটি এল তার সঙ্গে ভারি ভাব জমল তার।

সব মিলিয়ে ঐ তিনটি বছর খুবই ভাল কাটল তার। চাষীদের মুক্তির আনন্দময় সংবাদ রাশিয়াব্যাপী অভ্যর্থিত হল... সর্বত্র একটা নতুন ভাব যার প্রভাব পড়ল এমনকি মাদাম লুজগিনারও উপর। তরুণ নৌ অফিসারদের

উদ্দীপক বক্তৃতা শুনে আন্যুৎকার সঙ্গে বেশী করে সদয় ব্যবহার করতে লাগল সে, ভয় পাছে তাকে রক্ষণশীল বলে লেবেল মারে।

প্রতি রবিবার বাইরে যাবার অনুমতি পেত ফেদোস। গির্জায় উপাসনা শেষ করে যেত সারেঙ্গ বন্ধু ও তার স্ত্রীর কাছে। তাদের কাছে গল্পগুজব করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরত ঈষৎ 'মাতাল' হয়ে নয় পরন্তু (তার ভাষায়) 'সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায়'।

আর ফেদোস যখন শুরাকে উপহার দিয়ে এই কথা বলত মাদাম লুজগিনা অসন্তুষ্ট হত না:

'তুমি ভেবো না আমি মাতাল হয়েছি, লেক্সান্দ্রা ভাসিলিচ ... তুমি অবশ্যই তা মনে করবে না... আমি সবকিছুই ঠিকমত ও যথাযথ করতে পারছি...'

এবং তার প্রমাণ দেবার জন্য সে শুরার বুট ও পোষাক বার বার সাফ করত।

শুরা নৌ-কলেজে যোগ দিতে চিজিক নৌবাহিনী থেকে ছাড়া পেল। সে গেল তার নিজের গ্রামে কিন্তু সত্বর ফিরে এসে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের নৌ-সচিবালয়ে দারোয়ানের কাজ নিল। হপ্তায় একবার করে কলেজে শুরার সঙ্গে দেখা করতে সে ভুলত না আর প্রতি রবিবার যেত আন্যুৎকার কাছে। স্বাধীনতা পাবার পর বিয়ে করে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে গৃহস্থালীর কাজে লাগল আন্যুৎকা।

অফিসার হবার পর চিজিকের একান্ত অনুরোধে শুরা ওকে তার আর্দালী করে নিল। পৃথিবীময় এক সঙ্গে তারা জাহাজে ঘুরল। চিজিক ওর নার্সের কাজ করতে লাগল, রইল সবচাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে। পরে, খোকাবাবুর বিয়ের পর তার সন্তানদেরও ফেদোসই লালন পালন করতে লাগল। সত্তর বছর বয়সে মারা গেল সে। ততদিন পর্যন্ত থাকল শুরারই কাছে।

আলেক্সান্দ্র লুজগিনের পরিবারে ফেদোস চিজিকের স্মৃতি পবিত্র। সে নিজে গভীর স্নেহে ওর কথা স্মরণ করে। প্রায়ই বলে থাকে চিজিক ছিল ওর জীবনের সেরা শিক্ষক।

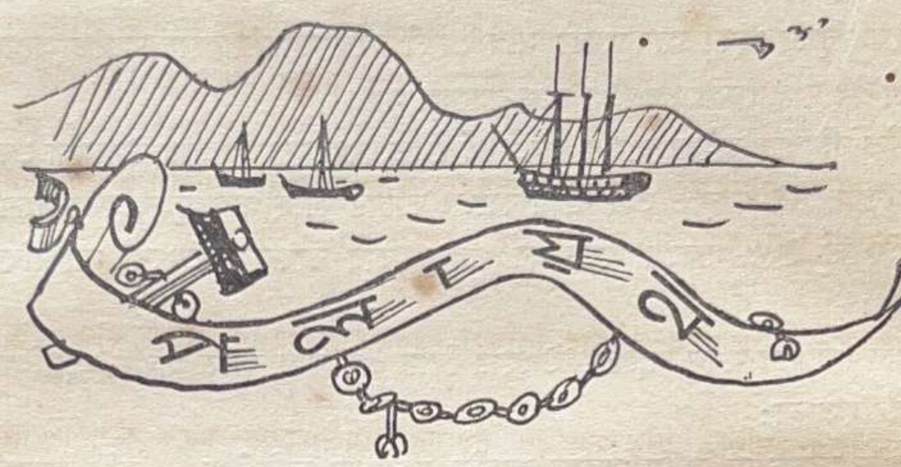

## ১

সূর্য দ্রুত উঠল নীলকান্ত আকাশের ঊর্ধ্বে। দিনটা গরম হবে। চারদিকের সবকিছু উজ্জ্বল রোদে ভরে গেছে—সেভাস্তোপল্ নীল উপসাগরের আয়নার মত শান্ত বুকের উপর রাস্তা ধরে দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধ জাহাজ, ফ্রিগেট, ব্রিগ্, স্কুনার ও কৃষ্ণ সাগর রণপোত বহরের যোগানদারী জাহাজগুলো। সমুদ্রের উপর ক্রমোচ্চ অর্ধবৃত্তাকার রঙ্গস্থলের মত রৌদ্রোজ্জ্বল কেল্লা, গির্জা, সৌধ, বাগান এবং প্রশস্ত পথের পটভূমিতে সহরতলীর ছোট ছোট গৃহসমেত সুন্দরী সেভাস্তোপল্ মাথা তুলে আছে।

মনোরম আগস্ট সকালের প্রায় ছ'টা।

জাহাজের কাজ ইতিমধ্যেই পুরোদমে সুরু হয়েছে।

ছ'টা নাগাদ যখন নিশান উঠবে, ওরা সবাই রীতিমাফিক নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলার পরিচয় দেবে। সব সময়েই কৃষ্ণ সাগর রণপোত বহরের এই বৈশিষ্ট্য।

হাজার হাজার হাতে ডেকের মাজাঘষার কাজ চলেছে। পালিশ চলছে কামান ও পিতলের জিনিষগুলোর। ভোর থেকে ডেকে ও ডেকের নীচে সবকিছুই সাফ হচ্ছে।

বন্দরে, ডকে আর তীরের বিভিন্ন কারখানায় অনেক আগে কাজ সুরু হয়েছে।

হাতুড়ির আঘাত ও করাতের টং টং আওয়াজের মাঝে উদ্দীপনাময় 'দুবিনুশ্কা' গানের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এ সুর শুনলে রুশীদের পক্ষে ভারি জিনিষ তোলা ও বিরাট কাঠের গুঁড়ি বইবার কাজ সহজ হয়।

আর সব জাহাজ থেকে বেশ দূরে, তীরের কাছে চিরকাল শিকল দিয়ে বাঁধা বীভৎস চেহারার অকেজো জাহাজগুলো একদল কুষ্ঠরুগীর মত পড়ে আছে।

এগুলো ভাসন্ত বন্দীশালা।

এর বাসিন্দা নৌ-শ্রমিক দলের অপরাধীদের বিভিন্ন কাজে লাগান হয়েছে ভোর চারটে থেকে।

পুরু ক্যানভাসের সার্ট ও ট্রাউজার পরা, কামান মাথার উপর কুৎসিত ধূসর-রঙা টুপি, দলে দলে ওরা এগিয়ে চলেছে নির্জন রাস্তা ধরে। ওদের শেকল থেকে আওয়াজ উঠছে, সেনাবিভাগের সান্ত্রীরা নিয়ে চলেছে ওদের। যখন 'সমস্ত সহর' বেড়িয়ে আসবে বুলভার আর গ্রাফ্‌স্কায়া জাহাজঘাটিতে শীতল বায়ু সেবন করতে সেই সন্ধ্যার আগে ওরা ফিরবে না।

তারপর মনোরম দক্ষিণা রাত্রির অন্ধকারের ভিতর এই অকেজো জাহাজগুলো ঝিকিমিকি আলোসহ প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠবে, প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর পরস্পরের উদ্দেশ্যে হাঁক দেওয়া সান্ত্রীদের দীর্ঘস্থায়ী চিৎকারে উপসাগরের নিস্তব্ধতা যাবে ভেঙে।

নগরীর চারপাশে সহরতলীতেও প্রাণ ফিরে এল। মাটির তৈরী কুটিরের মত দেখতে এখানকার ছোট্ট সাদা বাড়িগুলোতে বেশীর ভাগই থাকে অবসর নেওয়া ও

কাজে রত নাবিক পরিবার, গোলন্দাজ সৈনিক, বন্দরের কারখানা মজুর ও সাধারণ গরীব শ্রমিকের দল।

বাজারটি হল গোলন্দাজ উপসাগরের কাছে — চারপাশের বাসিন্দাদের একধরনের আড্ডা দেয়ার জায়গা। ইতিমধ্যেই লোকজনে এটা গিজ গিজ করছে।

কোলাহলমুখর সজীব মানুষের দল দোকানঘরে, পশুর ঝুলন্ত দেহের সারির মাঝখানে, মুরগী, ঘর-পোষা হাঁস আর বুনো মোরগ, স্তূপীকৃত সবুজ জিনিষ ও দক্ষিণা শাকশব্জীর ভীড়ে, তরমুজ ও সুগন্ধী ফুটি এবং কাছাকাছি বাগিচা থেকে আনা ফলের স্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। লোকজন দামদস্তুর চালাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে আর রাগারাগি করছে, টাটকা খবরাখবরের আদানপ্রদান চলছে এখানে। পুরোনো পোষাক ও বুটজুতোও আনা হয়েছে বিক্রির জন্য।

পাশের বালাক্‌লাভা সহর থেকে টাটকা মাছ বোঝাই জেলে জাহাজগুলো দাঁড়িয়ে আছে তীরের পাশ ঘেঁষে। কৃষ্ণ সাগরের নিজস্ব প্রায় সব ধরনের মাছই এসেছে এখানে: প্লেইস, ম্যাকারেল, ধূসর মুলেত, বুলহেড এবং ছোট্ট চেহারার সোনালী রঙের সুলতানকা—পেটুকদের মতে এটি হল কৃষ্ণ সাগরের সবচেয়ে সুস্বাদু মাছ। সদ্য-ধরা ঝিনুকগুলোকে ঝুড়ির ভিতর সাজিয়ে রাখা হয়েছে রাঁধুনীদের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে।

মেছো হাটের ঠিক পাশে একদল ছেলে খাড়ির পান্না রঙের স্বচ্ছ জলে স্নান করছে। প্রচণ্ড হুল্লোড় করে জলের ভিতর ঝাঁপ মারছে, জল ছিটোচ্ছে চারদিকে, হাঁসের মত সাঁতার কাটছে আর ডুব দিচ্ছে। একজনের সঙ্গে আর একজন পাল্লা দিয়ে দর্শকদের কাছে নিজের বিদ্যে জাহির করছে।

উজ্জ্বল দক্ষিণা রোদে উদ্ভাসিত বাজারের বুকে চলেছে অবিরাম কলগুঞ্জন। উচ্চারণে দক্ষিণাঞ্চলের সহরের বিকৃতি, তার সঙ্গে মিশছে উক্রেনীয় অঞ্চলের নরম স্বরন্যাস। এই কলরবের ঊর্ধ্বে শোনা যাচ্ছে মাছ ও ঝিনুক, হালভা ও তুর্কী মিষ্টি বিক্রেতাদের, উত্তেজনাপ্রবণ বালাক্‌লাভা গ্রীকদের উচ্চ, দ্রুত ও একই সঙ্গে মন-ভোলান অস্পষ্ট চিৎকার। ওদের কালো, মাংসল মুখে বাঁকান নাক, বড় জলপাইয়ের মত কোমল চাউনি, কালো চোখ, কালো ব্রোঞ্জের মত উলঙ্গ পেশীবহুল বাহু—তারই সাহায্যে করছে প্রচণ্ড অঙ্গভঙ্গী। শোনা যাচ্ছে

তাতারদের ভারি গলার কথাবার্তা—উবু হয়ে বসেছে পিয়াজ, আঙুর আর আপেলের ঝুড়ির পাশে, অহমিকা-ভরা সমাহিত ভাব তাদের সুন্দর মুখে। এদের পূর্বপুরুষরা ছিল একদা ক্রাইমিয়ায় বসবাসকারী জেনোয়াবাসী ও গ্রীক। ওদের ক্লাসিকাল গঠনেই আর্য রক্তের পরিচয়। সময় সময় জনতার হট্টগোলের ঊর্ধ্বে শোনা যাচ্ছে 'বাজারে মেয়েদের' চড়া গলার ঐকান্তিক শপথ। এরা প্রগলভ ও বাকপটু নাবিকপত্নী। খাঁটি রুশী ছড়া দিয়ে রসিয়ে এমন জোরসে গালাগালি কষে জিনিষ বিক্রি করছে যে ঝানু সারেঙ্গদের কাছেও ওদের কথা হিংসে পাওয়ার মত, এই করেই ওরা বাজারের লোকদের হাসির খোরাক জোগাচ্ছে।

এই হল বিরাট সমুদ্র বন্দরের উচ্ছল ব্যস্ত জীবন।

এই কোলাহলমুখর জনতার ভেতর কারও অবিশ্যি এ কথা মনে হল না যে এই সেভাস্তোপল্ ধ্বংস হতে দেরী নেই। এই সব সুন্দর, জীবন্ত, ক্ষুদ্র খাড়িগুলি হবে নির্জন এবং যে জলপথের উপর এখন কৃষ্ণ সাগর-রণপোতবহর নোঙর করে আছে সেখানে কবরখানার ক্রুশের মত ডুবো জাহাজের মাস্তুলগুলো মাথা তুলবে।

## ২

সেদিনকার আনন্দময় রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল সাতটায় বন্দরের সর্বাধিনায়ক ও সেভাস্তোপলের সামরিক গভর্ণরের বিরাট বাসগৃহের নার্সারীতে, জীবন্ত মুখ, উজ্জ্বল বাদামী চোখ, আট দশ বছরের একটি ছিপছিপে ছেলে তার বুড়ী নার্স আগাফিয়ার সাহায্যে চটপট পোষাক পরছে।

'আঃ, তাড়াতাড়ি করো না, নানি! এত দেরীও হয় তোমার!' বালকটি অস্থির হয়ে হুকুমের সুরে বলে উঠল। স্থূল-দেহী ছোটখাট আগাফিয়া তখন ধীরেসুস্থে ছেলেটির ঘন বাদামী চুল আঁচড়াচ্ছিল।

'রক্ষা করো, কি ছটফটে তুমি!.. মিনিটখানেকও কি শান্ত থাকতে পার না? সব সময়েই তড়বড়!' নার্স তার আদরের ধনটির দিকে তাকিয়ে গজর গজর করে। 'ঈশ্বরের দোহাই, শরীর মোচড়ান বন্ধ করো, নইলে চুল আঁচড়ান যাবে না। তুমি রাস্তার ছোকরাদের মত উস্কোখুস্কো চুল নিয়ে ঘুরে বেড়াবে না কি!'

বালকটি স্পষ্টই এসব তিরস্কার থোড়াই পরোয়া করে, দেরী হওয়ায় শুধু ছটফট করতে লাগল সে। ও দিকে ঘরের ভিতর সূর্যরশ্মি নেচে বেড়াচ্ছে, খোলা জানলা দিয়ে বাগান থেকে আসছে ফুলের মিষ্টি গন্ধ-ভরা তাজা বাতাস। না-আঁচড়ান কোঁকড়া মাথাটা নার্সের হাত থেকে টেনে নিয়ে খুশিভরে নিরুদ্বেগে তার জ্যাকেট পরতে লাগল ছেলেটি।

'এক মিনিট, সোনা, এই চুলের গোছাটাকে অন্তত সমান করতে দাও।'

'দিব্যি ঠিক আছে, নানি।'

'দিব্যি ঠিকই বটে! ভেবে দেখ, এডমিরালের ছেলে জট-পাকান চুল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! বাবা দেখলে আর আস্ত রাখবেন না।'

কিন্তু আগাফিয়ার শেষ কথাগুলো ছেলেটির কানে ঢুকল না। ভাসিয়া তার নার্সকে ভালবাসে কিন্তু পরোয়া করে না। ও খুব ভাল করেই জানে নার্স ওর সম্পূর্ণ অধীন, সব খেয়ালই ওর পূরণ করে সে। নার্সারী থেকে মারল ছুট, যেতে যেতে জ্যাকেটের বোতাম আটকাল। পর পর কয়েকটা ঘর পেরিয়ে বাবার পড়ার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

হাসিখুশি ভাব গেল মিলিয়ে, দেখা দিল উদ্বেগ। কিছু সময় দাঁড়িয়ে রইল দরজার সামনে, ভেতরে ঢুকবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করল। ঐ সঙ্গে বরাবরকার চিন্তা এল মনে — রোজ রোজ বাবাকে শুধু শুভপ্রভাত জানাবার জন্য তাঁর পড়ার ঘরে ঢোকা একটা বিশ্রী কাজ — ওটা না করলে কী আসে যায়।

'তবু আমাকে যেতেই হবে,' মনে মনে বলল সে, নিঃশব্দে দরজা খুলে ঢুকল ভিতরে।

প্রশস্ত পড়ার ঘরটিতে একটা লিখবার ডেস্ক। তারই উপর কতকগুলো কাগজে চোখ রেখে বসে আছে হাল্কা ড্রেসিং গাউন পরা দীর্ঘ দেহ কৃশ চেহারার এক বৃদ্ধ। পরিষ্কার কামান কুঞ্চিত গালে স্বাস্থ্যের দীপ্তি, চুল আঁচড়ান পুরোনো কায়দায়। মাথার মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে আছে মোরগের ঝুঁটির মত ঈষৎ পাক-ধরা কালো চুলের একটা গোছা, ঘন করে ছাঁটা গোঁফের ডগা শুয়োরের লোমের মত শক্ত।

আরসোলার মত ঝাঁটাদার গোঁফজোড়া সব সময়েই ছেলেটির কাছে এক বিস্ময়ের বস্তু। যখন এটা দ্রুতগতি একপাশে বেঁকে যায় তার আতঙ্ক হয়, একই সঙ্গে কাঁধের ঝাঁকুনি আর কাঁপতে থাকা চোয়ালের হাড় কঠিন ও নির্দয় এডমিরালের খারাপ মেজাজটাকে ফুটিয়ে তোলে। এই এডমিরালকে ভয় করে তার স্ত্রী থেকে শুরু করে ঘরের প্রতিটি লোক।

'গুড মর্নিং, পাপা!' ডেস্কের দিকে এগুতে এগুতে ক্ষীণ গলায় তোতলিয়ে বলল ছেলেটি। ওর ভয়-পাওয়া নির্বাক চোখ দুটো বাবার মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে হঠাৎ বাজপাখির সামনে আসা ছোট পাখির মত।

আগেরই মত ছেলেকে সে মিনিট দুয়েক ডেস্কের কাছে দাঁড় করিয়ে রাখল — এটা ছেলেটির কাছে মনে হয় অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকার মত। সে কি ইচ্ছে করেই ছেলের সম্ভাষণ উপেক্ষা করল অথবা তন্ময় হয়ে কাগজ পড়ছে বলে ভাসিয়াকে লক্ষ্য করল না — তা বলা অসম্ভব। যে কারণেই হোক মাথা তুলল না সে।

দীর্ঘ মুহূর্ত পার হয়ে গেল।

ছায়াবহুল শাখাপ্রশাখাময় আখরোট গাছের সবুজ কোষে মোড়া বড় বড় আখরোট আর ঘন এ্যাকেশিয়া গাছের সারির ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকতে পায় না। পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে ওগুলোকে চোখে পড়ে ভাসিয়ার মনে এল ঐখানে, ঐ উঁচু বাগানে, বাড়ির থেকে বেশ দূরে তার জন্য অপেক্ষা করছে সুখ, আনন্দ আর উল্লাস-ভরা জীবন যার কথা বাড়ির কেউ আঁচ করতেও পারে না।

বাবার গোঁফজোড়া কিন্তু নড়ল না, কুঞ্চিত মুখের উপর চোয়ালের হাড় নিশ্চল।

সাহস করে ছেলেটি তার কোমল কণ্ঠ একটু চড়িয়ে আবার বলল:

'গুড মর্নিং, পাপা!'

এডমিরালের মাথা উপরে উঠল, কনিষ্ঠ ছেলের উপর চোখ দুটি স্থির হল, সেই গম্ভীর দৃষ্টির ভিতর কিছুটা বিরক্তির রেশ।

হঠাৎ কঠোর ভাবটা মুহূর্তের জন্য নরম হল। ছোট্ট, ধূসর, কঠিন তীক্ষ্ণ চোখে এল কোমলতা, ষাট বছর বয়স সত্ত্বেও যাতে যৌবনের উদ্যম ও জৌলুষ।

'গুড মর্নিং!' চড়া গম্ভীর গলায় জবাব দিল এডমিরাল।

এবং অভ্যাস মত মাথা নেড়ে ছেলেকে বিদায় না দিয়ে তার রক্তিম গালের উপর অস্থিসার হাত বুলিয়ে একই রকম রুক্ষ আদেশ-ভরা গলায় বলল:

'আশা করি, ভাল আছ? শীগগিরই ওদেসাতে স্কুলে যাবে। পয়লা সেপ্টেম্বর স্টীমারে করে। যাও এবার!'

ভাসিয়ার আর দ্বিতীয় কথার দরকার নেই।

পড়ার ঘর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল সে। ফেলল আনন্দময় স্বস্তির নিঃশ্বাস যেন একটা ভার নেবে গেছে তার উপর থেকে। এসে গেল মায়ের শোবার ঘরের পাশের বৈঠকখানায়। মা তখনও ঘুমোচ্ছে, বোনরাও।

চট করে আগাফিয়ার আনা এক গ্লাস দুধ গিলে পকেটের মধ্যে কয়েকটা চিনির টুকরো লুকিয়ে বাগানে সে ছুট মারল।

ফুলের কেয়ারি, গাছপালার ঘর, নীচু বাগানের গরম গৃহ ছাড়িয়ে সিঁড়ি-কাটা ধাপগুলোকে লাফিয়ে পার হল। এই ধাপগুলো ঘন আঙুরলতার ঝোপ এবং মাটির তাকগুলির মাঝখানে বানান, সুন্দর করে সাজান ফলের গাছের সোজা সারযুক্ত দীর্ঘ বীথিকা বিরাট বাগানের গভীরে চলে গেছে। এখানে যত রাজ্যের ফলের গাছ। বড় বড় নরম পীচ, রসাল পিয়ার, প্রকাণ্ড হলদে ও সবুজ প্লাম, হলুদ বর্ণ রেনেট্স, বাদাম, আখরোট এবং সাদা ও লাল মালবেরি দিয়ে বাগানটা ঠাসা।

এই বিরাট থাক-কাটা বাগানটির সামনে তিনটি রাস্তা পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এই বাগানটিতে বিচিত্র ফুলের কেয়ারি, গরম গৃহ ও বিদেশী গাছপালার ঘর, ফুলে-ছাওয়া কুঞ্জবন এবং কাঠের তৈরী বিরাট গম্বুজ। বাগান থেকে সেভাস্তোপল্ ও তার সহরতলীর মনোরম দৃশ্য নজরে পড়ে। বছরখানেক বাদে ভাসিয়া এখান থেকে দূরবীণের ভিতর দিয়ে দেখতে পেয়েছিল ফরাসী সৈন্যের নীল পোষাক-পরা দলটিকে। ওরা সহরের দক্ষিণ দিকে ইন্কেরমান উপত্যকার মধ্যে দিয়ে এগুচ্ছিল। কয়েদীদের শ্রমে বাগানটি নিখুঁত করে সাজান, এর তকতকে পরিচ্ছন্নতায় চোখ জুড়িয়ে যায়।

সহরের উপর সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওদের বার যা পোনের জনের একটা দল

পেছনের ফটক দিয়ে বাগানে ঢোকে, কাজ করে বিকেল তিনটে চারটে পর্যন্ত, ওদের পাহারাদার সিপাহী দুটো রাইফেলে ভর দিয়ে ফটকের কাছে বা বাগানের ভিতর ঝিমোয়।

রবিবার ছাড়া প্রতিটি দিন ওরা এখানে কাজ করতে আসে, সাধারণত একই লোক ওরা। বালতি করে জল আনে, ফুলের কেয়ারিতে জল দেয়, আগাছা তোলে, গাছ ছাঁটে, রাস্তা ঝাঁট দেয়, নুড়ি বিছিয়ে দুরমুশ দিয়ে সমান করে রাস্তা সুন্দর বানায়—এক কথায় বাগানের প্রধান মালি কার্ল কার্লভিচ নামে ছিমছাম, সুশৃঙ্খল জার্মানটি যা বলে ওরা তাই করে।

কাজটা খুব খাটুনীর নয়। বাগানের কাজে খুশি হয়ে ওরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে মালিককে খুশি করতে।

অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি-পাওয়া এই লোকগুলোর সঙ্গে দেখা করার জন্যই ভাসিয়া ছুটে এসেছে।

## ৩

মা আর বোনেরা তাকে এই সব সমাজচ্যুত লোকদের সঙ্গে কথা বলা ত দূরের কথা, কাছে ঘেঁষতেও নিষেধ করেছে, তবু বালকটি ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাপের পর ধাপ পেরিয়ে চলেছে। দীর্ঘ বীথির উপর ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে সানন্দে আশা করছে কতক্ষণে কয়েদীদের সঙ্গে কথা কইবে, ওদেরই সঙ্গে প্রাতরাশ খাবে। একখণ্ড লাল ও রসাল তরমুজ আর প্রচুর লবণ ছড়িয়ে কালো রুটি দিয়ে ওরা প্রাতরাশ সারে। ওদের এই সামান্য খাবারের অংশ ছেলেটিকে দিয়ে খুবই আনন্দ পায় ওরা।

বাচ্চাটার মনে হয় এই প্রাতরাশ পৃথিবীর যে কোন জিনিষের চাইতে বেশী স্বাদু—টেবিলে সাজান রুচিকর খাবারের চাইতে অনেক বেশী মুখরোচক। এই মাথা-কামান লোকগুলো, যাদের শেকল বাজছে ঝন ঝন করে , তাদের সঙ্গ ওর কাছে মনে হয় সহজ ও স্বাভাবিক। বাড়ির চাইতে অনেক বেশী সহজ মনে হয় তার, বিশেষ করে ডিনারের চাইতে, যখন স্তব্ধ ও গুম হয়ে চারপাশে বসা

লোকদের মাঝখানে গলা দিয়ে নাবাতে হয় ওই জঘন্য স্যুপটাকে যাতে তার সদা মেজাজী বাবা না বিগড়ে বসেন। ক্লিষ্ট ও অধীর নিস্তব্ধতার মাঝখানে খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাঠ হয়ে বসে থাকতে হয় তাকে।

নিজের মনে বাগানের ভেতর ছুটোছুটির অভ্যেস ছিল তার (নিজের খেয়ালমতই ওকে চলতে দেওয়া হত), তাই সেই গ্রীষ্মে কয়েদীদের সঙ্গে তার আলাপ হয় আর বন্ধুত্ব জমে ওঠে। তার আগে পর্যন্ত ওদের দেখে সে ভয় পেত। উঁচু বাগানে ফলফুলুরি জোগাড় করতে যখন যেত সে, ওদের থেকে নিরাপদমূলক দূরত্ব রেখে চলাফেরা করত, কথায় কথায় মারত ছুট। তখন তার মনে হত এই ধূসর টুপি-পরা লোকগুলো, যারা বাগানের মাটি খুঁড়ছে আর হাতগাড়ীতে বালি বোঝাই করছে, তারা যে কোন সাংঘাতিক ও দুষ্ট কাজ করতে পারে, এমনকি তার ছোটবেলায় নার্স আগাফিয়া তাকে যে বলেছিল ওর মত দুষ্ট ছেলেকে ওরা চুরি করে জ্যান্ত পুড়িয়ে খায়, হোক না এডমিরালের ছেলে, তাও সে বিশ্বাস করেছে। সে সময় নার্সের কথা ওর মনে গভীর দাগ কাটে কিন্তু ওদের বিপক্ষে বলতে গিয়ে তার মা, ভাই ও বোনেরা এত মারাত্মক কথা বলেনি। আর কাউকে সে আগাফিয়ার কথা বলতে শোনেনি। যাই হোক, ওর সামনে কয়েদীদের নিয়ে মাঝে মাঝে যে সব মন্তব্য করা হত, তাতে কোন সন্দেহই ছিল না যে ওই লোকগুলোর ভেতর এত অপরাধ আছে যা গুণে শেষ করা যায় না। ওদের একবার ছেড়ে দিলে ওরা দেখিয়ে ছাড়বে শয়তান কাকে বলে! যথার্থই ওদের মাথা কামিয়ে শেকলে আটকান হয়েছে।

এ কথা একবার বলেছিল ভাসিয়ার মার এক অতিথি বন্ধু — লোকটা বেঁটে বুড়ো এক জেনারেল। ওদের খাবার খারাপ দেওয়া হচ্ছে এবং ওদের বরাদ্দ পুরো খাদ্য ওরা পাচ্ছে না কয়েদীরা এই অভিযোগ জানিয়েছিল বলে এই বুড়ো ছ্যা ছ্যা করেছে। কয়েদীদের টাকা আত্মসাৎ করার ব্যাপারে লোকটা নিজেই জড়িত—এই বুড়োর মাথায় অবশ্য এ কথা ঢোকেনি যে অচিরেই সেভাস্তোপলে যখন শত্রু হানা দেবে, এই কয়েদীরাই পাবে মুক্তি, খসে পড়বে তাদের শৃঙ্খল, আর সকলের সঙ্গে অবরুদ্ধ নগরীর দুঃসাহসী রক্ষাকর্তা হিসেবে দাঁড়াবে এরাই।

এই সব গল্প থেকে বালকের কৌতূহল জাগত। এই ভয়ঙ্কর লোকগুলো

তার মনে ভয় জন্মালেও সে যথেষ্ট সাহস নিয়ে ওদের কখন সখন লক্ষ্য করত অবশ্য নিরাপদমূলক দূরত্ব রেখে যেখান থেকে বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই সে ছুট মারতে পারে।

ওদের যে সব টুকরো কথাবার্তা, কাজের সময় ওদের গুন গুন করা যে সব গান ওর কানে আসত এবং একান্ত শান্ত ও সদাশয় যেসব ভাবভঙ্গী ওর নজরে পড়ত তাতে ওদের সম্পর্কে আগের মনোভাব ও শোনা খবর খাপ খেত না। আগাফিয়ার প্রামাণিক কাহিনীর উপরেও ওর বিশ্বাস টলে যেত।

দুটো ঘটনা ওর মনে খুব গভীর দাগ কাটল।

একদিন বসন্তে সে এই ঘটনাটি লক্ষ্য করেছে। লম্বা, কালো চুল, বয়স্ক, কালো মোটা ঝোপাল ভ্রূ, গর্তে বসা রুক্ষ চোখ একজন কয়েদীকে সে মনে করত সবচাইতে সাংঘাতিক বলে। একদিন একটা চড়ুইয়ের বাচ্চাকে বাসা থেকে নীচে পড়তে দেখে সে ছুটে গিয়ে সযত্নে ওকে তুলে নিল, গাছে চড়ে আবার সেটিকে বাসায় রেখে দিল — মা চড়ুইয়ের মহা আনন্দ, দুশ্চিন্তায় পাখিটা কিচির কিচির করে চারদিকে উড়ে বেড়াচ্ছিল। গাছ থেকে নেবে এসে হাতগাড়ী থেকে রাস্তায় বালু ছড়াবার কাজে লেগেছিল সে। ভাসিয়া অবাক হয়ে দেখতে পেল ওর দয়া-ভরা, আদর-মাখা মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আর একবার কয়েদীরা বাগানের ভেতর একটা ঘর-ছাড়া কুকুরের বাচ্চা পায়। একটা রুগ্ন, থুত্থুড়ে, হতভাগা কুকুর বাচ্চা। অসীম যত্ন নিয়ে ওর সেবা করতে থাকে ওরা। ভাসিয়া দেখেছে ওরা ওকে চিবোন কালো রুটির টুকরো খাওয়াচ্ছে, ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে রাখছে সযত্নে। এরপর সে শুনল ওরা বলাবলি করছে ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। এই সিদ্ধান্তে সবাইকে খুব খুশি মনে হল।

'এখানে থাকলে ওটা নির্ঘাৎ মারা যাবে,' সেই ঝোপাল ভ্রূওয়ালা কুৎসিত কয়েদীটা বলল। 'শোন ছেলেরা, আমিই এর দেখাশুনো করব, ওর নার্স হব বুঝলে কিনা', সানন্দে হেসে প্রস্তাব করল সে।

এ সব দেখেশুনে ভাসিয়ার কাছে অন্তত একটা জিনিষ পরিষ্কার হল, তা এই যে এই লোকগুলো ভয়ঙ্কর হলেও এদের ভেতর দয়ার ভাব আছে।

সন্দেহটা দূর করার জন্য বুড়ো নাবিক কিরিলার কাছে সে কথাটা পাড়ল।

লোকটা তাদের বাড়ির চাকর। ভাসিয়া জিজ্ঞেস করল, এটা কি সত্যি যে কয়েদীরা বাচ্চাদের চুরি করে আর খেয়ে ফেলে?

উত্তর দিতে গিয়ে স্বভাবত গম্ভীর, ভারিক্কি ও একটু বিষণ্ণ ধরনের কিরিলা তার প্রকাণ্ড মুখটাকে হাঁ করে এমন দিলখোলাভাবে হাসতে লাগল যে ভাসিয়া একেবারে থ মেরে গেল, অনুমান করল গণ্ডমূর্খের মত একটা প্রশ্ন করে নিজেকে সে বোকা বানিয়েছে।

হাসির দমক থামতে কিরিলা জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমাকে এ কথা বলেছে, খোকাবাবু?'

'নার্স।'

'সবচাইতে মুখ্যু বুড়ী গিন্নির গপ্প। ও তোমাকে একটা আষাঢ়ে গপ্প বলেছে আর তুমি তাই বিশ্বাস করে বসে আছ! কেউ মানুষ খাচ্ছে একথা কে কবে শুনেছে? জিজ্ঞেস করে দেখো, কারও এ খবর জানা নেই। তবে হ্যাঁ, সমুদ্দুরের পরপারে একটা দ্বীপ আছে বটে, সেখানে থাকে নরখাদকরা, বনমানুষ — দেখতে বানরের মত। ওরা সত্যি মানুষখেকো, ঐ জানোয়ারের দল! এটা শুনেছি এক নাবিকের কাছে। সে গভীর সমুদ্রে ঘোরাফেরা করেছে, সারা পৃথিবী চক্কর মেরেছে। বলতে গেলে ওরা ইঁদুর, পোকামাকড়, সাপ সবকিছুই খায় আর অন্য জাতের লোক পেলে মানুষও খায়, অদৃষ্টদোষে সে যদি ওদের খপ্পরে পড়ে। কিন্তু বাচ্চা ছেলেকে খায় এমন আর কোন জায়গা আমার জানা নেই। ঈশ্বর রক্ষা করুন, রাশিয়া কেন, এমন কোন খ্রীষ্টান দেশই নেই যেখানকার লোক এ কাজ করবে। তোমার নার্স তোমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছে, এই আর কি। মেয়েদের কাছ থেকে আর কী আশা করতে পারো? একটা মোটা মাথা নানির পক্ষেই বাচ্চার কাছে এমনি উজবুক গপ্প বলা সম্ভব!' ঘেন্না জানিয়ে যোগ করে কিরিলা।

'আরে, ও যা বলেছে তাই আমি বিশ্বাস করেছি বুঝি! লোকেরা যে মানুষ খায় না এ বুঝি আর আমার জানা নেই!' অপমান বোধ করে ছেলেটি প্রতিবাদ জানাল। 'তোমাকে শুধু জিজ্ঞেস করছিলাম। কয়েদীরা মোটেই ভয় পাবার মত লোক নয় আমি জানি,' কথাটা যোগ করল আনুমানিকভাবে, গোপনে ইচ্ছেটা এই,

কিরিলার মত এরকম একজন সবজান্তা লোকের কাছ থেকে কিছু তথ্য জোগাড় করা।

'কেন ভয় পেতে যাবে? ওরা আমাদের মতই মানুষ। প্রভেদ এই ওদের অদৃষ্ট খারাপ, বুঝলে ত, হতভাগার দল।'

'কেন ওরা কয়েদী হল, কিরিলা?'

'কারণ বহু। ওরা ছিল নাবিক কিংবা সৈন্য... সেখানে নিয়মের এমনি কড়াকড়ি, যে কোন লোক একটুতেই ফ্যাসাদে পড়তে পারে। তবে এদের কেউ কেউ সত্যি খারাপ কাজ করেছে ... যেমন চুরি বা ডাকাতি করে ধরা পড়েছে হাতে হাতে। এখন পাপের খেসারৎ দিচ্ছে ... কিন্তু কেউ কেউ শাস্তি পাচ্ছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে।'

'সেটা কী জিনিষ?' ভাসিয়া সটান জিজ্ঞেস করল।

'আমি বলছি সেই সব লোকদের কথা যারা অত্যাচার সইতে পারে না, যাদের আত্মা প্রহার আর চাবুকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানায়। উপরওয়ালা অফিসারকে একটা শক্ত কথা বলল, ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে কয়েদ! হয়ত বা মাতাল হয়ে কোন দুষ্কর্ম করল। এমনি বহু কারণ আছে। কখন কয়েদীর সামিল হবে কেউ বলতে পারে না।'

'কিন্তু কেন?'

'যে কোন কারণে। ধর রগচটা একটা লোক তার উপরওয়ালা জানোয়ারটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, লোকটার কাজ মানুষকে ধরে পিটোন, কারণ থাক চাই নাই থাক ... যতক্ষণ সম্ভব সহ্য করল, কিন্তু একদিন হয়ত রাগের মাথায় উপরওয়ালার মুখের উপর কথা বলে বসল... সঙ্গে সঙ্গে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়... তারপর চলে দারুণ বেত্রাঘাত ... আধমরা অবস্থায় পাঠান হয় কয়েদীর দলে ... ওদের নিয়ে নার্স তোমাকে যা বলে তার এক বর্ণও বিশ্বাস করো না ... ওদের ভয় পাবারও দরকার নেই, ঘেন্না করারও কারণ নেই ... ওদের কেবল দয়াই দেখান চলে।'

তার নিজের মন্তব্যসহ, এমন সুন্দর করে সাজান ব্যাখ্যার পর কয়েদীদের সম্পর্কে ভাসিয়ার ভয় গেল অনেক কমে। সাহস করে ওদের আরও কাছে এগুতে

লাগল সে, দেখল ভাল করে। মুখগুলো সাধারণ মানুষেরই মত, বেশীর ভাগই সৎ মানুষের মত, এতটুকু খারাপ ভাব নেই ওদের ভিতর। তারা কথা বলে, হাসি ঠাট্টা করে ঠিক অন্য লোকদেরই মত এবং ভাসিয়ার মতে, ওরা খায় প্রচণ্ড ক্ষুধা আর তৃপ্তি নিয়ে।

একদিন সকালে ভাসিয়া লোলুপ দৃষ্টিতে দেখছিল কয়েদীরা জলে ভিজিয়ে লবণ-মাখা কালো রুটি খাচ্ছে। ওদেরই একজন এমন আন্তরিকতার সঙ্গে ওর হাতে এক টুকরো 'কয়েদী রুটি' তুলে দিল যে ভাসিয়া ওদের সঙ্গে বসে দুটো টুকরো খেয়ে ফেলল। এমন সদাশয়ভাবে ওর দিকে চাইল তারা, এমন ভদ্রভাবে ওর সঙ্গে কথা বলল যে ছুটির পর তাদের নতুন অতিথিকে নমস্কার জানিয়ে ওরা যখন আবার কাজে গেল দুঃখ হতে লাগল ভাসিয়ার।

এমনিভাবে সুরু হল এডমিরালের ছেলের সঙ্গে কয়েদীদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। এ বন্ধুত্বের কথা ভাসিয়া অবশ্য ঘুণাক্ষরেও বাড়িতে জানাল না, কারণ সে জানে এর ফলে আর যাই হোক, কেউ তাকে প্রশংসা করবে না। যতই সে ওদের ভাল করে জানতে পারল ততই তার এ ধারণা বদ্ধমূল হতে লাগল যে তার নার্স, মা, বোনেরা, বেঁটে জেনারেল এদের খারাপ লোক ভেবে অবশ্যই ভুল করেছে। বরং ভাসিয়ার মনে হল ওরা দিব্যি দয়ালু। এই সব লোক যারা এত খাটে, তার সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার করে, নিজেদের তৈরী খেলনা ওকে উপহার দেয় তাদের কেন মাথা কামান আর পায়ে শেকল জড়ান — এ ভেবে সে অবাক না হয়ে পারে না, এই শেকলের জন্যই ত ওরা ওর মত যেখানে খুশি যেতে পারে না।

নতুন পরিচিতের প্রত্যেকের সঙ্গেই ভাসিয়ার সদ্ভাব, কিন্তু ওর বিশেষ প্রিয়পাত্র একটি অল্পবয়েসী দোহারা চেহারার, সোনালী চুল কয়েদী—ফিকে নীল চোখ দুটি করুণায় ভরা। ওর কী অপরাধ ভাসিয়া জানত না বা জানবার চেষ্টাও করত না। ওর ধারণা, যেভাবেই হোক, অপরাধটা নিশ্চয়ই তেমন কিছু নয়।

এই বিষণ্ণ চিন্তাগ্রস্ত-চোখ কয়েদীটির উপর ওর বিশেষ মায়া পড়েছিল। ভাসিয়াকে ও চমৎকার গল্প বলত, ওর গলার নরম স্বর, সদা বিষণ্ণ ভাব,

অদ্ভুত মায়া-ভরা স্মিত হাসি — এক কথায় তার সবকিছুই ওর মন কেড়ে নিয়েছিল।

নাম মাক্সিম। কয়েদীরা ডাকে 'নাইটিঙ্গেল' বলে কারণ কাজের সময় সে গান গায় আর সে গান অতি মিষ্টি।

কখনো বা তার এই অবর্ণনীয় দুঃখ-ভরা গান শুনে বালকের ছোট্ট হৃদয়টি শেকল-পরা এই কয়েদীর জন্য অপরিসীম করুণায় ভরে উঠত, জল আসত চোখ ছাপিয়ে।

আবেগে অভিভূত হয়ে প্রায়ই সে ছুটে চলে আসত।

## ৪

ভাসিয়া ঠিক সময়টিতে বাগানে হাজির হল।

কয়েদীরা এই মাত্র আধঘণ্টার ছুটি পেয়েছে। কেউ কেউ একা বা দল বেঁধে বসেছে একটা বীথিকার পাশে দেয়ালের ছায়ায়। নিজেদের পয়সায় কেনা শস্তা তরমুজ ও রোজকার পাওনা কালো-রুটি দিয়ে প্রাতরাশ খাচ্ছে।

প্রফুল্ল, উল্লসিত জীবনের আনন্দে ভরপুর ভাসিয়া ছুটে এল ওদের কাছে। চারদিক থেকে উৎসারিত অভ্যর্থনার উত্তরে সানন্দে মাথা নাড়ল সে।

'ভাল ঘুম হয়েছিল, খোকাবাবু?'

'নার্স কি আবার আপনাকে ভয় দেখিয়েছে?'

'এক টুকরো তরমুজ খাবেন, স্যার?'

'আমারটা খেয়ে দেখুন, খুবই ভাল!'

'খোকাবাবু মাক্সিমের সঙ্গে খাবে। ও একটা বড় তরমুজ কিনে এনেছে।'

'কিন্তু কোথায় সে?' বন্ধুর জন্য চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ভাসিয়া।

'ঐ যে আঙুর গাছের নীচে, বসে আছে নিজের মনে... যান ওর কাছে, একটু চাঙ্গা করুন ওকে... আবার মুখ গোমড়া করেছে...'

'কেন?'

'নিজে জিজ্ঞেস কর্‌ন... মনে হয় জেলজীবনে এখনো অভ্যস্ত হয়নি... খাঁচার পাখির মত মনমরা ও।'

'তাতে আবার করপোরালটা কাল ওকে মেরেছে,' বলল কালোপানা বয়স্ক কয়েদী — লোমশ ভ্রূজোড়া ব্রণ-ক্ষত ম্‌খটাকে ভয়ঙ্কর করে তুলল।

'কিসের জন্য?' জিজ্ঞেস করল ভাসিয়া।

'আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলব, কোন কিছ্‌র জন্যই নয়... মাক্সিম ওকে খেয়াল করে রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ায়নি। ঐ শয়তানটা ওর চোয়ালে ঘ্‌ষি মারল প্রথমটায় ডান হাতে... পরে বাঁ হাতে... এটা মান্‌ষের সহ্যের বাইরে, তাই না কি? কারণ থাকলে ব্‌ঝতাম, একেবারেই কোন কিছ্‌ না!' বয়স্ক কয়েদীটি ব্যাখ্যা দিল।

অন্যায়ভাবে শাস্তি-পাওয়া যে কী কষ্টকর ইতিমধ্যেই ভাসিয়ার সেই অভিজ্ঞতা জন্মেছে কারণ বাবার রাগ বা মায়ের খারাপ মেজাজের সময় সে এটা ব্‌ঝেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে একমত হল ওটা সত্যি কলঙ্কের কথা, মাক্সিমকে যে মেরেছে সে নির্ঘাৎ একটা শয়তান, ভাসিয়ার ইচ্ছা ওর 'চোয়াল থে'ৎলে' দেয়।

কয়েদীদের চাষাড়ে ভাষা থেকে ধার-করা এই কথা কয়টি সহাস্য সমর্থন পেল। 'খোকাবাব্‌ ব্‌দ্ধিমান ছেলে,' এই প্রশংসার পর দ্রুত সে চলে গেল মাক্সিমের কাছে।

'গ্‌ড মর্নিং, মাক্সিম!' আঙ্‌র গাছের নীচে হামাগ্‌ড়ি দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলল সে, দেখল মাক্সিম বসে আছে মাটির উপর, পাশে ছড়ান তরম্‌জের টুকরো আর কালো র্‌টির তাল।

'নমস্কার, খোকাবাব্‌!' নরম গলায় জবাব দিল মাক্সিম, উচ্চারণে স্পষ্ট উক্রেনীয় ঝোঁক। 'ঘ্‌মিয়েছিলেন ভাল? নিন, এই তরম্‌জটুকু খান—খেতে ভাল... স্‌র্‌ কর্‌ন...' ভাসিয়ার হাতে দিল প্‌র্‌ একখন্ড তরম্‌জ আর র্‌টির একটা টুকরো, ওর দিকে চেয়ে হাসল সদয়ভাবে, বড় বড় চোখ দ্‌টি বিষণ্ণ। 'আপনারই জন্য অপেক্ষা করছি...'

'ধন্যবাদ, মাক্সিম... তোমার পাশে বসব... কিছ্‌ মনে করবে না ত?'

'কেন মনে করব? বসুন... জায়গাটা সুন্দর আর ঠাণ্ডা।'

ভাসিয়া বসল। পকেট থেকে বার করল কয়েক খণ্ড চিনি আর কাগজে মোড়া একটু চা। মাক্সিমকে দিয়ে বলল:

'এ হল তোমার... নিজের জন্য একটু চা বানিয়ে নিও...'

'ধন্যবাদ, খোকাবাবু... সুন্দর মনটি আপনার... আমার শুধু ভয় বাড়ি থেকে চা, চিনি আনতে গিয়ে ফ্যাসাদে না পড়েন।'

'কোন ফ্যাসাদে পড়ব না, মাক্সিম, কিছু ভেবো না। কেউ জানতে পাবে না... সবাই ঘুমিয়ে আছে ঘরে। শুধু বাবা জেগে আছেন তাঁর পড়ার ঘরে। ভয়টাই বা কি, আমাদের ত কত চা চিনি আছে!' বন্ধুকে আশ্বাস দেবার জন্য চটপট বুঝিয়ে বলল সে। স্পষ্ট তৃপ্তির সঙ্গে এক এক কামড় কালো রুটির সঙ্গে রসাল তরমুজ খেতে লাগল। রস গড়িয়ে পড়তে লাগল জ্যাকেট বেয়ে, কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

মাক্সিম তার পকেটে চা, চিনি রেখে খেতে সুরু করল।

'আর একটু নিন!' ভাসিয়া টুকরোটা খেয়ে ফেলেছে দেখে বলল মাক্সিম।

'তাহলে তোমার আর কী থাকবে,' একদিকে নিজের খাবার লোভ, আর একদিকে বন্ধুর ভাগে কম পড়বে, এই দোমনা ভাব নিয়ে বলল ভাসিয়া।

'প্রচুর আছে। তাছাড়া, আমার আজ খাবার ইচ্ছে নেই।'

'দাও তাহলে আর এক টুকরো।'

কিছুক্ষণের ভেতরেই রুটি আর তরমুজ শেষ হয়ে গেল। ভাসিয়া জিজ্ঞেস করল:

'তুমি এত মনমরা কেন, মাক্সিম?'

'কয়েদীর আবার ফুর্তি কিসের, খোকাবাবু?'

'শেকলে বুঝি ব্যথা পাও?'

'কয়েদীর জীবন নরকের সমান। কাজের সময়ও খারাপ ছিল কিন্তু এখন আরও জঘন্য।'

'কী ছিলে তুমি—সৈনিক না নাবিক?'

'নাবিক। ক্যাপ্টেন বগাতভের কাছে কাজ করতাম... ওর নাম শুনে থাকবেন হয়ত... "তার্ তারার্ খভ" রণপোতে ওই ছিল অধিনায়ক।'

'জানি ওকে... আমাদের বাড়ি আসে... লোকটা মোটা আর প্রকান্ড ভুঁড়িদার...'

'ওরই জন্য আমি কয়েদী হয়েছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, আমার জীবন ধ্বংস করেছে বলে পরলোকে ও যেন সাজা পায়।'

'তুমি কি ওকে মেজাজ দেখিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, দেখিয়েছিলাম। নাবিকদের ভিতর আমি ছিলাম সবচেয়ে শান্ত আর নিরীহ কিন্তু ও আমাকে পাগল করে ছাড়ে... চাবুক মারে পশুর মত!'

'কিন্তু কেন?'

'যে কোন কারণে। দোষ থাকুক চাই না থাকুক জাহাজের কাজের জন্য। ওরই জন্য দু'মাস আমাকে হাসপাতালে কাটাতে হয়েছে... রক্তমাংসের শরীরে আর কত সয়... হ্যাঁ, আমি ওকে জানোয়ার বলেছিলাম... সত্যিই ও জন্তু... ওতেই আমার সর্বনাশ হল। ওরা আমাকে কঠোর সাজা দিল। আমার নামে অনেক অভিযোগ এনে পাঠিয়ে দিল কয়েদীদের জেলখানায়... আরও কিছুদিন এসব সহ্য করলে হয়ত ছিল ভালো... হয়ত বা মুক্তি পেতাম ওর হাত থেকে, জুটত ওর চাইতে ভাল লোক, কাজ করতে পারতাম তার কাছে। আর যাই হোক, নাবিকের কিছুটা স্বাধীনতা আছে... কিন্তু এখানে দেখতেই পাচ্ছেন কয়েদীর জীবন কী জিনিষ। একেবারে নরক। যে কোন লোক হুকুম করতে পারে, অপমান করতে পারে... স্বভাবতই আমি কেউ নই—একটা কয়েদী মাত্র,' তিক্ত হেসে মাক্সিম তার বক্তব্য শেষ করল।

ভাসিয়া গভীর সহানুভূতি নিয়ে ওর কথা শুনছিল। চিন্তাভরে কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে দৃঢ়ভাবে বলল:

'এতই যখন খারাপ লাগছে, তুমি পালিয়ে যাও না কেন, মাক্সিম?'

কথাটা শুনে কয়েদীর চোখ দুটো আনন্দে চক চক করে উঠল। জবাবে জানাল:

'আপনি কী ভাবছেন?.. সুযোগ পেলে অনেক আগেই পালাতাম, চলে যেতাম বাড়ি।'

'তোমার বাড়ি কোথায়?'

'কামেনেৎস-পদোলস্ক প্রদেশে... প্রস্কুরভ সহরের কথা শুনে থাকবেন হয়ত?.. আমাদের বাড়ি সহর থেকে মাইল আটেক দূরে। ইচ্ছে করে মা বাবাকে একবার দেখে অস্ট্রিয়ার সীমান্ত পেরিয়ে ভাগ্যটাকে যাচাই করতে,' চাপা উত্তেজনার সঙ্গে বলতে থাকে মাক্সিম, তার কথার উদ্দীপনায় মনে হল সে যেন বহুদিন ধরেই পালিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখছে। 'কাউকে কিন্তু এ কথা বলবেন না, খোকাবাবু। তাহলে আমাকে চাবকেই মেরে ফেলবে।' ছেলেটির কাছে গোপন কথা ফাঁস করার আতঙ্ক নিয়ে কথাটুকু জুড়ে দিল। বাচ্চাটা ত ঝপ করে কথাটা বলেও ফেলতে পারে!

ভাসিয়া আন্তরিকভাবে ক্রুশচিহ্ন আঁকল, জল-ভরা চোখে শপথ জানাল মাক্সিমের কথা পৃথিবীর কোন প্রাণীই টের পাবে না। সে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে ভাসিয়ার জন্য ওকে চাবুক খেতে হবে না। ছোট হলেও যে কোন লোকের মতই সে কথা রাখতে জানে।

এই প্রতিশ্রুতিতে মাক্সিম কিছুটা আশ্বস্ত হল। অস্ট্রীয় সীমান্ত দিয়ে মাক্সিমের পালিয়ে-যাওয়ার প্রস্তাব ভাসিয়ার মনে আগুন ধরিয়ে দিল (অস্ট্রীয় সীমান্ত সম্বন্ধে যদিও ওর অতি সামান্য ধারণাই আছে), ষড়যন্ত্রকারীর আগ্রহ-ভরা রহস্যময় কণ্ঠে বলতে থাকল সে:

'তুমি বলছ পালাতে পার না কিন্তু আমার ত মনে হয় ব্যাপারটা খুবই সোজা।'

'কী করে, খোকাবাবু?' মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল মাক্সিম।

'এই বাগানের ভিতর তোমার শেকলটা ভেঙে ফেল... একটা হাতুড়ি এনে দেব তোমাকে। তার পর পাঁচিল পেরিয়ে ছুট মারবে অস্ট্রীয় সীমান্তে।'

মাক্সিমের মুখে করুণ হাসি।

'এই কয়েদীর পোষাকে? দেখতে হবে না, সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে পাকড়াও করবে।'

'রাতের বেলায় চেষ্টা করবে।'

'কয়েদী জাহাজ থেকে রাতে পালান যায় না... আমাদের রাখে তালাচাবি দিয়ে। তাছাড়া, সিপাই দেখতে পেলেই গুলি চালাবে...'

ভাসিয়ার উত্তেজনা-ভরা মুখখানা মেঘলা হয়ে গেল, হতাশ হয়ে বলল:

'তাহলে পালাবার কোন পথই নেই?'

কয়েদী কিছুই বলল না কিন্তু তার চুপচাপ ভাবের ভিতর একটা চাপা উত্তেজনা। হঠাৎ যেন একটা বুদ্ধি খেলে গেল তার। রুগ্ন, ফ্যাকাশে মুখটা উঠল জ্বলে—চোখ দুটো করতে লাগল চক চক। ছেলেটির দিকে চেয়ে রইল উদ্বেগ-ভরা সন্ধানী দৃষ্টি মেলে, যেন সে ওর আত্মার অন্তস্তল দেখতে চায়, বলতে চায় এমন একটা কথা যা সে বলে উঠতে পারছে না।

'কথা কইছ না কেন, মাক্সিম? তুমি কি ভয় পাচ্ছ আমি বলে দেব?' ক্লিষ্ট গলায় বলল ছেলেটি।

'না, খোকাবাবু... হতভাগা কয়েদীটার আপনি কোন ক্ষতিই করবেন না... আপনার হৃদয় দয়ায় ভরা!' আন্তরিকভাবে বলল মাক্সিম, পরেই যেন একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পেঁছে ফিসফিসিয়ে বলল। 'হ্যাঁ, পালান চলে, কিন্তু আপনি যেভাবে বলছেন সেভাবে নয়, খোকাবাবু।'

'কী ভাবে তাহলে?'

'যদি একটা পোষাক পাই, ধর...'

'কী পোষাক?'

'মেয়ের পোষাক—যেমন আপনার নার্সটি পরে।'

'মেয়ের পোষাক?' ছেলেটি আবার জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, ঐ সঙ্গে একটা শাল, মাথা ঢাকার মত একটা কিছু বুঝলেন... তাহলে একবার চেষ্টা করা যায়!'

মুহূর্তের জন্য ভাসিয়া ভেবে নিল, তারপর জোর দিয়ে বলল:

'আমি তোমাকে নার্সের পোষাক আর শাল এনে দেব।'

'আপনি...?'

উত্তেজনায় তার বাকরোধ হল। হঠাৎ সে ভাসিয়ার হাত জড়িয়ে ধরে চুমোয় ভরিয়ে দিল।

ভাসিয়া পাল্টা ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল।

'কিন্তু আপনি কী করে এ কাজ করবেন?.. যদি আপনাকে ওরা ধরে ফেলে?..'

'কিছু ভেবো না, মাক্সিম... কেউ আমায় ধরবে না... সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি বুদ্ধি করে এ কাজ করব। জিনিষগুলো রাখব কোথায় তাই বল।'

'এখানে... এই আঙুর ঝোপে। লুকোবার জন্য পাতা দিয়ে ঢেকে দেবেন।'

'মাটি দিয়ে ঢাকলে কেমন হয়, মাক্সিম?' কাজের লোকের মত গম্ভীর ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করল ভাসিয়া।

'অত পরিশ্রমের দরকার নেই। পাতাতেই চলবে। এখানে কেউ আসে না।'

'বেশ। কাল সকালেই আগেভাগে জিনিষ এনে রাখব। রাতেও হতে পারে... রাতে বাগানে আসতে আমার ভয় নেই। ভয়ের কী আছে বলো?'

'ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন, জীবন ভর আপনার জন্য প্রার্থনা জানাব।'

'এই, কাজে লাগ!' দূরে সিপাহীর গলা শোনা গেল।

'আবার এসে তোমায় দেখে যাব, মাক্সিম। আজই আমাদের শেষ দেখা। কাল আর তুমি এখানে থাকবে না!' ছেলেটির গলায় দুঃখের রেশ।

এই বলে সে আঙুর বাগানের তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে বাড়ি চলে গেল।

## ৫

আসন্ন দুঃসাহসিক কাজের চিন্তায় তন্ময় হয়ে ভাসিয়া দিনভর প্রবল উত্তেজনায় এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল। সে যে কী করেছে, বাবা জানতে পারলে তার কী ফল দাঁড়াবে একবারও সে কথা মনে হল না। নার্সের ঘরে পড়ে-থাকা তার পোষাক আর হাতুড়ি নিয়ে যাবার ফন্দী মন জুড়ে রইল। দিনের বেলা নার্সের ঘরখানা দেখে রেখেছে সে, জিনিষ দুটোর উপর রাখল বিশেষ নজর।

দিনটা এমন ঝিমিয়ে চলেছে ওটা যেন আর শেষ হবে না। কেবলি বাগানে ছুটে যেতে লাগল সে, ভারাক্রান্ত মনে রাস্তায় পায়চারি করল আর একা দেখলেই মাক্সিমের কাছে ছুটে গিয়ে রহস্যময় কণ্ঠে দু'চারটে কথা বলে এল।

'বিদায়, প্রিয় মাক্সিম... হয়ত কাল এমনি সময় তুমি থাকবে অনেক, অনেক দূরে!' কয়েদীরা চলে যাবার উপক্রম করতে জল-ভরা চোখে সে বলল বিড় বিড় করে।

'বিদায়, খোকাবাবু!' ছেলেটির দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলল মাক্সিম, দৃষ্টিতে ভাষাতীত কৃতজ্ঞতা।

কয়েদীদের লাইন করে দাঁড় করান হল, হাঁটিয়ে নিয়ে-যাওয়া হল সার বেঁধে, শিকলগুলো উঠল ঝন ঝন করে। অনেকক্ষণ ধরে ভাসিয়া একদৃষ্টে চেয়ে রইল ওদের দিকে।

ভাগ্যক্রমে বাড়িতে কেউ ওর উত্তেজনা লক্ষ্য করল না। সত্যি বটে ডিনারের সময় বাবা ওর দিকে দু'বার এমন ভাবে চাইল যাতে ও গেল মুষড়ে। মনে হল বাবা ওর মনের খবর টের পেয়েছে, তখনই গর্জন করে বলে উঠবে, 'তোর মৎলব কী জানি, ক্ষুদে শয়তান!'

কিন্তু বাবা শুধু বলল:

'খাচ্ছিস না কেন?'

'খাচ্ছি ত, বাবা।'

'অতি কম। ডিনার মানেই পেট পুরে খাওয়া!' একটা চিৎকার।

ভাসিয়ার এক ফোঁটাও খিদে নেই, তবু বাবার কথামত মুখভর্তি করে খেতে সুরু করল সে, মনে মনে খুশি—কী হতে চলেছে বাবা তার বিন্দুবিসর্গও জানেন না।

বিকেল নাগাদ হাতুড়িটা ভাসিয়ার বিছানার তলায় গায়েব হল। সে দিন সন্ধ্যায় অতিথিরা মজাদার গপ্প বলা সত্ত্বেও অভ্যস্ত সময়ের আগেই সে শুতে গেল।

মাকে শুভরাত জানিয়ে চুমো খেতে যেতেই সে উদ্বেগের সঙ্গে কপালে হাত দিয়ে বলল:

'শরীর ভাল আছে ত, বাবা?.. মুখটা যে পুড়ে যাচ্ছে।'

'আমি ঠিক আছি, মা ... একটু ক্লান্ত আর কি।'

মায়ের নরম সাদা হাতে চুমো খেল সে। বোন আর অতিথিদের বিদায় জানিয়ে দৌড়ে গেল নার্সারীতে। বাবাকে গুড নাইট জানাতে হয়নি বলে খুশি — সে বাড়ি নেই।

'শোব নানি!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

'এত চটপট যে? খুব ব্যস্ত ছিলে বুঝি?'

'হ্যাঁ নানি ... ক্লান্ত লাগছে!' ওর চোখ এড়িয়ে বলল ভাসিয়া। সন্দেহ-না-করা লোকের জিনিষ হাতাবার ফন্দী-আঁটা অপরাধীর মনোভাব ওর ভেতর।

নার্স ওর পোষাক ছাড়িয়ে ঘুমপাড়ানি গপ্প বলার প্রস্তাব জানাল, কিন্তু ভাসিয়া বলল ওর ঘুম এসে গেছে।

'তাহলে ঘুমিয়ে পড়ো, সোনা!'

সে ওকে চুমো খেল, ওর উপর আঁকল ক্রুশচিহ্ন এবং ঘর ছেড়ে যাবার উপক্রম করতেই ভাসিয়া হঠাৎ বলে উঠল:

'জানো, নানি, আমার জন্মদিনের পর তোমাকে একটা নতুন পোষাক উপহার দেব।'

'ধন্যবাদ সোনা, কিন্তু তোমার মাথায় আবার এ খেয়াল কেন? আমার এত পোষাক আছে, পরে উঠতেও পারি না।'

'কটা আছে তোমার?'

'তা, ছটা ত বটেই, তাও ত পশমের দুটো ধরিনি।'

'ও!' ভাসিয়ার মন শান্তি পেল। 'তাহলে তোমাকে আর কিছু কিনে দেব, নানি ... জন্মদিনের পর আমার কত টাকা হবে ...'

'আচ্ছা, আমার সোনামণির মন কত ভাল ... ধন্যবাদ তোমাকে ... এবার ঘুমিয়ে পড়ো, লক্ষ্মী। আমিও শুতে যাচ্ছি।'

একটু বাদেই পাশের ঘরে আগাফিয়ার নাকের ডাক শুনতে পেল ভাসিয়া।

ওর মানসিক উত্তেজনা এতই প্রবল যে সে ঘুমোতে পারল না। বাড়ির আর সবাই ঘুমোন পর্যন্ত সে জেগে থাকবে বলে ঠিক করল, তারপর সে নিশ্চিন্তে

বৈঠকখানার দরজা দিয়ে বাগানে ঢুকতে পারবে। ঐ ঘরটা প্রায়ই তালা-মারা থাকে, চাবিটাও সঙ্গেই লাগান। মা টের পাবে না, বাবার শোবার ঘর বাড়ির আর এক প্রান্তে। দরকার হলে জানলা দিয়েও লাফ মারতে পারবে — ওটা বেশী উ'চু নয়।

প্রতি আধঘণ্টা অন্তর জাহাজের ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনতে পেল সে আর সেই সঙ্গে দূরে-থাকা সান্ত্রীদের পরস্পরকে হাঁক মারার দীর্ঘস্থায়ী একঘেয়ে চিৎকার। শুয়ে শুয়ে বার বার এই কথাই বলতে লাগল ঘুমোবার অধিকার তার নেই — কিছুতেই ঘুমোবে না সে। ভাবতে লাগল কী ভাবে জানলা খুলবে, বাধাবিপত্তি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবে, পোষাকের জন্য পা টিপে ঢুকবে নার্সের ঘরে। মাক্সিমের কথাও ভাবছে সে — কাল কত আনন্দ পাবে সে, পার হবে অস্ট্রীয় সীমান্ত। সেখানে গিয়ে খুশি হবে সে, কেউ তাকে ধরতে পারবে না। কেউ জানতে পারবে না, ভাসিয়া ওকে পালাতে সাহায্য করেছে। ওই যে ওর ত্রাণকর্তা এ কথা ভেবে কী মজাই না পাবে। উত্তেজিত মাথায় চিন্তার ভিড় জমল, বয়ে চলল অন্য খাতে। সেপ্টেম্বরে ওদেসায় যে আবাসিক স্কুলে ওকে ওরা পাঠাতে যাচ্ছে সেখানে যদি ওর ভাল না লাগে কিংবা ওকে যদি বেত লাগাবার চেষ্টা করে সেও ছুটে পালাবে অস্ট্রীয় সীমান্ত দিয়ে। বাড়িতে বাবা তাকে বেতায় বটে কিন্তু এ জিনিষ আর কারও হাতে সে সইবে না! অবধারিত পালাবে সে, খুঁজে বার করবে মাক্সিমকে, থাকবে তারই সঙ্গে। কল্পনাটা চিত্তাকর্ষক কিন্তু হঠাৎ আরও বেশী মন-ভোলান একটা ধারণা এল মাথায়: সে বড় হয়ে একজন জেনারেল হয়েছে, অনেক দিনের পর একটা জমকাল সাদা ঘোড়ায় চেপে হঠাৎ হাজির হবে বাড়িতে, থ মেরে যাবে সবাই। বাবা আর ওকে বেত মারবে না, এক জোয়ান মানুষ সে, তার ছেলে এত কম বয়সে জেনারেল হয়ে গেছে দেখে বাবা অবাক হয়ে যাবে। মা, ভাই, বোনেরা — সবাই যাবে চমকে, জানাবে অভ্যর্থনা। কেন সে পালিয়ে গিয়েছিল, কী ভাবে লড়াইয়ে নাম করেছে বলবে সেই কাহিনী।

'খাসা!' বিছানায় টান হয়ে ভাবল সে। এটা কি জাগন্ত না ঘুমন্ত স্বপ্ন সে সম্পর্কে চেতনা অতি ক্ষীণ।

'ঘুমান চলবে না!' বিড় বিড় করে বলতে বলতে পর মুহূর্তেই ঘুমিয়ে পড়ল সে। কেউ তাকে পাঁজরায় খোঁচা মেরেছে এমনিভাবে উঠে পড়ল ঘুম থেকে, ভয় হল বুঝি বা বেশী ঘুমিয়ে মাক্সিমকে ঠকিয়েছে। মুহূর্তের জন্য তার মাথায় এল না তখন দিন অথবা রাত। চোখ রগড়ে চারদিকে চাইল। সাদা পর্দার ভিতর দিয়ে একটা ক্ষীণ আলো আসছে। জয় ভগবান, বেশী দেরী হয়নি তাহলে!

বিছানা থেকে মারল এক লাফ, পর্দা সরিয়ে বাইরে চাইল। সবে ভোর হতে সুরু করেছে, বাগানটা আবছা অন্ধকারে ঢাকা।

'এই হচ্ছে ঠিক সময়!'

খালি পায়ে চুপিসাড়ে ঢুকল নার্সের ঘরে, বিছানার কাছে পড়ে-থাকা পোষাক আর শালটা তুলে নিয়ে নিজের ঘরে এল। পোষাক পরতে আর জিনিষগুলোকে দুটো তোয়ালেতে জড়াতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল মাত্র।

এখন শুধু ঠিক করা দরকার কী ভাবে বাগানে ঢুকবে—জানলা দিয়ে না বৈঠকখানার দরজা দিয়ে। নিঃশব্দে জানলা খুলল—নীচে তাকিয়ে পিছিয়ে এল। বড্ড উঁচু এটা! বুট খুলে মোজা পায়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

বুকে হাতুড়ি পিটছে, নিশ্বাস রুদ্ধ, গুড়ি মেরে বোনদের ঘরের পাশ দিয়ে শেষটায় এসে পড়ল বৈঠকখানায়। সিধে দরজার দিকে এগুল... সাবধানে চাবি ঘোরাল একবার, দুবার... শব্দ হল আতঙ্কজনক... মুহূর্তের জন্য কাঠ হয়ে রইল, তার পরেই ছুটল বাগানের দিকে, একদমে সিঁড়ির ধাপগুলো লাফিয়ে দ্বিতীয় উঁচু তাকে গিয়ে বাগানের পথ ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে পৌঁছল লুকোবার জায়গায়, পোঁটলা রেখে তার উপর আঙুরপাতা চাপা দিয়ে দ্রুত বাড়ির পথ ধরল।

নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরে বিছানায় ঢুকল হামাগুড়ি দিয়ে, পা থেকে মাথা অবধি কাঁপছে থর থর করে। একই সঙ্গে এল উদ্দাম আনন্দ আর মৃত্যুর শঙ্কা। কী হবে যদি সে ধরা পড়ে আর যা করেছে তার জন্য বাবা তাকে কয়েদশালায় পাঠাবার হুকুম দেন?

## ৬

পরের দিন দেরীতে ঘুম ভাঙল তার, দেখল নার্স দাঁড়িয়ে আছে বিছানার কাছে। গত রাতের ঘটনার কথা মনে পড়ল, চাইল আগাফিয়ার দিকে। ঠিকই দেখাচ্ছে ওকে, সেই স্বাভাবিক হাসিখুশি, করুণাময়ী। মনে হচ্ছে না কিছু সন্দেহ করেছে। অবশ্য গায়ে চাপিয়েছে আর একটা শাল।

'দোহাই ঈশ্বর, কী ঘুমই ঘুমোচ্ছ আজ... উঠে পড়ো... আটটা বেজে গেছে...'

ভাসিয়া গড়িয়ে নাবল বিছানা থেকে, চটপট পোষাক পরল আর এই প্রথম নার্সকে দিল ঠিকভাবে চুল আঁচড়াতে।

'আমার শালটা দেখেছ, ভাসিয়া? সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি — ওটা যেন হাওয়া হয়ে গেছে!' ভাসিয়ার বিছানা দেখতে দেখতে দুশ্চিন্তা নিয়ে বলল সে।

'না, নানি। আমি ত দেখিনি।'

'অবাক কাণ্ড,' বিড় বিড় করে বলল আগাফিয়া।

'কিছু ভেবো না, নানি। আমি তোমাকে একটা নতুন কিনে দেব।'

'সে কথা নয়... শালটার জন্য মাথা ব্যথা নেই। গেল কোথায় সেইটে শুধু মাথায় আসছে না।'

ভাসিয়া তৈরী হলে নার্স বলল:

'আজ তোমার বাবার মেজাজ খারাপ।'

'কেন?'

'একটা গোলমাল হয়েছে, ভাসিয়া।'

'গোলমাল? কী গোলমাল, নানি?'

'আজ সকালে আমাদের বাগান থেকে একটা কয়েদী পালিয়েছে।'

আনন্দে নেচে উঠল ভাসিয়ার বুকটা, কিন্তু আবেগটাকে চাপবার চেষ্টা করে কিছু হয়নি এমনি ভাব দেখিয়ে বলল:

'সত্যি পালিয়েছে? কী করে পালাল?'

'সেইটেই ত অবাকের ব্যাপার। ওরা শুধু দেখতে পাচ্ছে লোকটা নেই... কয়েদীর পোষাক ফেলে চলে গেছে... সবাই অবাক হচ্ছে, ও অন্য পোষাক পেল কোত্থেকে... ন্যাংটো হয়ে ত আর পালাতে পারে না... এ নিয়ে একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে। পাহারা অফিসার সবাইকে জিজ্ঞেসবাদ করছে... তোমার বাবাকেও খবরটা দেওয়া হয়েছে... উনি যা চটেছেন! ভেবে দেখো—একটা কয়েদী পালিয়েছে গবর্ণরের নিজ বাগান থেকে!'

সকাল বেলার কর্তব্য শেষ করতে ভাসিয়া গেল বাবার পড়ার ঘরে — ভাবটা জীবন্ত নয়, মরার মত। সত্যিই এডমিরাল ক্ষেপে আছে, ছেলের 'গুড মর্নিং, পাপা'র উত্তরে অন্যমনস্কভাবে একটু মাথা নাড়ল। ভাসিয়া চলে এসে মহা স্বস্তি পেল। স্পষ্টই তার বাবা কিছু জানে না। একটু বাদেই ভাসিয়ার কানে এল বাবার ক্রুদ্ধ তর্জন, স্থানীয় পুলিশের কর্তা রিপোর্ট দিতে এসেছে—তারই উদ্দেশ্যে ঐ চিৎকার।

উদ্বেগে দিন কাটল ভাসিয়ার, কোন সময়ে না জানি বাবা ডেকে পাঠান আর কঠিন প্রশ্নে জর্জরিত করেন ওকে।

কিন্তু কেউ ওকে ঘাঁটাল না। ডিনারের সময় বাবাকে প্রায় খোশ মেজাজেই দেখা গেল, এমনকি তার দীর্ঘাঙ্গী, সুগঠনা বয়স্কা স্ত্রীর সঙ্গে সে মন খুলে কথা বলতে লাগল। মহিলার ভিতর এখনও আগেকার সৌন্দর্যের রেশ আছে।

'আজ সকালে কী কাণ্ড হয়েছে, শুনেছ? আমাদের বাগান থেকে একটা কয়েদী পালিয়েছে, কুত্তার দল!'

'কিন্তু কী করে?'

'আর সব কয়েদীরা বলছে ও যখন জাহাজ ছাড়ে ওর সঙ্গে ছিল একটা পুঁটলি... ওতে নিশ্চয়ই পোষাক ছিল... তাই বদলে পালিয়ে গেছে... কম্যানডাণ্ট ওদের বড় বেশী আসকারা দিয়েছে... আমি এর ভেতরই ওকে আমার মতামত শুনিয়ে দিয়েছি... পাহারাদারগুলোও ঢিলে। কিন্তু ভাবতে হবে না, বেশী দূর যেতে হবে না বাছাধনকে। আজকালের ভেতরেই ওকে পাকড়াও করবে... চারদিক থেকে প্রহার পড়লেই পালাবার সখ আর থাকবে না!'

যাই হোক, বেশ কিছুদিন বাদে মা যখন জিজ্ঞেস করল কয়েদীটা ধরা পড়েছে কী না, এডমিরাল গজরে উঠল:

'না, শয়তানটা যেন বাতাসে উবে গেছে! পোষাক যে কোত্থেকে পেল তার কোন হদিসই ওরা করতে পারছে না।'

হপ্তাখানেক বাদে, সব ভয় কেটে যেতে ভাসিয়া যখন সকালবেলা বাগানে হাজির হল সেই কালো, লোমশ পুরু ভ্রূওয়ালা বয়স্ক কয়েদীটি রহস্যজনকভাবে ইঙ্গিতে ডাকল ওকে। লোকটা গাছ থেকে মরা ডাল ছাঁটছিল। কাছে আসতেই কেউ দেখছে না এমনি সময় ওর হাতে একটা শস্তা ধরনের ছোট্ট ক্রুশ দিয়ে বলল:

'মাক্সিম বলে গেছে এটা আপনাকে দেবার জন্য, খোকাবাবু।'

করুণা-ভরা চোখে ভাসিয়ার দিকে তাকিয়ে কোমল গলায় যোগ করল:

'আপনার দয়ার জন্য ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন!'

# জলে-পড়া লোক

## ১

গ্রীষ্মমণ্ডলের দিনের গরম কমে আসতে শুরু করেছে। সূর্য ধীরে ধীরে হেলে পড়ছে দিকচক্রবালের দিকে।

মৃদু আয়ন বাতাসে, সব পাল মেলে দিয়ে জাহাজটি আটলাণ্টিক মহাসাগরে পাড়ি জমিয়েছে প্রায় সাত সমুদ্র মাইল বেগে। সমুদ্র নিরালা, একটা জাহাজ বা এতটুকু ধোঁয়া নেই। যে দিকেই চোখ পড়ে একই সীমাহীন জল-ভরা সমতল, সামান্য আন্দোলন আর এক ধরনের রহস্যময় গুরু গুরু ধ্বনি। প্রতিটি দিগন্ত মেঘহীন আকাশের স্বচ্ছ নীলের দ্বারা সীমিত। নির্মল কোমল বাতাস — সমুদ্রের স্বাস্থ্যকর স্বাদে ভরা।

চারদিক খাঁ খাঁ করছে।

মাঝে মাঝে এক একটা উড়ুক্কু মাছ শূন্যে লাফ মারছে, রোদে উজ্জ্বল আঁশ সোনার মত চিকমিক করে উঠছে। একটা সাদা আলবেট্রস চলেছে মাথার উপর দিয়ে উড়ে কিংবা একটা ছোট্ট সাগর পাখি সাঁ করে চলে যাচ্ছে সুদূর আফ্রিকার দিকে, হয়ত বা তিমি মাছের ভুস করে তোলা জলের শব্দ কানে এল। তারপর আর কিছুই নেই। সমুদ্র আর আকাশ, আকাশ আর সমুদ্র — উভয়েই প্রশান্ত, স্নেহময়, প্রসন্ন।

'গাইয়েদের গাইতে অনুমতি দেবেন, স্যার?' অফিসার অলসভাবে ব্রিজের উপর পায়চারি করছে — তারই কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল পাহারাদারদের পাতি অফিসার।

অফিসার মাথা নাড়ল আর কয়েক মিনিট বাদেই দেহাতী গানের বিষণ্ণ একটানা সুরে ভরে উঠল সমুদ্রের বুক।

সারা দিনের ঝলসান গরমের পর, সন্ধ্যার ঠাণ্ডা বাতাসে স্বস্তি পেয়ে নাবিকরা গান শোনার জন্য জড় হল অগ্রমাস্তুলের পুরোবর্তী ডেকে। সঙ্গীত প্রেমিকরা, বিশেষ করে যাদের বয়স হয়েছে, গায়কদের পাশ ঘেঁষে গোল হয়ে বসল। সাগ্রহে, গম্ভীর হয়ে শুনতে লাগল গান। ওদের অনেকেরই রোদে পোড়া জলবায়ু তাড়িত মুখ নিঃশব্দ আনন্দে উদ্ভাসিত।

অগ্রমাস্তুলের পুরোবর্তী ডেকের নাবিক লাভ্রেন্তিচ একজন 'নির্ভরযোগ্য বৃদ্ধ' — সামনের দিকে ঝুঁকে বসেছে সে। চওড়া কাঁধ, সামনে-ঝোঁকা, সামান্য বাঁকা শক্ত পা — গ্রন্থিল, আলকাতরা-মাখা হাত — একটিতে একটা আঙুল নেই। বহু বছর আগে উঁচু পালের দড়িতে কাটা পড়েছে। লোকটা পাঁড় মাতাল। ক্ষতবিক্ষত মুখ, অচেতন অবস্থায় পার থেকে ওকে টেনে আনা হয়: বিদেশী নাবিকদের সঙ্গে ঝগড়া করার অভ্যেস ছিল ওর, কারণ 'তারা ঠিকভাবে মদ খায় না, কেবল লোক দেখায়,' রামের সঙ্গে মেশায় জল অথচ এই লাভ্রেন্তিচ এক ঢোকে মেরে দেয় সবটা। কিন্তু সেও গান শুনে একটা শ্রান্তির ভেতরে ডুবে যাচ্ছে। তার ভাঁজ-পড়া মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ, বেগুনী রঙের কুলের মত নাক, স্বাভাবিক রুষ্ট প্রকৃতি দেখে মনে হয় সে বিরক্ত এবং একগাদা শাপশাপান্ত সুরু

করবে — এখন তাকে মনে হচ্ছে অসাধারণ শান্ত, নির্বাক আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তিতে সে মুখ কোমল।

কেউ কেউ ধীরে ধীরে গানে যোগ দিল আর বাকিরা ডেকের চারপাশে দলে দলে বসে মৃদু স্বরে কথা বলতে লাগল আর মাঝে মাঝে হেসে বা বাহবা দিয়ে ওদের তারিফ জানাল।

সত্যই আমাদের এই গায়কদলটি গান জানে, গাইতে পারে চমৎকার! কণ্ঠ তরুণ, পরিষ্কার ও সতেজ, গানগুলিও খুব ভালভাবে মহড়া দেওয়া। নাবিকরা বিশেষ করে শুতিকভের সুন্দর, কোমল কণ্ঠে মোহিত। আকর্ষণ, আন্তরিকতা ও প্রকাশের যে আবেগ, তার গুণে গায়কদলের মধ্যে ওর স্বর অনন্য মনে হত।

'ব্যাটা আমাদের মর্মমূল ধরে টান মারে!' ওর সম্পর্কে নাবিকদের মন্তব্য।

গানের পর গান চলত আর নাবিকরা গ্রীষ্মমণ্ডলের আলোক আর উত্তাপের মাঝখানে বসে ভাবত সেই সুদূর জন্মভূমি রাশিয়ার কথা যে ছেয়ে আছে বরফ আর শৈত্যে, মাঠ, বন আর কুটিরে, যার দুঃখ দারিদ্র্যে মন ওদের ভরে আছে।

'একটা নাচের সুর হোক, ছেলেরা!'

গাইয়েরা একটা ফুর্তি-ভরা নাচের গান ধরল। এবার শুতিকভের গলা এমন কেঁপে উঠল, এমনই আনন্দ আর আশ্বাসে ভরা সেই সুর যে লোকগুলোর মুখে ফুটে উঠল হাসি, সবচাইতে গোমড়া স্বভাবের লোকগুলোও ঘাড় নাড়তে আর পা ঠুকতে সুরু করল।

মাকার্কা নামে একজন বেঁটেখাট চটপটে নাবিক তার পাতলা শরীরটার ভেতর একটা নাচের সুরসুরি টের পাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত উদ্দাম নাচের সুরে নিজেকে আর সামলে রাখতে না পেরে দর্শকদের আনন্দ দিয়ে একটা ফুর্তিবাজ ত্রেপাক সুরু করে দিল।

শেষ পর্যন্ত নাচ আর গান বন্ধ হল। দোহারা চেহারা, সুগঠন, দেখতে কালো শুতিকভ যখন শ্রোতাদের মাঝখান থেকে উঠে গেল জলের টবের কাছে তামাক খেতে, সবাই এক সঙ্গে ওকে বাহবা দিতে লাগল।

'গান করিস দারুণ ভাল, শয়তান তোকে ভর করুক!' মাথা নেড়ে বলল লাভ্রেন্তিচ বুড়ো আর সেই সঙ্গে মন্তব্যটাকে জোরদার করার জন্য এমন দুচারটে কথা বলল যা ছাপার অযোগ্য।

'এখন যদি ওকে শিক্ষা পেতে আর ধর স্বরজ্ঞান লাভ করতে হয় তাহলে যেতে হবে অপেরাতে,' ছোকরা কেরানী, সৈনিকের ছেলে পুগভকিন মন্তব্য করল। ভদ্রতা আর সাধু ভাষার পরিচয় দেওয়া তার অভ্যাস।

লাভ্রেন্তিচ কলমবাজদের ঘেন্না করত। তার মতে ওরা জাহাজের ক্ষেত্রে একদম অকেজো এবং কর্তব্যের খাতিরে সুযোগ পেলেই ওদের দুকথা শোনান উচিত বলে ভাবত। গোলগাল, ধবধবে চুল, সুদর্শন কেরানীটির দিকে সক্রোধে তাকিয়ে বলল:

'অপেরা না হাতি!.. আলসেমি করে তোর পেট মোটা —ঐ হল তোর অপেরা!..'

নাবিকরা খিক খিক করে হাসতে লাগল।

'অপেরা কাকে বলে তোমরা তার কী জানো?' একটু লজ্জা পেয়ে ছোকরা কেরানী বলে উঠল। 'যত সব গণ্ডমূর্খ!' গলা নাবিয়ে কথাটা বলেই সেখান থেকে প্রস্থান করল সে।

'এই বিদ্যের জাহাজটিকে কেমন লাগে!' পুগভ্কিনকে চলে যেতে দেখে লাভ্রেন্তিচ কটাক্ষ করে অভ্যেসমত চটপট কয়েকটা গালাগালি ঝাড়ল— গলায় কিন্তু রস নেই।

'যা বলছিলাম,' একটু চুপ করে থেকে শুতিকভ্কে বলল, 'অসম্ভব ভালো গাস, এগোর্কা।'

'আলবৎ ভাল গায়। বেড়ে ছেলে আমাদের এগোর্কা!' বলল নাবিকদের আর একজন।

প্রশংসার জবাবে শুতিকভ্ শুধু হাসল, প্রকাশ পেল তার সাদা, সমান দাঁতগুলো পুরু ও প্রসন্ন ঠোঁট দুটির মাঝখান থেকে।

শিশুর মত উজ্জ্বল ও স্মিত সেই হাসি তার তরুণ, সতেজ ও রোদ-পোড়া মুখখানাকে উদ্ভাসিত করল। বড় কালো চোখ দুটি কুকুরছানার মত শান্ত ও

স্নেহময়—সুন্দর, সুঠাম গঠনের ভেতর কৃশ ও কোমল এক ধরনের চাষীসুলভ অপ্রতিভতা। গোড়া থেকে এসব জিনিষে সবাই ওর প্রতি আকৃষ্ট—যেমন আকৃষ্ট ওর আশ্চর্য গলার স্বরে। জাহাজে সবাই ওকে অত্যন্ত পছন্দ করে। সবাই ভালবাসে ওকে আর মনে হয় সেও সবাইকে ভালবাসে।

ও হল সেই বিরল, সুখী ও প্রাণবন্ত মানুষদেরই একজন—যাকে দেখলেই অন্য লোক খুশি ও হালকা বোধ করে। এ ধরনের লোক স্বভাবজ আশাবাদী দার্শনিক। জাহাজে তার দিলদরিয়া হাসি প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। সে যদি কোন গপ্প শুরু করে তাহলে সে গপ্প নিয়ে নিজেই প্রথমে হাসবে—আর সেই হাসি ছড়িয়ে দেবে অপরের ভেতর—গপ্পটা বিশেষভাবে আমোদজনক নাও হতে পারে। ধাতু ফলক সাফ করে, জাহাজের নৌকো থেকে রঙ ঘষে তুলে, বাতাস থেকে মাস্তুলের পেছনে আশ্রয় নিয়ে নিজের মনে গুন গুন করে সুর ভেঁজে রাতের পাহারায় সময় কাটাত সে। সব সময়ে তার প্রশান্ত হাসি চারপাশের সবাইকে চাঙ্গা করে তুলত। অপর সবাই যখন ভয়ে ঘাবড়ে যেত তখনও কিন্তু তার ফুর্তির ভাবটি বজায় থাকত। এই সব মুহূর্তে ওর উপস্থিতি ছিল অমূল্য।

আমার একটা ঝড়ের কথা মনে আছে। প্রচণ্ড বাতাস বইছে, চারদিকে চলেছে ঝড়ের তাণ্ডব, জাহাজটা ঝড়োপালে একটুকরো কাঠের মত সমুদ্রের বুকে উথাল-পাথাল করছে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে উত্তাল তরঙ্গ বুঝি আমাদের গিলে খাবে। জাহাজের আগাগোড়া সবটাই কাঁপছে, উঠছে করুণ আর্তধ্বনি, পালের দড়াদড়ির ভিতর গর্জমান বাতাসের সঙ্গে তার অভিযোগ মিশে যাচ্ছে। যারা বহু ঝড়ঝাপ্টার ভেতর দিয়ে এসেছে সেই সব ঝানু নাবিকদের মুখেও উদ্বেগের ছাপ—স্তব্ধ, স্থিরদৃষ্টিতে তারা চাইল ব্রিজের ওপর। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে রেইনক্লোক-পরা ক্যাপ্টেন — অচল অটল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গর্জমান ঝড়ের দিকে।

এমন সময়েও কিন্তু শুতিকভ তার পা ঠিক রাখার জন্য এক হাতে পালের দড়ি ধরে মাস্তুলের চারপাশে ভয়-পাওয়া একদল তরুণ নাবিককে এমন সব জিনিষ বলে আনন্দ দিত যার সঙ্গে ঝড়ের কোন সম্পর্কই নেই। যখন তার মুখের ওপর এসে পড়ছে জলের ঝাপ্টা, একটা কৌতুককর গেঁয়ো ঘটনাকে এমন ধীর স্থির ও

বাস্তবভাবে 'জমিয়ে তুলে' সোল্লাসে হাসতে শুরু করত যে, তার ঐ প্রশান্ত ভাবটি অলক্ষ্যে তরুণ নাবিকদের ভেতর ঢুকে তাদের ভয়কে দিত দূর করে।

'কোন নরক থেকে এরকম গান শিখলি রে?' ছোট্ট পাইপটায় ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে লাভ্রেন্‌তিচ জিজ্ঞেস করল। 'কন্সেনকিনে' আমাদের এক সঙ্গী ছিল, সে ব্যাটাও বেশ ভাল গাইত। কিন্তু এ কথা একশবার বলব সে তোর ধারেকাছেও আসতে পারে না...'

'আমি যখন রাখালী করতাম গান শিখি সে সময়। গরুগুলো চরতে চরতে বনের ভেতর এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ত আর একটা বার্চ গাছের নীচে শুয়ে গান গাইতাম আমি... গ্রামের লোকরা আমার নাম দিয়েছিল "গাইয়ে রাখাল,"' হেসে বলল সে।

অন্যান্য নাবিকরাও ওর সঙ্গে হাসতে লাগল আর লাভ্রেন্‌তিচ ওর পিঠ চাপড়ে বিশেষ আদরের চিহ্ন হিসেবে মদ-খাওয়া ভাঙা গলায় যতটা সম্ভব কোমলভাবে গোটা কয়েক গালি ঝাড়ল।

## ২

ঠিক সে সময় আর সবাইকে ঠেলে সরিয়ে ইগ্‌নাতভ নামে এক বলিষ্ঠ-গড়ন মাঝ-বয়েসী নাবিক ওদের মাঝখানে তাড়াতাড়ি এসে হাজির হল।

দুঃখে উন্মাদ আর ফ্যাকাশে, ছোট করে চুল-ছাঁটা, টুপিহীন গোল মাথা, রাগ ও উদ্বেগে ভরা কাঁপা গলায় জানাল, কে যেন তার টাকা চুরি করেছে।

'কুড়ি ফ্রাঙ্ক, ভাইসব! কুড়ি ফ্রাঙ্ক!' বার বার টাকার অঙ্কটার উপর জোর দিয়ে করুণভাবে বলল সে।

খবরটায় সবাই স্তম্ভিত। জাহাজে এরকম ঘটনা বিরল।

যাদের বয়স কিছুটা বেশী তারা ভ্রূ কোঁচকাল। ইগ্‌নাতভ ওদের ফুর্তির মেজাজটাকে নষ্ট করে দেওয়ায় ছোকরা নাবিকরা বিরক্ত হল, সহানুভূতি নয়—শঙ্কিত কৌতূহল নিয়ে ওরা শুনতে লাগল হাঁপাতে হাঁপাতে ও পাগলের মত হাত নাড়তে নাড়তে ইগ্‌নাতভের দ্রুত বলা চুরির বিশদ বর্ণনা। সে জানাল সেদিনই

ডিনারের পর যখন নাবিকরা বিশ্রাম নিচ্ছিল সে তার বাক্সটি দেখেছে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তখন সবকিছুই ছিল যথাস্থানে। কিন্তু এই মাত্র জুতোর চামড়া আনতে নীচে গিয়ে দেখতে পেল বাক্সের তালাটা ভাঙা ... টাকা উধাও ...

'এ কী কান্ড! জাহাজী ভাইয়ের টাকা চুরি?' সবার উপর চোখ বুলিয়ে কথাটা শেষ করল সে।

তার মসৃণ, মাংসল, পরিষ্কার কামান, ছুলিওলা মুখ, ক্ষুদে গোল চোখ আর বাজপাখির মতো বাঁকা নাক — যে মুখের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হল আত্ম-সংযম ও আত্ম-তুষ্টি এবং নিজের দাম-জানা চালাক মানুষের প্রশান্ত ভাব, সেই মুখ এখন কৃপণের জমা-করা ধন-হারান হতাশায় বিকৃত। তার নীচের চোয়ালটা কাঁপতে লাগল আর গোল চোখ দুটো বিভ্রান্তভাবে ঘুরতে সুরু করল সবার মুখের উপর। স্পষ্টই চুরির ফলে মেজাজ ওর দুষ্ট হয়ে উঠেছে, প্রকাশ পাচ্ছে তার নীচ, কৃপণ স্বভাব।

এতে অবাক হবার কিছু নেই, কারণ আসলে লোকটা লোভী ও কিপ্টে যদিও শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে কয়েকজন ওকে পুরো নাম ধরেই ডাকত। তার বৌ ব্যবসায়ী, দুটো সন্তানশুদ্ধ ওকে ক্রনস্টাড্টে রেখে ও যে স্বেচ্ছায় বিদেশে এসেছে জাহাজের কাজে এর একমাত্র উদ্দেশ্য — কাজ থেকে অবসর নিয়ে ছোটখাট ব্যবসা চালাবার মত যথেষ্ট টাকা রোজগার করা। মহা সংযম নিয়ে জীবন চালায় সে, মদ খায় না বা পারে গিয়ে টাকা খরচা করে না। একটি একটি করে সে পয়সা জমায়, জানে কোথায় লাভের সঙ্গে সোনা রুপোর ব্যবসা চলে — কখনো সখনো বিশ্বাসী জাহাজীদের গোপনে সুদ নিয়ে অল্প স্বল্প টাকাও ধার দেয়। লোকটা ধূর্ত, টাকা বানাবার জন্য রাশিয়ায় বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসে সিগার আর প্রাচ্য দেশের বিভিন্ন জিনিষ। আগেও সে এ কাজ করত, গ্রীষ্মে ফিনল্যান্ড উপসাগর দিয়ে যাবার সময় রেভেলে নোনা মাছ আর গেলসিংফর্সে সিগার খরিদ করে পরে সেগুলোকে লাভে বিক্রি করত ক্রনস্টাড্টে।

ইগ্নাতভ কর্ণধারের কাজে পটু, বাকি নাবিকদের সঙ্গে সৎভাবে থাকার চেষ্টা করে, ভাঁড়ারী আর মেটের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব, লেখাপড়া জানে, নাবিক হলেও

তার কাছে যে অনেক টাকা আছে এটা বন্ধুদের কাছ থেকে গোপন রাখার জন্য সতর্ক।

'এ হল ঐ শয়তান প্রোশ্‌কার কাজ। এতে আমার কোন সন্দেহ নেই!' রাগে টগবগ করতে করতে বলতে লাগল সে। 'যখন আমি বাক্সের কাছে যাই তখন ও ডেকে আমার চারপাশে ঘুর ঘুর করছিল... ওকে এখন কী করা যায়, বলো তোমরা?' যেন সাহায্যের আশায় বিশেষ করে বয়স্ক লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে সে বলল। 'এই ভাবেই কী আমার উপর ডাকাতি চলবে?.. এ আমার অনেক কষ্টের টাকা... তোমরা জান নাবিকের টাকা কী জিনিষ... এক পয়সা এক পয়সা করে একে আমি জমিয়েছি এমনকি আমার ভদকা রেশনের টাকা দিয়েও মদ খাই না,' নরম, করুণ সুরে বলল সে।

নীচু ডেকের চারপাশে 'ঘুর ঘুর করছিল'—এছাড়া, ওর দোষ সম্পর্কে আর কোনও প্রমাণ না থাকলেও ইগ্‌নাতভ এবং আর সব নাবিকদের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না যে প্রোশ্‌কা জিতিনটাই হল আসল শয়তান, কারণ আগেও বহুবার বন্ধুদের জিনিষ হাতাবার জন্য ও ধরা পড়েছে। ওর পক্ষ নিয়ে কেউ একটি কথাও বলেনি, উল্টে বিরক্ত নাবিকরা ওকে সাংঘাতিক গালি দিয়েছে।

'নোংরা খচ্চর!.. নাবিকদের পেশার কলঙ্ক!..' লাভ্রেন্‌তিচ ভয়ঙ্কর চটে উঠল।

'ঠিক কথা, আমাদের জাহাজে এই এক বদমাস আছে...'

'এই নোংরা অপদার্থটাকে এমন শিক্ষা দেওয়া দরকার যাতে জীবনে না ভোলে!'

'আচ্ছা ভাইসব, ওকে নিয়ে কী করব আমরা?..' জিজ্ঞেস করল ইগ্‌নাতভ। 'নিজ থেকে টাকা ফিরিয়ে না দিলে, ওর নামে বড় অফিসারের কাছে রিপোর্ট করব। তা হলে একটা যথার্থ তদন্ত হবে।'

প্রস্তাবটা ইগ্‌নাতভের কাছে ভাল মনে হলেও, আর সব নাবিকরা সমর্থন করল না। এদের ছিল নিজস্ব অলিখিত নিয়ম, প্রাচীন কালের পুরোহিতদের মত বয়স্ক নাবিকরাই ছিল এর কঠোর অভিভাবক।

লাভ্রেন্তিচই সব প্রথমে তার কড়া অমত জানাল।

'তুমি বলছ কর্তৃপক্ষের কাছে খবরটা দেবে,' ঘেন্নার সঙ্গে বলল সে, 'নালিশ জানাতে চাও, তাই না?.. এতখানি মাথা খারাপ হয়েছে যে আমাদের নিয়মই যেন ভুলে যাচ্ছ... ওঃ... কী লোক হে তুমি!' নিজস্ব একটি প্রিয় বচন ঝেড়ে মনের ভাবকে হাল্কা করল সে। 'কী করে নাবিক হয়ে এরকম একটা প্রস্তাব করলে তুমি?' ইগ্নাতভের দিকে রূক্ষ দৃষ্টি হেনে বলল সে।

'তাহলে তোমার প্রস্তাব কী?'

'আগে যা করা হয়েছে, তাই করতে বলি। কুত্তাটাকে উত্তমমধ্যম লাগিয়ে টাকা ফেরত নাও। এই ভাবেই আমরা কাজের ফয়সালা করি।'

'আগেও ত অনেক প্রহার খেয়েছে ও। তার পরেও যদি টাকা না দেয় ত কী হবে?.. কেন আমার টাকা খোয়াতে যাব? চোরের যা উপযুক্ত শাস্তি তাই পাক সে—এই আমার বক্তব্য। ওই শূয়ারকে কোন দয়াই দেখান উচিত না।'

'তুমি বড় বেশী টাকা চিনেছ, তাই না ইগ্নাতভ? যদি বলি প্রোশ্কা সব টাকাটা নেয়নি... কিছু আছে বাক্সে, তবে?' বিদ্রূপ করে বলল লাভ্রেন্তিচ।

'তুমি গুণে দেখেছ নাকি!'

'উঁহু, আমি দেখিনি, কিন্তু সঙ্গীর নামে নালিশ জানান আমাদের রীতি নয়', কর্তৃত্বের সঙ্গে বলল লাভ্রেন্তিচ, 'তাই না, ছেলেরা?'

ইগ্নাতভের অস্বস্তি সত্ত্বেও 'ছেলেরা' স্বীকার করল 'এটা তাদের রীতি নয়'।

'আচ্ছা এবার গিয়ে প্রোশ্কাকে আমাদের সামনে এনে জিজ্ঞেসবাদ করো,' বলল লাভ্রেন্তিচ।

ক্রুদ্ধ ও হতাশ হওয়া সত্ত্বেও ইগ্নাতভকে সঙ্গীদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হল। প্রোশ্কাকে আনতে চলে গেল সে।

ইতিমধ্যে নাবিকরা আরও ঘন হয়ে বসল।

## ৩

জাহাজের সঙ্গীরা অবজ্ঞাভরে ওকে ডাকে 'প্রোশ্‌কা' বলে। প্রোখর জিতিন সবচেয়ে খারাপ নাবিক। প্রাক্তন জমিদারের ক্রীতদাস, পয়লা নম্বরের ভীরু (একমাত্র চাবুকের ভয় দেখিয়ে মাস্তুলে চড়ান যায় — সেখানে বড়ই ভয় ওর), কুঁড়ে আর আলসে, ফাঁকিবাজ আর ছিঁচকে চোর। জাহাজ চলার সুরু থেকেই ও ছিল একঘরে লোকের মত, সবাই গালমন্দ করে। সারেঙ্গ আর পাতি অফিসার সবাই ওকে শাপান্ত করে, কারণ থাক চাই নাই থাক ওকে ধরে পেটায় আর 'নোংরা শয়তান' বলে গাল পাড়ে। কখনো ও এর প্রতিবাদ করে না, সবকিছুকে বোবা জানোয়ারের মত অভ্যস্ত উদাসীন নতির সঙ্গে সহ্য করে।

দু'একটা ছিঁচকে চুরি ধরার পর প্রায় সবাই ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। যে কেউ ওকে ঘেন্না জানাতে পারে, ইচ্ছে করলে নির্ভয়ে ওকে গালিগালাজ, মারপিট, হুকুম করতে বোকা বানাতে পারে, যেন ওর সঙ্গে অন্য কোন আচরণ কল্পনাও করা চলে না। প্রোশ্‌কাও এই জীবনে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে সে এছাড়া আর কোন ব্যবহারই আশা করত না। এবং মনে হত, এই দুঃখার্ত জীবনে তেমন কিছু কষ্ট সে পেত না। প্রচুর ভোজনে আর একটা শূকরছানাকে নানা রকমের খেলা শেখানতে ছিল তার আনন্দ। পারে গিয়ে প্রচুর মদ গেলা আর মেয়েদের প্রেম নিবেদনে পেত বাড়তি সান্ত্বনা। মেয়েদের সে বড়ই ভালবাসে। ওদের পিছনে সব পয়সা ঢেলে দেয় আর এরই জন্য বন্ধুদের পয়সা চুরি করে, যদিও জানে ধরা পড়লে কী কঠোর শাস্তিই না ওকে পেতে হবে। ও হচ্ছে নীচু ডেকের স্থায়ী নাবিক, যে কাজে কোন বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন নেই একমাত্র সে ধরনের কাজেই লাগান হয় ওকে। কিন্তু এই সামান্য কাজ করতে গিয়েও সে প্রহার খায়, কারণ অন্য লোকের সঙ্গে জোর দিয়ে সে দড়ি টানে না, গাড়ি-টানা আলসে ঘোড়ার মত দড়ি টানার ভান করে মাত্র।

'ওরে, আলসে শুয়োর!' কোয়ার্টার ডেকের পাতি অফিসার চেঁচিয়ে ওঠে, ওর 'মুখ ঘষে দেবে' বলে শপথ জানায়।

সত্যি সত্যি ওর মুখ ঘষে ছাড়ে সে!

## ৪

লম্বা নৌকোটার ভেতর আরাম করে শুয়ে প্রোশ্‌কা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, ঠোঁটের উপর একটা অর্থহীন হাসি। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড লাথি খেয়ে ওর ঘুম ভাঙল। এগিয়ে-আসা পা দুটো থেকে গুঁড়ি মেরে সরে যাবার চেষ্টা করতেই পড়ল দ্বিতীয় লাথি, ওকে সমঝে দিল একটা কিছুর জন্য ওর ডাক পড়েছে এবং ওকে ঐ আরামপ্রদ জায়গাটি ছাড়তেই হবে। নৌকোর ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল সে, হতভম্ব ও বোকা ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ইগ্‌নাতভের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে। মনে করল বুঝি আরো মার খেতে হবে।

'চলে আয়,' প্রোশ্‌কাকে সেই মুহূর্তেই পিটোবার তীব্র ইচ্ছা নিয়ে হুকুম করল ইগ্‌নাতভ।

অপরাধী কুকুরের মত প্রোশ্‌কা চলল ওর পেছন পেছন, পাতি হাঁসের মত অলসভাবে পা ফেলে একটু হেলেদুলে।

বছর তিরিশেক বয়স, মাংস থল থল, কুৎসিত, বিশ্রী গড়ন—বাঁকা পাদুটোর উপর দরজিদের মত বেমানান ধড়। নৌ বহরে যোগ দেবার আগে জমিদার বাড়িতে দরজির কাজই করত সে। ফোলা, মাটি-রঙা মুখে চওড়া ও চ্যাপ্টা নাক, লম্বা কান দুটো উঁকি মারছে টুপির নীচে, মুখটা কুৎসিত ও জীর্ণ। পাতলা ও সাদাটে ভুরুর তলা থেকে ক্ষুদে নিষ্প্রভ ও ধূসর চোখ দুটো পিট পিট করছে, হতভাগা মানুষের মত চাউনীর ভিতর নম্র আত্মসমর্পণের ভাব, যদিও তারই সঙ্গে মিশে আছে একটা ধূর্তামীর আভা। ঐ কুৎসিত চেহারাটার ভেতর এতটুকুও নাবিকের ভাব নেই, পোষাক বস্তার মত ঢিলে আর অগোছাল। এক কথায় বলতে গেলে ভাল লাগবার মত কিছুই নেই ওর চেহারার মধ্যে।

ওরা দু'জন নাবিকদের কাছে আসতেই তাদের কথার গুনগুনানি বন্ধ হল, এগিয়ে এল ওদের পাশে ঘন হয়ে—সবার চোখ সন্দেহজনক চোরটার উপর।

প্রশ্ন শুরু করবার জন্য প্রোশ্‌কার মুখে যত জোরে সম্ভব একটা ঘুষি চাপাল ইগ্‌নাতভ।

ঘুষিটা আচমকা, প্রোশ্‌কা একটু টলে গেল, কিন্তু নিজেকে বাঁচাবার কোন চেষ্টা করল না। মুখটা আরও বেশী বোকার মত ও ভয়-পাওয়া দেখাল।

'ঘুষি চালাবার আগে ব্যাপারটার ফয়সালা করো!' লাভ্রেন্‌তিচ গোঁ গোঁ করে উঠল।

'এ হল শুয়োরটার যৎকিঞ্চিৎ মাত্র!' বলল ইগ্‌নাতভ। প্রোশ্‌কার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কি আমার বাক্স থেকে সোনা চুরি করেছিস বল ইতর? ভাল চাস তো এখুনি স্বীকার কর!'

এই কথায় প্রোশ্‌কার হতভম্ব বোকা মুখটার উপর একটা বুদ্ধির ভাব ফুটে উঠল—মনে হল সে যেন অভিযোগের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। তার চারপাশের কড়া গম্ভীর মুখগুলোর দিকে ভীরুর মত তাকিয়ে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে মুষড়ে গেল সে—একটা বোবা আতঙ্ক চেহারাটাকে দিল বিকৃত করে।

এই হঠাৎ পরিবর্তনে আর সব নাবিকদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, টাকাটা ওইই চুরি করেছে।

প্রোশ্‌কা চুপ করে রইল, চোখ নীচু।

'কোথায় টাকা? বার কর্‌ শীগ্‌গির! কোথায় রেখেছিস লুকিয়ে?' ইগ্‌নাতভ জিজ্ঞেস করতে থাকল।

'আমি তোমার টাকা নিইনি,' প্রোশ্‌কা জবাব দিল নীচু গলায়।

ইগ্‌নাতভ জ্বলে উঠল।

'শোন্‌ বলছি...' সে বলল, 'যদি টাকা না ফিরিয়ে দিস্‌, পিটিয়ে মেরে ফেলব তোকে!..' সে এত হিংস্র ও গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলল যে প্রোশ্‌কা এক পা পিছিয়ে গেল।

চারদিকে উঠল ক্রুদ্ধ গর্জন।

'এখুনি স্বীকার কর, শুয়োর!'

'চালাকি করবার চেষ্টা করিসনে!'

'টাকাটা ফিরিয়ে দে। ভাল হবে তোর!'

প্রোশ্‌কা বুঝল সবাই ওর বিরুদ্ধে। মাথা তুলে টুপি খুলে তৃণখণ্ড আঁকড়ে-ধরা হতাশ মানুষের মত চারপাশের নাবিকদের দিকে চেয়ে বলে উঠল:

'ভাইসব! ঈশ্বরকে সামনে রেখে শপথ করছি! মিথ্যে বললে এখুনি যেন শেষ হয়ে যাই! আমাকে যা খুশি তাই করতে পারো কিন্তু আমি ওর টাকা নিইনি!'

কোন কোন নাবিকের মনে কথাটা দাগ কাটল, কিন্তু ইগ্‌নাতভ এই ভাবটাকে ওদের মনের গভীরে ঢুকতে না দিয়ে চট করে বলে উঠল:

'তুই একটা জঘন্য মিথ্যুক... ঈশ্বরকে আর এর মধ্যে টানিসনে! কুজ্‌মিনের টাকা চুরি করে তুই মিথ্যে বলিসনি? আর যখন লেওন্‌তিয়েভের সার্ট হাতিয়েছিলি? তোর শপথ থুথুর সমান বেহায়া শয়তান ...'

প্রোশ্‌কা আবার চোখ নাবাল।

'নে স্বীকার কর। বল কোথায় রেখেছিস টাকাটা। তুই কি ভাবছিস, তোকে আমি নীচের ডেকে ঘুর ঘুর করতে দেখিনি... সবাই যখন ঘুমোচ্ছিল, তুই ওখানে কী করছিলি, এ্যাঁ?'

'আমি স্রেফ হাঁটছিলাম...'

'হাঁটছিলি, বটে! সাবধান করে দিচ্ছি, প্রোশ্‌কা, আমার মাথায় খুন চাপাসনে। স্বীকার কর।'

কিন্তু প্রোশ্‌কা চুপ করে রইল।

অতঃপর বুঝি শেষ উপায় হিসেবে ইগ্‌নাতভ হঠাৎ তার কায়দা পাল্টাল। ভয় না দেখিয়ে, টাকা ফিরিয়ে দেবার জন্য প্রোশ্‌কার কাছে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল — গলাটা শান্ত, অপরকে প্রায় তুষ্ট করার মত।

'শোন, আমি তোর কোন ক্ষতি করব না। শুধু টাকাটা ফিরিয়ে দে... তুই ত এটা মদ খেয়ে উড়োবি—কিন্তু আমার যে বৌ ছেলেপুলে... ফিরিয়ে দে!' প্রায় অনুনয় করল সে।

'বিশ্বাস না হয়, তল্লাসী করো... আমি তোমার টাকা নিইনি!'

'নিসনি টাকা? নিসনি টাকা, শুয়ার?' বলে উঠল ইগ্নাতভ, মুখ রাগে ফ্যাকাশে। 'ফের বলছিস টাকা নিসনি?'

এই বলে সে বাজের মত প্রোশ্কার দিকে ছুটে গেল।

মুখ ওর ফ্যাকাশে, ভয়ে সঙ্কুচিত, সারা শরীর কাঁপছে, বৃষ্টির মত যে ঘুষি এসে পড়ছে তা থেকে চেষ্টা করছে মাথাটা বাঁচাতে।

নাবিকরা ভ্রূ কুঁচকে চুপচাপ এই কুৎসিত দৃশ্য দেখতে লাগল। আর ইগ্নাতভ প্রোশ্কাকে চুপ করে থাকতে দেখে উত্তেজিত হয়ে আরও জোরে ঘুষি চালাতে লাগল।

'যথেষ্ট হয়েছে... এবার ছেড়ে দাও...' হঠাৎ বলে উঠল শুতিকভ।

সেই কোমল, মৃদু কণ্ঠ অন্যান্য নাবিকদের মনে জাগাল মানবিক অনুভূতি।

অনেকেই রাগে চীৎকার দিয়ে উঠল: 'ছেড়ে দাও ওকে... যথেষ্ট হয়েছে!' 'মারবার আগে তল্লাসী করে দেখ।'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে ইগ্নাতভ এক পাশে সরে এল। প্রোশ্কা বেরিয়ে গেল বৃত্তের বাইরে। কয়েক মিনিট সবাই চুপচাপ।

'শুয়োরটা স্বীকার করবে না!' দম ফিরে আসতে বলল ইগ্নাতভ। 'তীরে পৌঁছন পর্যন্ত অপেক্ষা কর,' সে ভয় দেখিয়ে বলল। 'ও যদি তার আগে টাকা না দেয়, আমি জ্যান্ত ওর ছাল ছাড়িয়ে নেব—তোমরা দেখে নিও নিই কিনা।'

'কিন্তু হতে পারে যে ও টাকা নেয়নি!' শান্তভাবে বলল শুতিকভ।

অন্যান্য নাবিকদের কড়া গম্ভীর ও ভ্রূ কুঞ্চিত মুখের উপর একই ভাব ফুটে উঠল।

'ও নেয়নি?.. এ কাজ কি আগে ও করেনি?.. আলবৎ ও নিয়েছে ... আমরা সবাই জানি ও চোর, নিপাত যাক ও...' বলল ইগ্নাতভ।

দু'জন নাবিককে সঙ্গে নিয়ে প্রোশ্কার বাক্স তল্লাসীর জন্য চলে গেল সে।

'ভগবান, লোকটা টাকা কীই না ভালবাসে!' মাথা নেড়ে লাভ্রেন্তিচ গর গর করে উঠল। 'কিন্তু চুরি করা ঠিক নয়। এটা নাবিকদের পেশার কলঙ্ক!' হঠাৎ যোগ করে সে গালিগালাজ শুরু করল, এর একমাত্র উদ্দেশ্য—যে সন্দেহ তার মুখখানাতে স্পষ্ট লেখা আছে তাকে দূর করা।

'তাহলে তোমার মতে প্রোশ্‌কা টাকা চুরি করেনি?' একটু চুপ করে থেকে সে শুতিকভকে জিজ্ঞেস করল। 'কিন্তু আর কে হতে পারে?'

শুতিকভ জবাব দিল না। লাভ্রেন্‌তিচও আর পীড়াপীড়ি না করে তার ছোট্ট পাইপটা জোরে জোরে টানতে লাগল।

নাবিকরা চলে গেল ধীরে ধীরে।

কয়েক মিনিট বাদেই সবাই জানতে পারল প্রোশ্‌কার শরীরে বা তার বাক্সে হারান টাকা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

'পাজীটা অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছে!' অনেকে মন্তব্য করল, নিজেদের ভেতর বলাবলি করতে লাগল প্রোশ্‌কা এখন 'এর জন্য টের পাবে,' ইগ্‌নাতভ চুরির জন্য কখখনো ওকে ক্ষমা করবে না।

## ৫

দ্রুত নেবে এল গ্রীষ্মমণ্ডলের নরম রাত।

কাজ থেকে ছুটি পাওয়া নাবিকরা ডেকের উপর ঘুমোচ্ছে, নীচে খুব গুমোট। পাহারার কাজে নাবিকদের এক দল ব্যস্ত। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, আয়ন বায়ুর অঞ্চলে, পাহারাদাররা শান্তিতে চুপচাপ আছে—সময় কাটাচ্ছে কথাবার্তা আর গল্প বলে।

শুতিকভ আর প্রোশ্‌কা ছিল দ্বিতীয় দলে। সেদিন রাত বারোটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত তাদের কাজ।

শুতিকভ একদল নাবিককে গল্প শোনাচ্ছিল। প্রধান মাস্তুলের পাশে বসেছিল ওরা, উঠে গেল তামাক খেতে। এক পাইপ তামাক টেনে শুতিকভ কোয়ার্টার ডেকের উপর দিয়ে সাবধানে ঘুমন্ত নাবিকদের শরীর ডিঙিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল প্রোশ্‌কা অন্ধকারে বসে আছে জাহাজের পাশে হেলান দিয়ে।

'ও কে, প্রোশ্‌কা নাকি?' ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ,' চমকে উঠে উত্তর দিল প্রোশ্‌কা।

'শোন যা বলছি,' শুতিকভ শান্তভাবে বন্ধুর মত বলল। 'জান ত ইগ্‌নাতভ কী রকম লোক... পারে গেলে তোমাকে সে আধমরা করবে... ওর দয়ামায়া নেই...'

প্রোশ্‌কা কান খাড়া করল... এ ভাবে তার সঙ্গে কেউ কথা কইবে এটা সে কখনো আশা করেনি।

'আমি পরোয়া করিনে। ওর টাকা ছুঁইনি আমি।' একটু চুপ করে থেকে সে জবাব দিল।

'না, কিন্তু ও ভাবছে তুমিই নিয়েছ। সুতরাং, টাকা না পেতে কিছুতেই তোমাকে ছাড়বে না... অনেকেই ভাবছে এটা তোমারই কাজ...'

'বলছি ত, টাকা আমি নিইনি,' একরোখাভাবে বলল প্রোশ্‌কা।

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। জানি তুমি টাকাটা নাওনি... তোমাকে ইগ্‌নাতভ বিনা দোষে মেরেছে, আবার মারবে বলে শাসিয়েছে... এতে আমি দুঃখিত। কী বলছি তাই শোন, প্রোশ্‌কা! তোমাকে কুড়ি ফ্রাঙ্ক দিচ্ছি, এটা ইগ্‌নাতভকে দিয়ে দাও... তাহলে ও চুপ করে যাবে! পরে যখন পারবে টাকাটা আমায় দিয়ে দিও। চাপ দেব না ... এই হল সবচেয়ে ভাল পন্থা! কিন্তু মনে রেখো, এ নিয়ে কাউকে একটা কথাও কইবে না,' যোগ করল সে।

প্রোশ্‌কা এই প্রস্তাবে একেবারে থ মেরে গেল। প্রথমটায় ওর মুখ দিয়ে কথাই বার হল না। শুতিকভ যদি অন্ধকারে ওর মুখ দেখতে পেত তাহলে দেখত সে মুখ কত উদ্বিগ্ন, কত বিচলিত। আর হবারও কথা! এমন একটা লোক হাজির যে হতভাগা প্রোশ্‌কার উপর শুধু দয়াই দেখাচ্ছে না, তাকে মারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সত্যি সত্যি টাকা দিতে চাইছে! যে লোক এত দিন ধরে একটাও মিষ্টি কথা শোনেনি তার পক্ষে এটা অভিভূতকারক!

চোখ নীচু করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। গলা দিয়ে কী যেন অদ্ভুত একটা পোঁটলা হয়ে ঠেলে উঠছে।

'এই নাও টাকাটা!' ছোট্ট একটা ন্যাকড়ায় জড়ান টাকা পকেট থেকে টেনে বার করে বলল শুতিকভ।

'কিন্তু... কিন্তু... আঃ!' বিচলিতভাবে বিড় বিড় করে উঠল প্রোশ্‌কা।

'নাও, বোকামী করো না, কী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ?'

'নেব টাকা? ওরে ভাই! তোমার দয়ার জন্য আশীর্বাদ!' প্রোশ্‌কা উত্তর দিল, তার গলা কাঁপছে ভাবাবেগে। পরে হঠাৎ দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে বলল, 'কিন্তু তোমার টাকা নেব না, শুতিকভ... আর যাই হোক, আমারও কিছু জ্ঞানগম্যি আছে, আমি ছোটো হতে চাই না ... পাহারার কাজ শেষ হলে নিজেই ওকে টাকা দিয়ে দেব।'

'তাহলে তুমি...'

'হ্যাঁ, আমিই নিয়েছি!' প্রায় শোনা যায় না এমনি গলায় বলল প্রোশ্‌কা। 'কেউ ও টাকা বার করতে পারত না... টাকাটা এখানে কামানের ভিতর লুকোন ...'

'ওঃ, প্রোখর, প্রোখর!' তিরস্কারের কণ্ঠে বলল শুতিকভ, দুঃখভরে মাথা নাড়তে লাগল সে।

'এখন ইগ্‌নাতভ আমাকে যত খুশি মারুক, চোয়াল ভাঙলেও কিছু আসে যায় না। আসুক সে! প্রোশ্‌কা বদমাসটাকে ঘুষি চালাক পুরোদমে, এই তার উপযুক্ত!' নির্মম আত্মপীড়নে উন্মাদ হয়ে বলতে লাগল সে। 'সবকিছুই এখন সানন্দে সহ্য করব ... অন্ততঃ জানতে পেরেছি একজন আমার জন্য দুঃখ পেয়েছে ... একজন আমাকে বিশ্বাস করেছে ... মিষ্টি কথা বলেছে। যতদিন বেঁচে থাকব, ভুলব না কখনও!'

'তাহলে এই তোমার আসল রূপ!' সস্নেহে কথাটা বলে শুতিকভ কামানটার উপর হেলান দিল।

একটু সময় চুপচাপ। পরে শুতিকভ বলল:

'শোনো ভাই। কেন তুমি এই নোংরা স্বভাবটা ছেড়ে দাও না? সত্যি বলছি... ভদ্র মানুষ যে ভাবে চলে তুমিও তেমনি সৎভাবে থাকো... একজন পাকা নাবিক হও, যথার্থ ও উপযুক্ত... সত্যি তোমার মঙ্গল হবে এতে। চুরি করে তোমার কী উপকার হচ্ছে, বলো? গাল দেবার জন্য এ কথা বলছি না, প্রোখর—তোমার জন্য আমি শুধু দুঃখই পাই!..'

প্রোশ্‌কা ওর কথায় মন্ত্রমুগ্ধ। জীবনে কেউ ওর সঙ্গে এত সদয়ভাবে কথা কয়নি। অভিশাপ আর প্রহার, প্রহার আর অভিশাপ—শুধু এই জুটেছে ভাগ্যে।

কৃতজ্ঞতার তপ্ত আবেগে হৃদয় উঠল ভরে, বৃথাই খুঁজতে লাগল একে প্রকাশ করার ভাষা।

ইগ্‌নাতভকে ক্ষমা করতে বলবে এই কথা দিয়ে শুতিকভ চলে যেতে প্রোশ্‌কা নিজেকে আগেকার মতো তেমন অপদার্থ মনে করল না। অনেক অনেক সময় ধরে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল সমুদ্রের দিকে—দু'এক বার মুছল চোখের জল।

পরের দিন সকালে পাহারার কাজ শেষ হতে টাকা নিয়ে গেল ইগ্‌নাতভের কাছে। আনন্দে আত্মহারা লোভীর মত টাকাটা মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে প্রোশ্‌কার চোয়ালে একটা ঘুষি চাপিয়ে ইগ্‌নাতভ যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু প্রোশ্‌কা তার সামনে এসে বলতে লাগল:

'আমাকে আবার মার ... মার সেমিওনিচ! যত জোরে খুশি পেটাও।'

প্রোশ্‌কার ভিতর এই নতুন সাহস দেখে তার দিকে ঘেন্নার সঙ্গে তাকিয়ে ইগ্‌নাতভ বলল:

'টাকা না ফিরিয়ে দিলে তোর গায়ের চামড়া তুলে নিতাম, শুয়োর! কিন্তু টাকা যখন দিয়েছিস, তোকে মেরে আর হাত নোংরা করব না ... দূর হ, জানোয়ার! আর মনে রাখিস, ফের যদি আমার বাক্সের কাছে ঘুর ঘুর করবি ত জন্মের মত তোকে পঙ্গু করে ছাড়ব!' সে জোর দিয়ে বলল আর প্রোশ্‌কাকে এক পাশে ঠেলে টাকাটাকে বাক্সবন্দী করার জন্য নীচে চলে গেল।

এখানেই ব্যাপারটা শেষ হল।

ভাগ্যিস শুতিকভ ব্যাপারটায় মাথা দিয়েছিল, কারণ এমন যে সারেঙ্গ শুকিন যে চুরির কথা শুনে 'সাফ করার কাজ শেষ হলে শয়তানটার ঘাড় মটকাবে' বলেছিল সেও ওর চোয়ালে 'সামান্য একটা ঘুষি' কষিয়ে ক্ষান্ত হল।

'ঝানু সেমিওনিচ প্রোশ্‌কাকে ঠিক শায়েস্তা করেছে,' সেদিন সকালে ডেকের ঘষামাজার কাজ করতে করতে নাবিকরা বলাবলি করতে লাগল। 'তবু ব্যাটা বলছিল ও টাকা নেয়নি!'

## ৬

সেই স্মরণীয় রাতটির পর থেকে শুতিকভের উপর প্রোশ্‌কার কুকুরসদৃশ ভক্তি জন্মাল। সে অবশ্য এটা খোলাখুলিভাবে দেখাল না, সম্ভবত এই ভেবে যে তার মত একটা হতভাগার সঙ্গে শুতিকভের বন্ধুত্ব তাকে অপরের কাছে ছোট করবে, অন্য লোক থাকলে কখনো সে শুতিকভের সঙ্গে কথা কইত না। কিন্তু প্রায়ই প্রোশ্‌কা একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে থাকত যেন সে কোন উঁচু জাতের জীব আর তার পাশে নিজে সে নীচাতিনীচ। ত্রাণকর্তাকে নিয়ে তার গর্ব, তাকে ঘিরে সবকিছুতেই তার আন্তরিক উৎসাহ। শুতিকভকে উঁচুতে উঠে নির্ভয়ে মাস্তুল বেয়ে এগুতে দেখে সে প্রশংসায় বিগলিত, তার গান শুনে ওর অসীম আনন্দ — সব মিলিয়ে সে যা কিছু করে তার সবই অত্যাশ্চর্য। কখনো দিনের বেলা, কিন্তু বেশীর ভাগই রাতের পাহারায় শুতিকভকে একা দেখে সে তার কাছে এসে পায়চারি করে।

'কিছু দরকার আছে, প্রোখর?' শুতিকভ হয়ত বন্ধুভাবে জিজ্ঞেস করল।

'না, না। ধন্যবাদ!' প্রোশ্‌কা উত্তর দিত।

'কোথায় যাচ্ছ তাহলে?'

'ও, আমার কাজের জায়গায় ... এমনি পায়চারি করছিলাম!'

সে শুতিকভকে বিরক্ত করেছে যেন এই ভেবে ক্ষমা চাওয়ার সুরে কথাটা বলে প্রোশ্‌কা প্রস্থান করে।

প্রোশ্‌কা শুতিকভকে খুশি করার জন্য কী চেষ্টাই না করে। এক দিন সে হয়ত ওর কাপড় কেচে দিতে চাইল, আর একদিন চাইল রিপু করতে কিন্তু হামেশাই যা ঘটত; শুতিকভ ওর সেবা নিতে চাইত না আর প্রোশ্‌কা হত হতাশ।

একদিন নিয়ে এল নিজের তৈরী একটি সুশ্রী নাবিকসার্ট, অপ্রতিভভাবে দিল শুতিকভের হাতে।

'সাবাস জিতিন! দিব্যি কাজ তোমার!' ওর হাতের কাজটা পরীক্ষা করে

সমঝদারের মত বলল শুতিকভ। সার্টটাকে ফিরোতে যেতেই প্রোশ্‌কা বলে উঠল:

‘কিন্তু এটা যে তোমারই জন্য, এগোর মিত্রিচ ... দয়া করে নাও এটাঁ।’

প্রথমটায় শুতিকভ উপহারটা নিতে চাইল না, কিন্তু প্রোশ্‌কা এমন বিচলিত হল আর এমন আন্তরিক অনুরোধ জানাতে লাগল যে শেষটায় নিতেই হল তাকে।

প্রোশ্‌কা পরম আনন্দ পেল।

আরও মজা এই, প্রোশ্‌কা আগের মত কাজে ততটা ফাঁকি দেয় না, আর সব নাবিকের মত ঠিক ঠিক কাজ করে। আগের মত ঘন ঘন মারও খায় না সে, কিন্তু এখনও তাকে দেখা হয় ঘেন্নার চোখে। কেউ কেউ ওকে উত্ত্যক্ত ও পীড়ন করে আনন্দ পায়।

বিশেষ করে একটা অল্প বয়স্ক নাবিক ওকে জ্বালাতন করে, নাম ইভানভ— অসভ্য ও কাপুরুষ। এক দিন একদল সঙ্গীদের মজা দেখাবার জন্য প্রোশ্‌কাকে নিয়ে ইয়ার্কি ঠুকছিল সে। প্রোশ্‌কার তরফ থেকে কোন প্রতিবাদ নেই। ওর ইয়ার্কি যখন ক্রমশঃ অত্যধিক বিরক্তিকর ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে শুরু করেছে, এমন সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিল শুতিকভ। ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে সে প্রোশ্‌কার পক্ষ নিয়ে দাঁড়াল।

‘দেখ ইভানভ, এসব চলবে না ... কেন ওর পিছে লেগেছ? ঠিক নয় এটা!’

‘আরে, ও কিছু মনে করে না!’ ইভানভ জবাব দেয় হাসতে হাসতে। ‘এসো বাবা প্রোশ্‌কা, বলো ত কী ভাবে পাদরীর টাকা মেরে মেয়েদের দিয়েছিলে ... লজ্জা পেয়ো না ... সবটা খুলে বল!’ বিদ্রূপ করল সে।

‘আমি বলছি, ওকে ছেড়ে দাও...’ শুতিকভ বলল কঠোরভাবে।

চোর আর অপদার্থ প্রোশ্‌কার পক্ষ নিয়ে শুতিকভকে এমন জোরের সঙ্গে দাঁড়াতে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।

‘কেন, তোমার এতে কী?’ বিরক্তি জানিয়ে বলল ইভানভ।

‘কিছুই না। চাই না তোমরা ওকে জ্বালাও, ব্যস্‌, আর কিছু না ... তোমাদের সমকক্ষ একজন কাউকে নিয়ে এমনি করো না কেন?’

গভীরভাবে অভিভূত হলেও, পাছে শ্রুতিকভের এই হস্তক্ষেপ তার বন্ধুর পক্ষে অপ্রীতিকর হয়ে দাঁড়ায় এ জন্য প্রোশ্‌কা গলা চড়িয়ে বলল:

'সত্যি এটা কিছু নয় ... ইভানভ একটু মজা করছে মাত্র ...'

'ওর চোয়ালে একটা চাপালেই মজা করা বন্ধ হবে!'

'প্রোশ্‌কা, আমার চোয়ালে একটা লাগা ...' অবাক হওয়ার ভাব নিয়ে বলল ইভানভ। তার মতে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। 'কেবল একটি বার চেষ্টা কর্‌ ... কেমন তোকে জেলি বানিয়ে ছাড়ি দেখবি, ওরে বোকা কানওলা মুখ্যু।'

'অন্য কেউ তোমাকে ঠিক তাই বানাতে পারে।'

'যেমন তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি!' কোনরকমে নিজেকে সামলে বলল শ্রুতিকভ, তার স্বাভাবিক হাসিখুশি মুখখানা কঠোর ও গম্ভীর হয়ে উঠল।

ইভানভ মুষড়ে গেল। কেবল শ্রুতিকভ যখন কথা-শুনতে-না-পাওয়ার মত দূরে চলে গেল প্রোশ্‌কাকে দেখিয়ে উপেক্ষার হাসি হেসে বলল:

'বাঃ বাঃ, শ্রুতিকভের দেখছি একজন বন্ধু জুটেছে! খাসা হয়েছে এখন ... আহা কি আমার বন্ধুরে ... প্রোশ্‌কা ত নরকের কীট!'

* * *

এই ঘটনার পর ওরা প্রোশ্‌কাকে তত বিরক্ত করত না কারণ জানতে পারল ওর একজন রক্ষাকর্তা আছে। শ্রুতিকভের উপর প্রোশ্‌কার অনুরাগ আরো বেড়ে গেল। তার কৃতজ্ঞ হৃদয়ের নিষ্ঠা কত প্রবল তার পরিচয় দিল কিছুদিনেরই ভেতর।

## ৭

জাহাজ তখন ভারত মহাসাগরে, চলেছে সুন্দ দ্বীপপুঞ্জের দিকে।

উজ্জ্বল রোদে-ভরা আকাশ, তবু বাতাসে একটু শীতল ছোঁয়াচ। অপেক্ষাকৃত দক্ষিণ মেরুর কাছে বলে ওটা টের পাওয়া যাচ্ছে। একটা সতেজ, একটানা বাতাস

বইছে আর তুষার-ধবল পালকের মত মেঘের দল ভেসে চলেছে আকাশে, তৈরী করছে সূক্ষ্ম ও অদ্ভুত নক্সা। জাহাজটি ধীরে ধীরে দোল খেয়ে অনুকূল আয়ন বাতাসে চলেছে ভেসে।

প্রায় ১০টা বাজে। সব নাবিকরাই ডেকে এসেছে। পাহারাদাররা তাদের নিজ নিজ পালের দড়াদড়ির কাছে, বাকি সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত। প্রত্যেকেরই বিশেষ ধরনের কাজ: কেউ পালিশের শেষ কাজটুকু সেরে ফেলছে, কেউ পরিষ্কার করছে জাহাজের নৌকো, কেউ বা মাদুর বুনছে।

শুতিকভ শিকলে ঝুলে আছে, তার কোমরে বাঁধা একটা সেফটি বেল্ট। এই মাত্র সে এই কাজটা আর এক জনের কাছ থেকে নিয়েছে। সে সীসের গুলি নাবিয়ে জল মাপা শিখছিল। তার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে প্রোশ্‌কা। একটা কামান সাফ করছে ও, মাঝে মাঝে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে শুতিকভকে। সে দ্রুত, দক্ষ হাতে তার কাজ করে চলেছে...

হঠাৎ কোয়ার্টার-ডেক থেকে একটা চীৎকার উঠল:

'জলে লোক পড়েছে!'

কয়েক সেকেণ্ড বাদে আবার সেই অশুভ চীৎকার:

'আর একজন পড়েছে!'

মুহূর্তের জন্য জাহাজের জীবন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। বহু নাবিক আতঙ্কে ক্রুশচিহ্ন আঁকল।

পাহারা অফিসার ব্রিজের উপর থেকে দেখেছে একটা লোককে সমুদ্রে পড়তে আর তারই পেছন পেছন আর একজনকে ঝাঁপ দিতে। বুকটা তার ধড়াস করে উঠল কিন্তু মাথাটা থাকল ঠিকই। ব্রিজের ওপর থেকে একটা লাইফ বেল্ট ছুঁড়ে দিল জলে আর জাহাজের পিছনকার প্লাটাতনের লোকদের চীৎকার দিয়ে বলল লাইফ বোয়া ফেলে দিতে। তীব্র, উত্তেজিত গলায় হুকুম দিল:

'পাল নাবাও!'

'জলে লোক' চীৎকার শুনেই সব অফিসাররা ডেকে ছুটে এসেছে।

ক্যাপ্টেন আর প্রধান অফিসারও উদ্বিগ্ন হয়ে ইতিমধ্যেই ব্রিজের উপর এসে গেছে।

'মনে হচ্ছে ও একটা বোয়া ধরেছে!' মুহূর্তের জন্য দূরবীণ নাবিয়ে বলল ক্যাপ্টেন। 'ওদের উপর নজর রাখ, সঙ্কেতকারী!..'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার! দেখতে পাচ্ছি ওদের।'

'জাহাজ থামাও, নৌকো নামাও! চটপট!' ক্যাপ্টেন আদেশ দিল তীক্ষ্ন ও উত্তেজিত গলায়।

কিন্তু নাবিকদের তাড়াতাড়ি করবার উপদেশ দেবার প্রয়োজন ছিল না। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান জেনে তারা দৈত্যের মত কাজ করতে লাগল। মিনিট আটেকের ভেতর জাহাজটা গেল থেমে, কর্ণধার হিসেবে অফিসার লেসভোয়কে হালে বসিয়ে নৌকোটাকে সাবধানে কপিকল দিয়ে নীচে নাবান হল।

'সফল হও!' ক্যাপ্টেন ওদের উদ্দেশে বলে উঠল। 'পূব-উত্তর-পূবে নৌকো বাও ... বেশী দূরে যেও না!'

সমুদ্রের বুকে লোক আর দেখা যাচ্ছে না। জাহাজ থামাতে যে আট মিনিট লেগেছে তাতে সে অন্ততঃ মাইল খানেক দূরে চলে গেছে।

'কে পড়েছে?' ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করল প্রধান অফিসারকে।

'শুতিকভ। সে জলের মাপ নিচ্ছিল। হঠাৎ দড়ির-বেল্টটা ছিঁড়ে যায়।'

'আর একজন কে?'

'জিতিন! সে ওর পেছন পেছন ঝাঁপ মারে।'

'জিতিন? ওই ভীরু অপদার্থটা?'

'সত্যি তাই। আমিও কিছু বুঝতে পারছিনে!' জবাব দিল প্রধান অফিসার।

ইতিমধ্যে সবার নজর পড়ল নৌকোটার উপর, ধীরে ধীরে জাহাজ থেকে সরে যাচ্ছে ঢেউয়ের উপর দুলতে দুলতে। শেষ পর্যন্ত চলে গেল দৃষ্টির বাইরে। দূরবীণধারীরা শুধু ওটার দিকে চেয়ে রইল: সীমাহীন, তরঙ্গায়িত সমুদ্র ছাড়া কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না।

জাহাজের বুকে বিষণ্ণ নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে নাবিকরা চাপা গলায় দু' একটা কথা বলছে। এছাড়া আর কোন সাড়াশব্দই নেই। ক্যাপ্টেন দূরবীণ

চোখে লাগিয়ে আছে। প্রধান নৌ-চলাচল অফিসার আর দু'জন সঙ্কেতকারী দূরবীণে চোখ পেতে।

দীর্ঘ আধঘণ্টা কাটল এই ভাবে।

'নৌকোটা ফিরে আসছে!' একজন সঙ্কেতকারী বলল।

আবার সবার চোখ পড়ল সমুদ্রের উপর।

'নিশ্চয়ই ওদের তুলতে পেরেছে!' বলল প্রধান অফিসার শান্ত গলায়।

'কী থেকে এই ধারণা করছেন?' ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করল।

'তা না হলে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসত না, স্যার।'

'আশা করা যাক! আপনার কথাই যেন ঠিক হয়!'

নৌকোটা ধীরে ধীরে ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে এগিয়ে এল। দূরে দেখাচ্ছে একটা ছোট্ট খোলার মত। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে ঢেউগুলো ওকে গিলে খাবে। কিন্তু আবার ভেসে উঠছে পরবর্তী ঢেউয়ের চূড়ায়। এই ভাবে এগিয়ে আসতে লাগল পথ ধরে।

'সাবাস, লেসভোয়! চমৎকার নৌকো বাইছে!' নৌকোর উপর নজর রেখে ক্যাপ্টেন বলে উঠল।

নৌকো এগিয়ে এল ক্রমশঃ।

'দু'জনকেই তুলে এনেছে!' সঙ্কেতকারীর সানন্দ চীৎকার।

সবাই আশ্বস্ত। অনেকে আঁকল ক্রুশচিহ্ন। জাহাজ প্রাণ ফিরিয়ে পেল। কথাবার্তা শুরু হল আবার।

'খুব ভাগ্যি, ওরা রক্ষা পেয়েছে!' বলল ক্যাপ্টেন। তার গম্ভীর মুখে স্মিত হাসি।

প্রধান অফিসারও ক্যাপ্টেনের দিকে চেয়ে হাসল।

'কে জিতিনের সম্পর্কে এটা ভাবতে পারে! সব সময়েই ত ওকে কাপুরুষ ভাবতাম!..'

'এটা অবিশ্বাস্য ... ওর মত আলসে — সঙ্গীকে রক্ষার জন্য ও কিনা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল!.. শুতিকভ ... ওকে নিয়েছিল নিজের দলে!' প্রধান অফিসার বুঝিয়ে বলল।

সবাই প্রোশ্কার দুঃসাহসিক কাজে থ মেরে গেল। সেই মুহূর্তের নায়ক ত প্রোশ্কাই।

মিনিট দশেক বাদে নৌকোটা জাহাজের পাশে ভিড়ল, নির্বিঘ্নে তোলা হল উপরে।

উত্তপ্ত, ভেজা ও ঘর্মাক্ত নাবিকরা অগ্রমাস্তুলের পুরোবর্তী ডেকের দিকে এগোল, ক্লান্তিতে হাঁপ টানছে... শুতিকভ আর প্রোশ্কাও উঠেছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁসের মত গায়ের জল ঝাড়ছে, দুজনেরই মুখ ফ্যাকাশে কিন্তু উত্তেজিত ও আনন্দময়।

সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকাল প্রোশ্কার দিকে — সে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেনের সামনে।

'সাবাস, জিতিন!' এই উজবুক, অতি সাধারণ লোকটা যে এই মাত্র তার বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করেছিল তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে তারিফ করল ক্যাপ্টেন।

আর প্রোশ্কা এমন লজ্জা পেল যে সে যে কী করবে বুঝেই উঠতে পারল না।

'আচ্ছা, এবার গিয়ে চট করে পোষাক বদলাও আর আমার নাম করে এক গ্লাস ভদকা খাও ... তোমার সাহসের জন্য একটা পদকের সুপারিশ করব, তাছাড়া, কিছু টাকাও দেব উপহার হিসেবে।'

লজ্জিত ও হতভম্ব প্রোশ্কা এমনকি 'ধন্যবাদ আপনাকে' বলতেও ভুলে গেল। অপ্রস্তুতের মত হেসে নীচে চলে গেল তার স্বভাবসিদ্ধ হাঁসের মত ভঙ্গী করে।

'কাজে লাগো!' ব্রিজের উপর উঠতে উঠতে ক্যাপ্টেন হুকুম দিল।

পাহারা অফিসার দিল পাল্টা হুকুম। গলা শান্ত ও ফুর্তিবাজ। চটপট উঠল পালগুলো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঢেউয়ের উপর মৃদু দোল খেতে খেতে জাহাজ চলল এগিয়ে, আবার শুরু হল সকালের কাজ।

'আরে, তুই ত আচ্ছা লোক, শয়তান ভর করুক তোকে!' শুকনো পোষাক পরে, এক গ্লাস ভদকা টেনে চাঙ্গা হয়ে প্রোশ্কা শুতিকভের পেছনে উপরের

ডেকে যেতেই বলে উঠল লাদ্রেন্‌তিচ। ওর পিঠ চাপড়ে বলল, 'একবার ভেবে দেখ, একটা দরজীর কতখানি সাহস!'

'প্রোখর না হলে আমাকে আর বাঁচতে হত না! জলে পড়ে যখন ভেসে উঠেছিলাম, বলছিলাম, "সব শেষ, প্রার্থনা শেষ কর,"' শুতিকভ জানাল নাবিকদের। 'মনে মনে ভেবেছিলাম "বেশীক্ষণ টি'কে থাকতে পারব না ..." আর সে সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম প্রোখর আমার উদ্দেশ্যে চীৎকার দিচ্ছে ... দেখলাম একটা লাইফবেল্ট নিয়ে সাঁতরে আসছে আমার কাছে ... ওকে দেখে আমার কী আনন্দ! নৌকো আসা পর্যন্ত এ ভাবেই আমরা ভেসে রইলাম।'

'তুমি ভয় পেয়েছিলে?' নাবিকরা জিজ্ঞেস করল।

'আলবৎ ভয় পেয়েছিলাম! ভয়ঙ্কর কাণ্ড, ভগবান বাঁচালেন!' স্মিত হাসি নিয়ে জবাব দিল শুতিকভ।

'কিসের জন্য তুমি ওরকম কাজ করেছিলে?' সেইমাত্র সেখানে-আসা সারেঙ্গ প্রোশ্‌কাকে জিজ্ঞেস করল সদয়ভাবে।

প্রোশ্‌কা বোকার মত হাসল, একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল:

'জানিনে, মাৎভেয় নিলিচ ... আমি শুধু ওকে দেখছিলাম ... মানে শুতিকভকে ... ও পড়ে গেল ... আর আমিও কিছু না ভেবে ওর পিছনে ঝাঁপ দিলাম ...'

'সাবাস্‌, প্রোখর!.. সাবাস!.. একেই বলে আসল বন্ধু! এই নাও, একটান হয়ে যাক!' বিশেষ খাতির হিসেবে লাদ্রেন্‌তিচ তার ছোট্ট পাইপটা প্রোশ্‌কার হাতে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে রসাল দুচারটে গালিগালাজ ঝাড়ল অত্যন্ত কোমল গলায়।

সে দিন থেকে জিতিনকে আর কেউ তার বিদ্রূপের নাম 'প্রোশ্‌কা' বলে ডাকত না, ডাকত তার আসল নাম প্রোখর বলে।

## ১

সিঙ্গাপুর বন্দরে গ্রীষ্মমণ্ডলের একটি রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল। আঠারো শতাব্দীর সপ্তম দশকের কথা। প্রশান্ত মহাসাগরস্থ রুশ নৌবহর নোঙর করে আছে সেখানে। নতুন প্রধান অফিসার ব্যারন ফন ডের বেরিং, কৃশ, রুগ্ন, ধবধবে চুলওয়ালা পঁয়ত্রিশ বছরের লোক, মুখে অস্বাভাবিক গম্ভীর ভাব। প্রধান সারেঙ্গ গরদেয়েভকে সঙ্গে নিয়ে সবপ্রথম তিন মাস্তুলের যুদ্ধ-জাহাজ 'মগুচি' পরিদর্শনে বেরিয়েছে। সর্বাধিক অনুসন্ধানী ও সযত্ন দৃষ্টি নিয়ে জাহাজটি পরীক্ষা করছে সে। এডমিরালের আদেশে ব্যারন সবে 'গোলুব' থেকে বদলী হয়েছে, গত সন্ধ্যায় কেবল পা দিয়েছে 'মুগুচি'তে। নতুন জাহাজটির সঙ্গে এই সবে পরিচয় হচ্ছে তার।

'নতুন বনা' প্রধান অফিসারের পাণ্ডিত্য নিয়ে দোষ ধরবার আগ্রহ সত্ত্বেও সে কিছুই বার করতে পারল না। 'মগুচি' গত দু' বছর ধরে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে চমৎকার ছিমছাম চেহারায় আছে, উজ্জ্বল পরিচ্ছন্নতায় আগাগোড়া চক চক করছে। প্রাক্তন প্রধান অফিসার স্তেপান স্তেপানভিচ, অফিসার ও নাবিক উভয়ের কাছেই সমান প্রিয় ছিল। সে এখন আর একটি জাহাজে ক্যাপ্টেনের পদ পেয়েছে। এই ভদ্রলোকটি জাহাজটিকে তারই ভাষায় 'নতুন পেনির মত পরিষ্কার' রাখতে তার সদাশয় ও সরল আত্মাটিকে সমর্পণ করেছিল। ভাল কাজের সমঝদার যে কোন নাবিকই জাহাজটিকে দেখে হিংসে করত।

আর সত্যি করে যে বন্দরেই যেত সেখানেই 'মগুচি' প্রশংসা পেত।

নীচের ডেক ধরে ধীরে ও একটু হেলেদুলে পা ফেলে চলতে চলতে ব্যারন বেরিং হঠাৎ থেমে গেল এবং তার হাত তুলে তর্জনী দিয়ে একটা জিনিস দেখাল, তার আঙুলে কুরল্যাণ্ড ফন ডের বেরিংএর প্রাচীন বংশের সীল-মারা এক আংটি। যে জিনিসটা সে দেখাচ্ছে সেটা বড়সড়, লাল, লোমশ একটা কুকুর। নাবিকদের ঘরের ছায়াময় আরামপ্রদ একটা কোণায় শুয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, কুৎসিত মুখটা মেঝের উপর লম্বা হয়ে পড়ে আছে, আদৌ সম্ভ্রান্ত চেহারার নয়।

'ওটা কী?' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ব্যারন জানতে চাইল।

'একটা কুকুর, স্যার', সারেঙ্গ চট করে জবাব দিল। সে ভাবল ডেকের আবছা আলোতে ব্যারন বোধ হয় কুকুরটাকে দেখতে পায়নি—ওটাকে অন্য কিছু ভেবেছে।

'মুখ্যু!' ব্যারন শান্ত কঠিন গলায় বলল। 'দেখতে পাচ্ছি ওটা কুকুর—ডেক ঝাঁট দেওয়ার ঝাঁটা নয়। যা জানতে চাই তা এই যে ওটা ওখানে কী করছে? যুদ্ধ-জাহাজে কুকুর, কখনো শোনা যায়নি! কার কুকুর এটা?'

'জাহাজের, স্যার!'

'সারেঙ্গ, তোমার নাম কী?'

'গরদেয়েভ, স্যার!'

'সারেঙ্গ গরদেয়েভ! আরও পরিষ্কার করে কথা বলো। তোমার কথা বুঝতে পারছিনে। "জাহাজের কুকুর" মানে কী?' ব্যারন ঠিক আগের মত ধীর, শান্ত,

একঘেয়ে গলায় প্রতিটি শব্দকে রুশী জার্মানদের মত অতিরিক্ত বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে বলল। তার বড়, স্বচ্ছ, প্রাণহীন নীল চোখ দুটোকে সারেঙ্গের মুখের উপর রাখল স্থির করে।

এর আগে নিজের কথা কাউকে বোঝাতে বয়স্ক সারেঙ্গের কখনো কষ্ট হয়নি (সম্ভবতঃ যখন সে পাঁড় মাতাল হয়ে পার থেকে ফিরে আসত একমাত্র তখন ছাড়া)। বিব্রতভাবে ব্যারনের লম্বা ভাবলেশহীন মুখটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে। ব্যারনের মুখে কাটলেটের মত লালচে জুল্‌পী, সাদা গাল দুটো ঈষৎ রক্তাভ। এই বিরক্তিকর প্রশ্নের ফলে স্পষ্টই বিব্রত বোধ করে সে কোন জবাব দিতে পারল না—অসহায়ভাবে তার ধূসর ছোট চোখ দুটো পিট পিট করতে লাগল।

'তাহলে জাহাজের এই কুকুরটার মালিক কে?'

'নাবিকরা ... খালাসিরা, স্যার!' বিষণ্নভাবে বুঝিয়ে বলল সারেঙ্গ, রাগতভাবে চিন্তা করল:

'যেন তুমি বুঝতে পারছ না, "টেকুয়া-পাওলা?"'

কিন্তু মনে হল 'টেকুয়া-পাওলা' বুঝতে না পেরে বলল:

'যাচ্ছেতাই। এর একটা মালিক থাকা চাই! প্রত্যেক কুকুরেরই থাকে।'

'এর কেউ নেই, স্যার। এটা ছাড়া কুকুর।'

'সেটা কী?' ব্যারন প্রশ্ন করল। স্পষ্টতঃই শব্দটা তার কাছে অপরিচিত।

'একটা রাস্তার কুকুর, স্যার। আমরা যখন ক্রনস্টাড্‌টে জাহাজটাকে সাগর যাত্রার জন্য তৈরী করছিলাম তখন বেঁড়ে আমাদেরই একজন লোকের পিছু পিছু জাহাজে উঠে আসে। সেই থেকে এখানেই আছে। ওর ল্যাজের জন্য আমরা বেঁড়ে বলে ডাকি, স্যার!' ব্যাখ্যা হিসেবে সারেঙ্গ কথাটুকু যোগ করল।

'কুকুরদের যুদ্ধ-জাহাজে থাকতে দেয়া হয় না। ওরা শুধু ডেক নোংরা করে।'

'আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে পারি, স্যার, বেঁড়ে বুদ্ধি রাখে, আচরণ ভদ্র। এ নিয়ে সে আমাদের কখনো অসুবিধেয় ফেলেনি!' সারেঙ্গ বেঁড়ের

তারিফ করে বলল। 'আমাদের আগেকার প্রধান অফিসার স্তেপান স্তেপানভিচ বলেছেন ওকে আমরা রাখতে পারি, নাবিকরা ওকে ভালবাসে, কুকুর হিসেবে ও ভাল।'

'তোমাদের বড় বেশী আসকারা দেয়া হয়েছে, দেখছি। এতেই তোমরা গোল্লায় গেছ। আমি এখানে কড়া ব্যবস্থা করব, বুঝলে?' ব্যারন কঠোর হয়ে উঠল। সারেঙ্গের ব্যাখ্যার স্বাধীনভাব আর তার দিকে তাকিয়ে সে যে ভক্তিসমন্বিত বিস্ময়ে অভিভূত হল না তা দেখে বিরক্ত হল।

'হ্যাঁ, স্যার!' বলল গরদেয়েভ।

ব্যারন ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, ভাবতে লাগল কুকুরটার অদৃষ্ট কী হওয়া উচিত। সারেঙ্গও কুকুরটাকে ভালবাসত, ব্যারনের সিদ্ধান্ত জানার জন্য উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

শেষ পর্যন্ত প্রধান অফিসার রায় দিল:

'যদি কখনো ওকে ডেকের ওপরটা নোংরা করতে দেখি, জলে ছুঁড়ে ফেলব, বুঝলে?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আর মনে রেখো, দু'বার আদেশ দেয়া আমার অভ্যেস নয়', ব্যারন তার সেই একটানা, কর্কশ ও একঘেয়ে গলায় জোর দিয়ে জানাল।

সারেঙ্গ গরদেয়েভ নাবিক জীবনে বহু রকমের অফিসারের সঙ্গে কাজ করেছে, মানব চরিত্রের একজন দক্ষ বিচারক সে। ব্যারনের এই সাবধান-বাণীর আগেই সে এই সিদ্ধান্তে পেঁাছেছিল, 'টেকুয়া-পাওলার' কথা বলার এই শান্ত ও গম্ভীর কায়দা সত্ত্বেও ও রীতিমত একটা 'উৎপাত' হয়ে দাঁড়াবে। সবার প্রিয় স্তেপান স্তেপানভিচের তুলনায় এ আর এক গোয়ালের গরু।

ওর নাম বার বার বলা হচ্ছে শুনে বেঁড়ে চোখ খুলল। আড়মোড়া ভাঙল, উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে, নিজের অন্ধকার কোণ ছেড়ে আলোর দিকে এগিয়ে এল কয়েক পা। তারপর অফিসারের পোষাক-পরা একজন নতুন লোককে দেখতে পেয়ে শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে, নৌ-শৃঙ্খলার প্রমাণ দিয়ে বুদ্ধিমান কুকুরের মত ছোট্ট ল্যাজটুকু নাড়তে লাগল।

'ছ্যাঃ, কী জঘন্য জানোয়ার!' কুৎসিত ও বড়সড় কুকুরটার দিকে ঘেন্নার সঙ্গে তাকিয়ে বলল ব্যারন। কুকুরটার লালচে খসখসে জটপাকান লোম, ছেঁড়াখোঁড়া খাড়া কান, লম্বা ও চওড়া মুখ — তার উপর আবার জায়গায় জায়গায় লোম নেই, যেন পোকায় খেয়ে নিয়েছে।

এই বিশ্রী চেহারা সত্ত্বেও বেঁড়ের একটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ওর চোখ। তাতে একটি অস্বাভাবিক ভাল স্বভাবযুক্ত বুদ্ধির ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। কুকুরটা তার এই চোখ দুটো দিয়ে ব্যারনকে কৌতূহলের সঙ্গে দেখছিল, কিন্তু ব্যারন বোধ হয় চোখ দুটো লক্ষ্য করেনি।

'এই কুৎসিত জন্তুটা যেন আমার চোখে না পড়ে!' এই বলে সে উপরের ডেকে চলে গেল, পিছনে গেল ভ্রূ-কোঁচকান বিষণ্ণবদন সারেঙ্গ।

পায়ের ফাঁকে ছোট্ট ল্যাজটুকু গুটিয়ে (ক্রনস্টাড্‌টের এক রাঁধুনী ওর সঙ্গে যে নিষ্ঠুর কৌতুক করেছিল এ তারই ফল) বেঁড়ে তার অন্ধকার কোণটায় গুঁড়ি মেরে চলে গেল। সামনের পা খুঁড়িয়ে চলল সে, কারণ অনেকদিন আগেই ওটা ভেঙে গেছে। নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল যে টেকুয়া-পাওলা লোকটার মনে ভাল ধারণা জন্মানর সৌভাগ্য ওর হয়নি। অফিসারের সেই লাল জুল্‌পী আর চোখের কুৎসিত ঝলকানি — তার পক্ষে আদৌ শুভঙ্কর নয়।

একজন নাবিক প্রধান অফিসারের কথা শুনতে পেয়েছিল। সে এসে জাহাজের এই প্রিয় জন্তুটির পিঠ চাপড়াতে লাগল আর বেঁড়ে তার খসখসে হাতখানা চাটতে লাগল কৃতজ্ঞতাভরে।

## ২

উপরওয়ালার কাছ থেকে বক্তৃতা ও কটুভাষণ শুনলে সরল রুশীদের সাধারণত যে রকম মনে হয়, তেমনি তীব্র অবসাদের ভাব নিয়ে বেচারা সারেঙ্গকে অতঃপর ব্যারনের কেবিনে সোয়া-ঘণ্টা বা তারও বেশী দাঁড়িয়ে থাকতে হল। অধৈর্যে টুপি মুচড়িয়ে ব্যারনের বক্তৃতা শুনল সে। ব্যারন দীর্ঘ, একঘেয়ে নির্দেশ দিতে লাগল — কোন কায়দায় ভবিষ্যতে এই জাহাজের

কাজকর্ম চলবে, সারেঙ্গ ও পাতি অফিসারদের কাছ থেকে তার কী কী দাবী, নাবিকদের আচরণ কী রকম হওয়া চাই, 'যথার্থ শৃঙ্খলা' বলতে কী বোঝায় এবং তীরে গিয়ে মাতলামির জন্য কী প্রচণ্ড শাস্তি পেতে হবে প্রভৃতি।

'মনে থাকে যেন কী বললাম তোমাকে, আর সবাইকে এ কথা জানিয়ে দিও', অবশেষে এই বিদায়বাণীর পর মুক্তি পেয়ে সারেঙ্গ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। যেন এইমাত্র স্নান করে ফিরছে — এমনি লাল চেহারা নিয়ে চলল অগ্রমাস্তুলের পুরোবর্তী ডেকে তামাক খেতে।

কিন্তু সেখানে পৌঁছতেই নাবিকদের মাতব্বররা, যেমন ডাক্তারের এসিস্ট্যাণ্ট, গোমস্তা, মেট, ইঞ্জিনচালক, দু'জন কেরানী ও কয়েকজন পাতি অফিসার তাকে ঘিরে ধরল।

'ওহে, আকিম জাখারিচ, প্রধান অফিসারটি কেমন? কী ধারণা হল ওর সম্পর্কে?' জিজ্ঞেস করল সবাই।

কিন্তু সারেঙ্গ জবাব না দিয়ে তার লাল, লোমশ ও গ্রন্থিল হাতখানা দিয়ে একটা হতাশার ভঙ্গী করে টবের ভেতর ওয়াক করে থুথু ফেলল।

তার এই ভঙ্গী, সজোরে থুথু ফেলা, তামাটে ইঁট-লাল মুখে রাগের ভাব, পাক ধরা কালো জুল্পী, জ্বলজ্বলে, গোল আলুর মত নাক আর তার কোঁচকান ঘন ভুরু — সবকিছু যেন বলে দিল: 'ওর সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভাল।'

'মেজাজ খারাপ, তাই না?' একজন জিজ্ঞেস করল।

সারেঙ্গ প্রথমটায় কোন উত্তর দিল না, দু' একবার জোরে পাইপ টেনে আবার থুথু ফেলল, শ্রোতাদের দিকে তাকাল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। এই চতুর ও ভারিক্কি লোকটি কী বলবে তার জন্য ওরা উদগ্রীব হয়ে আছে। শেষটায় হঠাৎ সে বলে উঠল (অবশ্য তার চড়া গলাটা একটু নাবিয়ে — যে গলার জন্য তার নাম হয়েছিল 'পেতলের শিঙ্গা'):

'লোকটা প্রচণ্ড আতঙ্ক, এতে আর সন্দেহ নেই!'

এমন জোর আর বিশ্বাসের সঙ্গে সে এই বর্ণনা দিল যে প্রত্যেকের মনে তা গভীর দাগ কাটল। সঙ্গত কারণও আছে এর। গত দু'বছর ধরে ওরা এমন

একজন প্রধান অফিসারের সঙ্গে কাজ করেছে, যিনি, ওদেরই ভাষায়, 'দয়ালু' ধরনের, নাবিকদের যিনি যত্ন নিতেন, জাহাজের কাজ আর শৃঙ্খলার চাপে দম বার করাতেন না। কদাচিৎ মারপিট করতেন (করলেও রাগের মাথায়, ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে নয়)। পারে গিয়ে মাতাল হওয়ার যে দুর্বলতা ছিল নাবিকদের তাকে হাল্কা নজরে দেখতেন। এঁর পর তাদের কর্তা হয়ে এল কি না এক 'প্রচণ্ড আতঙ্ক' — ব্যাপারটা খুব সুবিধের নয়। বোঝা যায় কেন ওদের সবার মুখ হয়ে গেল গম্ভীর আর চিন্তাক্লিষ্ট।

কয়েক মুহূর্ত কাটল উত্তেজিত নিস্তব্ধতায়।

'কী হিসেবে ও "প্রচণ্ড আতঙ্ক"?' জিজ্ঞেস করল কোঁকড়া চুল ডাক্তারের ছোকরা এসিস্‌ট্যাণ্ট। এর কাজের ধরনই এমন যে প্রধান অফিসারের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বাধার সম্ভাবনা সামান্য। ডাক্তার আর রোগীর ঘরের কাজ ঠিক ঠিক করলে ভাবনার ওর কিছুই নেই!

'সব হিসেবেই, ভাই! লোকটা একঘেয়ে কটু কথার রাজা! ব্যাটা টেকুয়া-পাওলা জার্মান, কথার জ্বালায় মাথা ঘুরে যায়। এই মাত্র কেবিনে আমাকে একহাত নিচ্ছিল, টের পেয়েছ বোধ হয়। ওর মোটা মেছো চোখ দুটো নিয়ে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে এমন বকবক সুরু করল, মনে হল বুঝি আর থামবেই না', বর্ণনা দেয় সারেঙ্গ। ব্যারনের গলার স্বর নকল করে বলে, 'আমি এখানে কড়া ব্যবস্থা করব। আমার আমলে জাহাজের কাজকর্ম চলবে অন্য কায়দায়। পারে গিয়ে মাতলামি করলে শাস্তি দেব কঠোর... এইভাবে চলল ঘ্যানর ঘ্যানর... অসুস্থ করার পক্ষে যথেষ্ট।'

'গতকাল যে পাতি অফিসার ওকে 'গোলুব' থেকে লঞ্চে করে নিয়ে এসেছিল সেও ওর সম্পর্কে ভাল কিছু বলেনি। তার মতে লোকটা বিকৃত স্বভাবের, একগুঁয়ে, কথার জ্বালায় জাহাজের লোকগুলোকে মেরে ফেলত', বলল একজন পাতি অফিসার। 'ওর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে 'গোলুব'এর লোকেরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে, এমনি অসহ্য লোকটা... লোকটা মারধর করে না, চাবুকও লাগায় না, কিন্তু শাস্তি দেয় নিজের কায়দায় — খালি পায়ে দাঁড় করায় মাস্তুলের দড়ির উপর কিংবা বসিয়ে রাখে মাস্তুলের ডাণ্ডির উপর।

ওদের মতে সব সময়েই ও লোকের খুঁত ধরে, নিজেকে ভাবে অনেক কিছু, এই ... কি যেন নাম ওর?'

'বেরনিকভ, তাই না?' জার্মান নামটাকে রুশি করে বলল সারেঙ্গ। 'সেই জার্মান ব্যারনদেরই একজন... কিন্তু বুঝতে পারি না নিজেকে ও অনেক কিছু মনে করে কেন, আসলে ব্যাটা ত কিছুই না', কর্তৃত্বের সুরে যোগ করল সে।

'কেন?'

'কারণ ওর যথেষ্ট বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। কথার ধরন থেকেই তা বলা যায়। তাছাড়া, ওর বুঝতেও সময় লাগে। একটু আগেই আমি যখন বললাম বেঁড়ে জাহাজের কুকুর ও হাঁ করে রইল। "কী বলতে চাও?" জিজ্ঞেস করল আমাকে। "এর নিশ্চয়ই একজন মালিক আছে"।'

'কুকুরকে নিয়ে কী ভাবে কথাটা উঠল?' জিজ্ঞেস করল আর একজন।

'বেঁড়েকে দেখে ওনার পছন্দ হয়নি! তখন কী বললে জানো? যুদ্ধ-জাহাজে কুকুর থাকতে দেয়া হয় না, বেঁড়ে ডেক নোংরা করলে তখুনি ওকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেবে ... আরও বলেছে, বেঁড়ে যেন ওর নজরে না পড়ে।'

'কেন এ নিয়ে ওর মাথাব্যথা? বেঁড়ে ত ওর কোন ক্ষতি করেনি।'

'সবতাতেই ওর আপত্তি, নিপাত যাক ও। একটা দুর্ভাগা বোবা জানোয়ারকেও ও রেহাই দেবে না ... হ্যাঁ, ভগবান সত্যিই এবার আমাদের ঘাড়ে একটা উৎপাত পাঠিয়েছেন! জাহাজের সবকিছুই অন্য রকম হয়ে যাবে। স্তেপান স্তেপানভিচ যদি আমাদের কাছে থাকতেন! ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন!' বলে পাইপটা ঝেড়ে পকেটে পুরল সারেঙ্গ।

'মনে হয় ক্যাপ্টেন ওকে শায়েস্তা রাখবে', ডাক্তারের এসিস্ট্যাণ্ট মন্তব্য করল। 'বেশী নষ্টামী করতে দেবে না ওকে। ওকেও সমঝে চলতে হবে। দিনকাল বদলে গেছে... চাষীরা মুক্তি পেতে চলেছে, সবারই এখন আইন-কানুনে অধিকার থাকবে...'

'ক্যাপ্টেনের ত আর সব দিকে নজর দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যাপার হল, প্রধান অফিসারই সরাসরি আমাদের মালিক!' সারেঙ্গ মন্তব্য করল।

'দরকার হলে আমাদের কেউ গিয়ে ক্যাপ্টেনকে বলবে!' জোর গলায় বলল ডাক্তারের এসিস্‌ট্যাণ্ট।

'খুব চালাক তুমি, তাই না? কী করে ভাবছ ক্যাপ্টেন একজন পাতি অফিসার বা আর কারও জন্য তার সহঅফিসারকে অপদস্থ করবে? আসল কথাটা হচ্ছে এই! না হে ছোকরা, আমাদের কারও একজনার অভিযোগে চলবে না। ওতে শুধু কর্তাদেরই ক্ষেপিয়ে তোলা হবে, ফল হবে না এক ফোঁটাও। নিজে শাস্তি পাবে শুধু। আগের দিনে আমাদের নিয়ম ছিল আলাদা।'

'সেটা কী, আকিম জাখারিচ?'

'ধরো কোন অবিচার হল, আমরা নাবিকরা তাকে আর সহ্য করতে পারছি না, উঠেছি মরিয়া হয়ে; তখন নিয়মমাফিক সবাই মিলে এক লাইন বেঁধে সারেঙ্গ মারফৎ সরকারীভাবে অভিযোগটা পেশ করতাম।'

'তাতে কাজ হত কি?'

'ওটা নির্ভর করত ক্যাপ্টেনের উপর। কোন কোন ক্যাপ্টেন ঘটনাটা বিচার না করেই অর্ধেক নাবিকদের চাবুক লাগাত। কিন্তু কেউ কেউ ছিল, সবকিছু শুনে সুবিচার করত। আমার মনে আছে একবার পরিদর্শনের সময় এডমিরাল চাপ্‌লিগিনের কাছে কম্যাণ্ডার জানোজভের নামে অভিযোগ জানাই — লোকটা ছিল জ্যান্ত পশু! নৌবাহিনীতে সেই বছরে আমি প্রথম ঢুকেছি। কী হল জানো? তদন্তের বদলে আমাদের জুটল প্রহার... সারাদিন চাপা কান্না ছাড়া কিছুই শোনা গেল না। সেবার আমি খেয়েছিলাম একশ ঘা বেত। অভিযোগের ফল দাঁড়িয়েছিল ওই! কিন্তু আর একবার আমাদের প্রধান অফিসারের নামে ক্যাপ্টেন চুলকোভের কাছে অভিযোগ করি। এখন উনি এডমিরাল হয়েছেন। সেবার কিন্তু ঘটনাটা অন্য রকম দাঁড়ায়। আমাদের অভিযোগ শোনার সময় উনি সাংঘাতিক ভ্রূ কোঁচকান, কিন্তু কথা দেন ঠিক তদন্ত করে দেখবেন...'

'কথা রেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, হপ্তাখানেক বাদে "অসুখের জন্য" তাকে জাহাজ থেকে চলে যেতে হয়। আমরা আবার মুক্তির নিশ্বাস ফেলি... সেবার আর কোন ঝামেলা হয়নি... কপাল ঠুকে দেখতাম, তবে...'

'তা, যাই বল। আমাদের ক্যাপ্টেন তার নাবিকদের উপর খারাপ ব্যবহার করতে দেবেন না!'

'ক্যাপ্টেনই আমাদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু জাহাজের সবকিছু ত আর ক্যাপ্টেন জানতে পান না। 'টেকুয়া-পাওলা জার্মানটা' আমাদের কথা শুনিয়েই মেরে ফেলবে।'

নতুন অফিসারকে নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলল। শেষটায় ঠিক হল কী ঘটে তার জন্য অপেক্ষা করা যাক। সম্ভবতঃ ক্যাপ্টেনের ভয়ে স্তেপান স্তেপানভিচ জাহাজে যে নিয়ম চালু করেছেন, তা বদলাবার সাহস ও পাবে না। এই ভেবে ওরা কিছুটা আশ্বস্ত হল। এরপর কড়ে আঙুলে পদ্মরাগমণির আংটি-পরা প্রচণ্ড বাবু ছোকরা কেরানী বলল:

'কিন্তু পারে যাবার কী হবে, আকিম জাখারিচ? আমাদের সিঙ্গাপুর দেখতে দেবে ত?'

'এ নিয়ে ও কিছু বলেনি।'

'এ নিয়ে আপনার জিজ্ঞেস করা দরকার, আকিম জাখারিচ।'

'করব।'

'আমার ত মনে হয় সবাই একবার পারে যেতে চায়। সবাই বলে সিঙ্গাপুর জায়গাটি সুন্দর ... এর দৃশ্য যেমন রেস্তরাঁগুলোও তেমন ... আরও শুনেছি কয়েকটা ভাল দোকানও আছে ওখানে ... এ নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলুন, আকিম জাখারিচ। জানি না ওখানে কদ্দিন থাকতে হবে। জায়গাটা দেখার সুযোগ হয় ত আর নাও হতে পারে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রধান অফিসারের ছোকরা চাকর ওশুর্কভ সেখানে ছুটে এসে সারেঙ্গকে বলল:

'আকিম জাখারিচ! প্রধান অফিসার আপনাকে ডাকছেন।'

'কেন বল দেখি?'

'জানিনে। কেবিনে বসে কাগজপত্র দেখছেন উনি...'

'আবার বুঝি বাক্তিমে সুর হয়। কি এক...'

জোরদার একটা গালি ঝেড়ে সারেঙ্গ চলে গেল তলবের জবাব দিতে।

'তুমি কি ঐ নতুন প্রধান অফিসারটির কাছে চাকর হিসাবে থাকবে?' নাবিকরা জিজ্ঞেস করল ওশুরকভকে।

'থাকতেই হবে। করার কিছু নেই... করতেই হবে সহ্য... দেখেই বুঝেছি স্তেপান স্তেপানভিচের বদলীতে ভগবান একটা আপদ পাঠিয়েছেন। এর মধ্যেই ও "শৃঙ্খলার" নামে এক হাত নিতে সুরু করেছে — বলেছে, আমাকে সবকিছু নির্বিবাদে করে যেতে হবে যন্ত্রের মত!'

## ৩

বেঁড়েকে নতুন প্রধান অফিসারের অপছন্দ এবং তাকে জলে ফেলে দেবার শাসানিতে নাবিকদের ভেতর একটা চাপা অসন্তোষ গুমরে উঠল। এই হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতায়, নাবিক জীবনের একঘেয়েমী আর ক্লান্তি দূর করতে এই প্রিয় প্রাণীটি তাদের কতখানি সাহায্য করেছে, তা থেকে তাদের বঞ্চিত করার ধারণায় ওরা অবাক হয়ে গেল। তাছাড়া, ভারি শান্ত আর কৃতজ্ঞ প্রাণী ও। ক্রনস্টাড্টের পথে পথে ভবঘুরের দুঃখ-ভরা জীবনের পর সে আরও আন্তরিকভাবে তার উপকারীদের দয়ার জন্য অনুগত।

এই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ কুকুরটা নাবিকদের শেখান বিষয়গুলি দ্রুত আয়ত্ত করে, কুৎসিত ও অদ্ভুত চেহারা সত্ত্বেও যেসব কৌশলের পরিচয় দিত তাতে ওরা পেত প্রচুর আনন্দ — ওর আশ্চর্য বোধশক্তিতে নাবিকরা অবাক হয়ে যেত। এই সৎ ও সরল নাবিকদের কত আনন্দ আর আমোদই না সে জোগাত! এর ফলে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য তারা ভুলে যেত এই একটানা সাগর পারের কঠোর জীবন আর জন্মভূমি থেকে দীর্ঘ বিচ্ছেদের কথা। পিছনের পায়ে ভর দিয়ে হাঁটত বেঁড়ে, তার চতুর মুখে অত্যন্ত গম্ভীর ভাব। নাবিকদের জন্য সে জিনিষ নিয়ে আসত, উপরে উঠে দাঁড়িয়ে থাকত মাস্তুলের

দাড়ির উপর যতক্ষণ না কেউ চেঁচিয়ে উঠত 'নেবে এস!' কেউ যদি বলত 'চাবুক খাবি, বেঁড়ে?' অমনি সে দাঁত বার করে গোঁ গোঁ করতে থাকত আর যদি বলা হত 'পারে যাবি ?' দাঁত দেখিয়ে ল্যাজ নাড়ত। যেমনি বাঁশী বেজে উঠত আর সঙ্গে সঙ্গে সারেঙ্গের গলা শোনা যেত 'নীচের ডেক ছেড়ে দাও', যে রকম আবহাওয়াই হোক না কেন, খোঁড়াতে খোঁড়াতে পাহারাদারদের সঙ্গে অগ্রমাস্তুলের পুরোবর্তী ডেকে গিয়ে নীচে যাবার সঙ্কেত পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করত সে। ঝড়ের সময় প্রায়ই সে থাকত ডেকের ওপর, নাবিকদের কষ্টসাধ্য কাজের সময় দিত তাদের আমোদ। ভদকা পানের সময় সেও থাকত নাবিকদের কাছে, ডিনারের সময় পিছনের পায়ে ভর দিয়ে তাদের খাবার জায়গার চারপাশে ঘুর ঘুর করে বেড়াত আর তাদের দরাজ হাতে দেওয়া খাদ্যের টুকরোর জন্য ছোট্ট ছোট্ট ঘেউ ঘেউ আওয়াজে ওর কৃতজ্ঞতা জানাত।

ডিনারের পর পাহারাদারদের ছুটির সময় সে ঘুমিয়ে থাকে কোচ্‌নেভের পায়ের কাছে। লোকটা পাঁড় মাতাল — অগ্রমাস্তুলের পুরোবর্তী ডেকের বয়স্ক ও কঠোরমূর্তি নাবিক। এর উপর কুকুরটার মর্মস্পর্শী, আন্তরিক একটা টান। প্রায় সব সময়েই দেখা যায় ওকে কোচ্‌নেভের পাশে, সে ওর পিঠ চাপড়ালে বা আদর করলে ভারি খুশি হয়। রাতের পাহারার সময় সর্ব সময়েই বেঁড়ে থাকে ওর সঙ্গে। কোচ্‌নেভকে যখন জাহাজের অগ্রভাগে পাহারা দিতে হয় সে প্রায়ই কাজ করে বন্ধুর হয়ে। সিধে সেখানে বসে থাকে বৃষ্টিতে ভিজে, বায়ুতাড়িত হয়ে রাতের অন্ধকারে চোখ মেলে চেয়ে থাকে সে — তার ছেঁড়াখোঁড়া কান দুটো সটান ও সতর্ক; ফলে কোচ্‌নেভ তেরপল মুড়ি দিয়ে, বেঁড়ের গায়ের তাপে তপ্ত হয়ে আরামে ঝিমোতে থাকে। পাশ দিয়ে চলে-যাওয়া জাহাজের আলো কিংবা অসাবধানতাবশত আলো-না-জ্বালান বাণিজ্য পোতের ছায়ামূর্তি হঠাৎ দেখতে পেলে ও জোরে ডাক ছেড়ে পাহারাদারের ঘুম ভাঙায়। পারেও সব সময় সে কোচ্‌নেভের সঙ্গী। কাছাকাছি সরাইখানায় যায় ওরই সঙ্গে, ঘণ্টাখানেক সময় পায় স্থানীয় কুকুর সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেশার, প্রায়ই ফিরতে হয় বন্ধুর কাছে ক্ষতবিক্ষত হয়ে, অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে ওরই সঙ্গে। মনোযোগ আর সহানুভূতির সঙ্গে শোনে নাবিকের মাতাল অবস্থার

স্বগতোক্তি, বেশীর ভাগই বিষণ্ণ ধরনের, ল্যাজ নেড়ে বা সস্নেহে দাঁত বার করে দেখায় কৌতূহল। ফেরার পথে, অতিরিক্ত মদ গেলার ফলে কোচ্‌নেভ যখন মূর্ছা যায় তার সঙ্গীরা এসে তাকে না তোলা পর্যন্ত পাহারা রাখে বন্ধুর ওপর। এক কথায়, যে লোক তাকে ঘর ছাড়া ভবঘুরে অবস্থা থেকে, সদা কুকুর-ধরা লোকের ফাঁসের বিপদ থেকে তুলে এনে একটা শান্তিপূর্ণ আশ্রয় দিয়েছে, জাহাজে ব্যবস্থা করেছে প্রচুর খাদ্যের, তার উপর প্রকৃতই অনুরক্ত সে। নাবিকদের মাঝখানে সে লাভ করেছে সুখী জীবন। প্রথম থেকেই ওরা ওকে এমন দয়ামায়া দেখাচ্ছে যা সে আগে ওর জীবনে কখনও জানতে পায়নি।

মনমরা ও অল্প-কথা-বলা কোচ্‌নেভও তার এই খুঁজে-পাওয়া জীবটির উপর খুবই অনুরক্ত। কুকুরটার ভেতর রয়েছে আশ্চর্য সব ক্ষমতা (উচ্চ নৈতিক গুণের কথা ছেড়েই দিলাম)। মাতাল অবস্থায় একমাত্র বেঁড়েকে সে তার মনের কথা খুলে বলে। কী করে কোনো এক শয়তানের দুষ্ট প্ররোচনায় তাকে নৌ-বাহিনীতে 'চালান' হতে হয়েছে, 'সত্যিকারের সম্ভ্রান্ত মহিলার মত' দেখতে তার স্ত্রী, এবং তার মেয়ের তার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা — এইসব কথা বলত সে বেঁড়েকে। আর বেঁড়েও যেন বুঝতে পারে — বিদেশের এই সরাইখানায় বসে, জিনের পর জিন খেয়ে এই গোমড়া-মুখো নাবিকটা যা বলছে তা বড়ই দুঃখের।

একেবারে দৈবক্রমে বেঁড়ের সঙ্গে কোচ্‌নেভের দেখা। ব্যাপারটা ঘটে ক্রনস্টাড্‌টে এক ঠাণ্ডা, বৃষ্টি-ভেজা রবিবারের বিকেলে, 'মগুচি'র বিদেশ যাত্রার দু'তিন দিন আগে। মদে 'ঢোঁস হয়ে' বিচিত্রভাবে পা ফেলে কোচ্‌নেভ যাচ্ছিল সরাইখানা থেকে জাহাজে একটা গলি ধরে। তার নজরে পড়ল নর্দমার পাইপের পাশে গুঁড়ি মেরে-বসা একটা কুকুরের উপর — কাঁপছে শীতে। জানোয়ারটার হতচ্ছাড়া ভাব, বৃষ্টি-ভেজা লোম, প্যাট প্যাট করে বার-হয়ে-থাকা পাঁজরা আর অত্যন্ত কুশ্রী চেহারা বলে দিল ওটা একটা রাস্তার ভবঘুরে কুকুর। ওকে দেখে মাতালটার মনে দয়া হল।

'কার কুকুর রে, তুই?.. ঘরটর নেই বুঝি?' কুকুরটার সামনে গিয়ে ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

কুকুরটা তার বুদ্ধিমান চোখ মেলে মাতালটার দিকে চাইল সন্দেহ নিয়ে — সে কি ছুটে পালাবে অথবা লোকটা চলে যায় কি না দেখার জন্য অপেক্ষা করবে — মনে মনে এই বিচার করতে লাগল। কিন্তু দয়া-ভরা গলায় আরও কয়েকটা কথা শুনে আশ্বস্ত হল সে, করুণ স্বরে গুঙিয়ে উঠল। নাবিক আরও কাছে এগিয়ে এসে ওর মাথায় হাত বুলোতে সে ওর দয়ায় মুগ্ধ হয়ে হাত চাটতে লাগল, গুঙিয়ে উঠল আরও জোরে।

কোচ্‌নেভ তার পকেট হাতড়াতে লাগল। কুকুরটা সাগ্রহে লক্ষ্য করল ওকে।

'নিশ্চয়ই তোর খিদে লেগেছে, ওরে বেচারা জানোয়ার! দাঁড়া, দেখছি আমি... হ্যাঁ, তোর ভাগ্য ভাল — এই যে কিছু আছে দেখছি!' ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা তামার মুদ্রা বার করে বলল সে।

দোকানে গিয়ে একটু বাদেই ফিরে এসে কুকুরটার সামনে রুটি আর নাড়িভুড়ি ছুঁড়ে দিল। মদ খেয়ে যে দুটো কোপেক পড়েছিল তাই দিয়ে কিনে আনল এসব।

কুকুরটা সলোভে লাফিয়ে পড়ল খাবারের উপর। দেখতে না দেখতে সবটা গিলে ফেলে আবার চাইল নাবিকের দিকে আশার চোখে।

'আচ্ছা তাহলে জাহাজে চলে আয়... এতই যখন খিদে তোর। ওখানে ওরা তোকে অনেক খেতে দেবে ... ওদের ভয় পাবারও কিছু নেই, রাতটাও কাটাতে পারবি জাহাজে ... বৃষ্টিতে ভেজায় কী আনন্দ? চলে আয় রে, কুকুর সোনা!'

সাদরে শিস দিতেই কুকুরটা ওরা পিছু নিল। পাটাতনের উপর দিয়ে উঠল জাহাজে। নাবিকটিকে অনুসরণ করে অগ্রমাস্তুলের পুরোবর্তী ডেকে নাবিকদের মাঝখানে এসে পড়ল। নিজের চেহারার জন্য কেমন যেন একটু ভয় আর লজ্জা পেল সে।

'আমি রাস্তার একটা হতচ্ছাড়াকে এনেছি, ভাইসব!' কুকুরটাকে দেখিয়ে বলল কোচ্‌নেভ।

জানোয়ারটার করুণ চেহারায় ওদের মনে জাগল করুণা। তারা ওর গায়ে

চাপড় মারল, হাত বুলোল, তারপর নীচে নিয়ে গেল খাবার দিতে। আকণ্ঠ ভোজনের পর অল্প সময়ের ভেতরেই কুকুরটা ঘুমিয়ে পড়ল রান্নাঘরের কাছে। নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে না পেরে ঘুমের মধ্যেও যেন ঘন ঘন চমকে উঠতে লাগল।

পরের দিন ঘুম ভাঙল উপরের ডেক পরিষ্কার করার আওয়াজে। আতঙ্কে আঁৎকে উঠল সে, কিন্তু কোচ্‌নেভ তাকে এক বাটি পাতলা সুজি এনে দিতে ওর সাংঘাতিক ভয় গেল ভেঙে। নাবিকরা প্রাতরাশে এই সুজি খায়।

একটু বাদে সাফাইয়ের কাজ শেষ হলে কোচ্‌নেভ কুকুরটাকে সঙ্গে করে ডেকে গিয়ে আর সব নাবিকদের কাছে প্রস্তাব করল ওরা ওকে জাহাজেই রেখে দিক।

'আমাদের সঙ্গে চলুক ও', প্রস্তাব করল সে।

আর সবাই মেনে নিলে প্রস্তাবটা। সারেঙ্গকে বলল প্রধান অফিসারের অনুমতি আনার জন্য। অনুমতি পাবার পর সমস্যা দাঁড়াল কী নামে ওকে ডাকা যায়।

প্রত্যেকের নজর পড়ল এই কুৎসিত কুকুরটার উপর। তার ছোট্ট ল্যাজ নেড়ে, আদর-করা নাবিকদের হাত চেটে সে ওদের বন্ধুত্বের জবাব দিল।

'ওরকম ল্যাজ যখন ওর একমাত্র নাম হওয়া উচিত "বেঁড়ে"!' কে একজন বলল।

নামটা পছন্দ হল সবার। সেই থেকে বেঁড়ে 'মগুচির' নাবিকদের একজন হয়ে দাঁড়াল।

বেঁড়ের প্রথম শিক্ষাদাতা কোচ্‌নেভ অদ্ভুত পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রতিভার পরিচয় দিল। হপ্তাখানেকেরও কম সময়ে ধবধবে, নিখুঁত ডেকটির পবিত্রতাকে মর্যাদা জানাতে আর ভাল কুকুরের মত আচরণ করতে শেখাল ওকে। বল্টিক সাগরের খারাপ আবহাওয়ার প্রথম ধাক্কা প্রমাণ করে দিল ওর ভিতরও নাবিকোচিত গুণ রয়েছে। একবারও সে সাগর-পীড়ায় ভুগল না, বরাবরের মত পেট পুরে খেতে লাগল, যে বিশাল ঢেউ জাহাজের পাশে আছড়ে

পড়তে লাগল তা দেখে এতটুকু ঘাবড়াল না। অল্প সময়ের মধ্যে ভদ্র ও বুদ্ধিমান বেঁড়ে জাহাজের প্রতিটি লোকের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল, যা যা করা সম্ভব তাই দেখিয়ে নাবিকদের মাতিয়ে তুলল সে।

আর এখন কি না তাদের এই আশ্চর্য কুকুরটিকে একটা লোক জলে ফেলে দেবে বলছে!

নতুন অফিসারের শাসানিতে কোচ্‌নেভ সবচেয়ে বেশী ঘাবড়ে গেল। স্থির করল 'ঐ টেকুয়া-পাওলা শয়তানটার' সঙ্গে কুকুরটার যাতে দেখা না হয় তার জন্য যা কিছু সম্ভব সবই করবে সে। সুতরাং ঠিক সেই দিনটিতেই ভদকার বাঁশী যেই বেজে উঠল আর বেঁড়েও যথারীতি খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাজির হল ডেকের উপর, কোচ্‌নেভ ওকে ওখান থেকে সরিয়ে নীচু ডেকের সবচাইতে অন্ধকার কোণাটা দেখিয়ে বলল:

'তোমাকে এখানে চুপচাপ থাকতে হবে, বেঁড়ে, নইলে গোলমাল! তোমার খাবার আমি এখানে এনে দেব!'

## ৪

এক মাস কেটে গেল।

এর ভেতর নাবিকরা তাদের নতুন প্রধান অফিসারটিকে ভাল করে জানতে আর তাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতে শিখল। সত্যি বটে এখনও সে কাউকে চাবুক খাওয়ায়নি, মারধর করেনি বা নির্মমতার দিকে কোন ঝোঁক দেখায়নি কিন্তু তার নীচ-মনা, ছিদ্রান্বেষণ প্রকৃতির জন্য, কেউ কোন দোষ করলে তাকে 'অনর্গল কটু কথা শোনান' বা জঘন্যতম শাস্তি দেয়ার জন্য কেউ ওকে কম ঘেন্না করত না। এই শাস্তি হল দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় নাবিকের একমাত্র আনন্দ পারে যাওয়ার ছুটি থেকে তাকে বঞ্চিত করা। আর যেসব শাস্তি সে দিত তা হল নাবিকদের মাস্তুলের দড়ির উপর দাঁড় করান আর মাস্তুলের ডাণ্ডির উপর বসিয়ে রাখা। নাবিকরা যাতে সবচেয়ে অসন্তুষ্ট হত তা হল ওদের প্রাপ্য ভদকা বন্ধ করে দেওয়া।

ব্যারনের এই সব শাস্তি আর জাহাজের নিত্য নৈমিত্তিক কাজকে অক্ষরে অক্ষরে পালনের জন্য তার হৃদয়হীন বৃথা পাণ্ডিত্যে সবাই ওকে যুগপৎ ঘৃণা আর ভয় করত। সবাই অনুভব করত ওরা একটা নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন যন্ত্রের চাপে নিষ্পেষিত। সবচেয়ে জঘন্য এই যে ওরা টের পেত ব্যারন ওদের সত্যি সত্যি ঘৃণা করে, নাবিকদের মনে করে স্রেফ শ্রমশক্তি বলে — এছাড়া, আর কিছুই না। কখনো ওর কাছ থেকে পায় না একটা রসিকতা বা ভালবাসার কথা! সব সময়ে সেই একই প্রাণহীন, একটানা, কর্কশ স্বর যার ভেতর অনুভূতিশীল মানুষ আবিষ্কার করে একটা উদ্ধত ঘৃণা। তার নিরাসক্ত, নীল চোখে সেই একই কঠোর ঝলকানি।

নাবিক হিসেবেও ব্যারনকে কেউ শ্রদ্ধা করে না। অগ্রমাস্তুলের পুরোবর্তী ডেকে (নাবিকদের সেই ক্লাবঘর যেখানে প্রতিটি অফিসারের চরিত্র দক্ষতার সঙ্গে নেতি নেতি করে বিচার করা হয়) স্থির করা হল, 'শ্যেনসম' স্তেপান স্তেপানভিচের চাইতে এ লোকটা একেবারেই আলাদা জাতের এবং আসলে ভীরু। সিঙ্গাপুর ছেড়ে জাহাজ যখন ঝড়ে পড়ে ওর ভেতর প্রকাশ পায় কাপুরুষের লক্ষণ। অভিজ্ঞ নাবিকরা বলে, সর্বকিছুর ভেতর নাক ঢোকান সত্ত্বেও নৌ-বিদ্যা নিয়ে গর্ব করার মত ওর কিছুই নেই। লম্বা মাথাটায় মস্তিষ্ক নেই — লোকটা একগুঁয়ে, ঐ পর্যন্ত। সব মিলিয়ে নাবিকরা কোন ভাবেই ওকে সহ্য করতে পারল না। ওর কথা উঠলেই ওকে বলত 'কটুভাষী', ওর 'উপদেশ' এড়িয়ে চলত অভিশাপের মত।

সুরুতে জাহাজের দৈনিক কাজে সে কিছুটা পরিবর্তন আনার চেষ্টা করল। আগে কুচকাওয়াজটা ছিল একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাপার, ব্যারন ওটাকে বাড়িয়ে তিন ঘণ্টায় দাঁড় করাল। এতে নাবিকদের খুবই কষ্ট হতে লাগল কারণ প্রতিদিন ছ' ঘণ্টা পাহারার কাজ করে তারা যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ, কয়েকদিনের ভেতরেই অবশ্য ওর এই উৎসাহকে ঠাণ্ডা করে দিল সে।

ক্যাপ্টেন যেভাবে এটা করেছিল তার বিবরণ দিল ক্যাপ্টেনের ফুর্তিবাজ ছোকরা চাকর এগোরকা।

'ক্যাপ্টেন "কটুভাষীকে" ডেকে পাঠালেন, বুঝলে কিনা, আর বললেন, "কার্ল ফের্নানদিচ, কখনো এরকম পরিবর্তন করে অনাবশ্যক কুচকাওয়াজে ওদের পরিশ্রান্ত করাবেন না। আগে যেমন ছিল, সবকিছু তেমনি থাকতে দিন।"'

'"কটুভাষী" এর কী জবাব দিলে?'

'সেদ্ধ চিংড়ির মত লাল হয়ে গেল পাষণ্ডটা! "হ্যাঁ, স্যার" বললে সে, "আমি শুধু ভেবেছিলাম এতে কাজকর্মের উন্নতি হবে..." "কিছু মনে করবেন না ব্যারন", ক্যাপ্টেন বললেন, "আপনার পরামর্শ ছাড়াই আমার জানা আছে কাজকর্মের পক্ষে কোন জিনিষ ভাল... কাজকর্মের ভালর জন্যই ওদের দম বার করা ঠিক হবে না। পাহারা আর অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে এমনিতেই ওদের অনেক কিছু করার আছে। তাছাড়া, আমাদের ছেলেরা দিব্যি কাজের লোক, স্বভাবও চমৎকার। সুতরাং এ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে যাবেন না। আপনার কাছে এই আমার একমাত্র বক্তব্য।" "কটুভাষী" কান-কাটা অবস্থায় প্রস্থান করল', উল্লসিত নাবিকদের রসিয়ে দিল এগোর্কা।

সব মিলিয়ে শৃঙ্খলা সম্পর্কে নতুন পথ ও নতুন মত নিয়ে ব্যারন ফন ডের বেরিং 'মগুচিতে' নিজেকে একেবারেই খাপ খাওয়াতে পারল না। উপরওয়ালারা, বিশেষ করে তরুণ অফিসাররা ওকে অপছন্দ করত। এরা সপ্তম দশকের নতুন উদারনৈতিক ভাবাদর্শকে গ্রহণ করেছিল। নীচু ডেকের লোকদের সঙ্গে অধিকতর মানবিক সম্পর্ক রেখে ঐ সব নীতিকে কার্যকরী করার জন্য ছিল ওদের আগ্রহ। ব্যারনের মধ্যযুগীয়, রক্ষণশীল মতবাদের মধ্যে কিছুটা ছিল পুরোনো ও অচল জিনিষ মেশান ছিল। নিজের বিশ্বাসে পূর্ণ আস্থাবান হয়ে সে, যাকে নিজের 'পবিত্র নীতি' বলে, তা জাহির করে, ব্যারন তার গর্বিত ও লোক-দেখান আচরণ এবং উন্মাদ তৎপরতায় অফিসারদের প্রচুর বিরক্তি জন্মিয়েছিল। ওরা ওকে মনে করত নিষ্প্রাণ পণ্ডিতমূর্খ কারণ সে নিজেকে ভাবত ত্রুটিশূন্য আর অপরকে দেখত ব্যারন-সুলভ ঘৃণা নিয়ে। নৌবহরের 'জাতিচ্যুতের দল' যেমন নৌ-চলাচল অফিসার, প্রধান গোলন্দাজ বা প্রধান ইঞ্জিনিয়ার — এরাও ব্যারনকে ভাল চোখে দেখত না। সর্বদা খিটখিটে ও

সন্দেহপ্রবণ, ব্যারনের চমৎকার ভদ্র আচরণের পিছনে এরা দেখতে পেত ওর হামবড়া ঔদ্ধত্য আর আত্ম-প্রাধান্যের ভাব।

ক্যাপ্টেনও একে পছন্দ করেননি।

এই 'জার্মান সসেজটিকে' তার ঘাড়ে চাপানোর জন্য সে এডমিরালের উপর আদৌ কৃতজ্ঞ বোধ করল না। সে অবশ্য এ কথা বুঝতে পারল না যে চতুর এডমিরাল ব্যারনকে 'মগুচিতে' পাঠিয়েছে ঠিক এই কারণে যে 'মগুচির' ক্যাপ্টেন কিছুদিনের ভিতরেই ওকে সরিয়ে দেবে আর এডমিরাল এ ব্যাপারে তার দায়িত্ব এড়িয়ে এই অপ্রিয় লোকটাকে রাশিয়ায় ফেরৎ পাঠাতে পারবে।

অফিসাররা একমাত্র সরকারী ব্যাপার ছাড়া কদাচিৎ ব্যারনের সঙ্গে কথা বলত। 'মগুচির' অফিসারদের বন্ধুত্বপূর্ণ ভ্রাতৃসংঘ থেকে সে যেন বাদ পড়ে আছে। তরুণ নৌ-অফিসাররা ব্যারনকে 'খোঁচা মারার' লোভ সামলাতে পারত না। যারা মহান সংস্কারের তাৎপর্য বুঝতে পারে না সেই সব দাস-মালিক ও রক্ষণশীলদের সম্পর্কে মাঝে মাঝে ওর কানে ঢোকে এমনিভাবে নিন্দা সুরু করত আর প্রশংসা জানাত স্তেপান স্তেপানভিচের, বলত 'ওর সঙ্গে কাজ করে কত আনন্দ পেতাম! অভিজ্ঞ, দক্ষ অফিসার এবং সঙ্গী হিসেবেই বা কী চমৎকার ছিলেন তিনি! নাবিকরা তাকে কত ভালবাসত! তিনিও ওদের কী ভাল বুঝতে পারতেন। ওঁর জন্য কত যত্ন নিয়েই না তারা কাজ করত!'

'এমনকি বেঁড়েও ওঁকে ভালবাসত!' বলে উঠল কোঁকড়া-চুল তরুণ নৌ-অফিসার কশুতিচ। এই 'সম্ভ্রান্ত জার্মান গর্দভটাকে' সে খোঁচা মারতে বিশেষ করে ভালবাসত। 'আজকাল বেঁড়েকে আমরা কোথাও দেখতে পাইনে। নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে সে, কিন্তু কেন?' প্রধান অফিসারের ভয় দেখান সম্পর্কে সবকিছু জেনেই সে একথা বলত।

তুর্কি মুর্গির মত রাগে ফোলা ছাড়া ব্যারন এসব বিদ্রূপে বিশেষ মন দিত বলে মনে হয় না। যেন নিজের অপ্রিয়তার কথা জানা নেই এমনিভাবে আগের মতই একগুঁয়ের জেদি ভাব নিয়ে কাজ করে যেত।

এই এক মাসের ভেতর ব্যারন একবারও বেঁড়ের দিকে ফিরে তাকায়নি যদিও কুকুরটা তাকে দূর থেকে একবার দেখেছে। সে সময় কোচ্‌নেভ ব্যারনকে দেখিয়ে বলেছিল, 'ওর সম্পর্কে সাবধান!' কথাটা এমন আতঙ্কজনকভাবে বলেছিল যে কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে কুঁজো হয়ে বসে পড়েছিল। বেঁড়ের কিন্তু আগের মত সেই সহজ ও স্বাধীন জীবন নেই। সকালবেলা প্রধান অফিসার যখন তার দৈনিক সফরে বার হয়, বেঁড়ে লুকিয়ে থাকে জাহাজের খোলের ভিতর। কোচ্‌নেভ ওকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে দিত যে সেখানেই ওকে বসে থাকতে হবে চুপ করে। এমনকি যখন 'সব হাত' মিলে কাজ চলত তখনও তার ডেকে যাওয়া ছিল নিষিদ্ধ। কোচ্‌নেভের শিক্ষা এমনই সুন্দর যে 'কটুভাষী আসছে' শুনলেই কুকুরটা ল্যাজ গুটিয়ে সবেগে ছুটে গিয়ে কোন গুপ্ত জায়গায় লুকিয়ে পড়ত। কোন নাবিক দরজার পাশ থেকে অভয় দানকারী শিস দিলে তখনই শুধু সেখান থেকে বেরিয়ে আসত।

ব্যারন যখন খেত বা ঘুমোত কেবল তখনই নাবিকরা বেঁড়েকে উঁচু ডেকে নিত। এ সময়টায় সে আগেরই মত আমোদজনক খেলা দেখিয়ে ওদের আনন্দ দিত। 'ভয় পেও না বেঁড়ে,' ভরসা দিত ওরা, '"কটুভাষী" এখন এখানে নেই।' সে যখন অগ্রমাস্তুলের পুরোবর্তী ডেকে খেলা করত তাদের এই প্রিয় পাত্রটিকে বাঁচাবার জন্য পাহারাদার বসাত ওরা। কেবলমাত্র রাত্রিতে, বিশেষ করে গ্রীষ্মমণ্ডলের চন্দ্রহীন অন্ধকার রাতে, দিনের বেলায় যত-খুশি-ঘুমিয়ে-নেয়া কুকুরটা নাবিকদের সঙ্গে ঘুরতে ও খেলা করতে পেত, কিন্তু কোচ্‌নেভের পাহারার সময় আর সে তার সঙ্গী হতে পেত না, সামনের দিকে তাকাত না। চলমান জাহাজের আলো দেখেও আর ডাক ছাড়ত না। কোচ্‌নেভ এখন একাই পাহারা দেয়, পাছে তার আদরের ধনটি 'কটুভাষীর' খপ্পরে পড়ে এই তার সদা ভয়। মনে হয় ব্যারনকে মনেপ্রাণে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে এই বিষণ্ণ নাবিকটি।

এত সব সতর্কতা সত্ত্বেও কিন্তু বেঁড়ের মাথায় বাজ ভেঙে পড়তে দেরী হল না।

## ৫

চীনা সাগরের একটি তপ্ত, উজ্জ্বল দিন। ফিকে নীল আকাশে এক ফোঁটা মেঘও নেই, সমুদ্র মৃতবৎ শান্ত। সকাল থেকে বাতাস পড়ে গেছে, পালগুলো অলসভাবে ঝুলে আছে। ক্যাপ্টেন হুকুম দিল ইঞ্জিন ঘরের বাষ্প চড়িয়ে দিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাষ্প হিস হিস করতে লাগল, সমস্ত পাল নাবিয়ে দিয়ে 'মগুচি' পুরো দমে নাগাসাকির দিকে রওনা হল।

'মগুচি' যাতে ছিমছামভাবে কাঁটায় কাঁটায় নাগাসাকিতে পৌঁছয় এজন্য ব্যারনের বড়ই উদ্বেগ (সেখানে এডমিরাল নৌবহরকে জমায়েত হবার আদেশ দিয়েছেন)। তৃতীয় দফা পরিদর্শনের জন্য বার হয়ে সবকিছুতেই দোষ ধরে আর অনর্গল গালাগালি ঝেড়ে সবাইকে জ্বালিয়ে ছাড়তে লাগল ব্যারন। স্পষ্টই তার মেজাজটা খারাপ যদিও সবকিছুই যথাসম্ভব ছিমছাম। জ্বলন্ত সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় জাহাজটি চকচক, ঝকঝক করছে। একটু আগেই সে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছে, মনটাও ক্ষুব্ধ। ঘেন্নার সঙ্গে ক্যাপ্টেনকে ভাবত 'দুর্বলচিত্ত লোক' বলে, সে তার বহু ধরনের প্রস্তাবের প্রত্যেকটিকেই প্রত্যাখ্যান করেছে অথচ এগুলি অবশ্যই সে করেছিল 'কাজের খাতিরে'। দু' জনার ভেতর সম্পর্কটাও আসছে ক্রমেই শীতল হয়ে। এর উপর আবার ছোকরা অফিসাররা থেকে থেকে তাকে নিয়ে তামাসা করছে এবং তাও এমনভাবে যাতে ওদের বাগে পাওয়া যাচ্ছে না। রাগে টগবগিয়ে উদ্ধতভাবে চিন্তা করতে লাগল সে—এই মুখ্যু রুশী 'গণতান্ত্রিক' লোকগুলোর সঙ্গে তার মত খাঁটি অফিসারের কাজ করা কত কঠিন, প্রকৃত শৃঙ্খলা কাকে বলে তার জ্ঞান ওদের নেই, কর্তৃপক্ষের সম্মান নষ্ট করছে ওরা।

এই চিন্তা মাথায় নিয়ে ব্যারন নীচের ডেকে গিয়ে নিখুঁতভাবে সমস্ত জায়গা পরিদর্শন করে নাবিকদের ঘরের দিকে এগুচ্ছিল, এমন সময় বেঁড়ে হঠাৎ তার পাশ দিয়ে ছুটে উপরের ডেকে চলে গেল।

'আবার সেই জঘন্য জন্তুটা!' বেঁড়ের হঠাৎ আবির্ভাবে চমকে উঠে মনে মনে বলে উঠল সে।

হঠাৎ ঠিক পাটাতনের দরজার নীচে ডেকের একটা বিশেষ জায়গায় তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল, মুখে বিরক্তির ভাব।

একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'ডাক সারেঙ্গকে!'

সারেঙ্গ গরদেয়েভ এসে হাজির হল সঙ্গে সঙ্গে।

'ওটা কী?' ডেকের উপর আঙুল দেখিয়ে ধীরে অথচ কড়া গলায় জানতে চাইল ব্যারন।

সারেঙ্গ ব্যারনের আংটি-পরা লম্বা সাদা আঙুল দিয়ে দেখান জায়গাটা লক্ষ্য করে বিব্রত বোধ করল।

'আমি জানতে চাই, ওটা কী?'

'ক্ষমা করবেন, স্যার, কিন্তু এটা ...'

সারেঙ্গ বিষণ্নভাবে একটা নাম বলল।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে ব্যারন বলে উঠল :

'মনে আছে, তোমাকে কী বলেছিলাম?'

'হ্যাঁ স্যার!' আরও মুষড়ে গেল সারেঙ্গ।

'পাঁচ মিনিটের ভিতর নেড়ি কুত্তাটাকে জলে ফেলে দেবে!'

'আপনাকে জানাতে চাই, স্যার, কুকুরটা অসুস্থ,' শ্রদ্ধা-ভরা অনুনয় জানিয়ে বলল সারেঙ্গ। 'ডাক্তারের এসিস্‌টেণ্ট আজ সকালে ওকে পরীক্ষা করে বলেছেন, ওর পেট খারাপ হয়েছে, কিন্তু ভাল হয়ে যাবে শীগ্‌গির ... অসুখ না হলে কখনো ও এরকম করত না, স্যার!.. দয়া করে ওকে ক্ষমা করুন, স্যার!' সে কুকুরটার হয়ে ক্ষমা চাইল, আবেগে গলা কাঁপছে।

'গরদেয়েভ! বার বার আদেশ দেওয়া আমার অভ্যেস নয়... তোমার এই বাজে কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো না... পাঁচ মিনিটের ভেতর আমাকে জানাবে, আমার আদেশ পালিত হয়েছে ... আর শোনো, ডেকটা পরিষ্কার করে ফেলবে!'

এই বলে ঘুরে চলে গেল সে।

'ছিঃ, নীচ জানোয়ার!' কথাটা বলল ফিসফিসিয়ে কিন্তু সক্রোধে।

উপরের ডেকে গিয়ে কোচ্‌নেভকে দেখতে পেল সে, কোচ্‌নেভ বেঁড়েকে নীচে নেবার জন্য অপেক্ষা করছিল। উত্তেজিত সারেঙ্গ জানাল:

'বিপদ হয়েছে, ভাই... 'কটুভাষী' এই মাত্র বেঁড়েকে ডেক নোংরা করতে দেখেছে আর...'

কথাটা শেষ না করে দুঃখ জানিয়ে মাথা নাড়ল সে।

কোচ্‌নেভ বুঝল এর অর্থ কী। দ্রুত তার মুখের চেহারা গেল বদলে, মাংসপেশী উঠল কেঁপে। কয়েক মুহূর্ত অসীম হতাশায় সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'বেচারা কুকুর — কী লজ্জার কথা!' সারেঙ্গ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। 'কিন্তু ওরকম শয়তানকে নিয়ে কী করা যায়?'

'জাখারিচ!.. জাখারিচ!..' কোচ্‌নেভ অনুনয়-বিনয়-ভরা ভাঙা গলায় বলে উঠল। 'বেঁড়ে অসুস্থ। কুকুরের অসুখ হলে কী করা যায়? খুব বেশী অসুখ বলেই এরকম করেছে ও... ও যে আমার বুদ্ধিমান কুকুর... সব ও বুঝতে পারে... আগে এরকম কাজ ত কখনো করেনি... দিনভর ও 'পায়খানায়' যাচ্ছে। জাখারিচ! দয়া কর... আমি তোমার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি... শয়তানটাকে গিয়ে বল কুকুরটা অসুস্থ!'

'তুমি কি ভাবছ, আমি আগেই বলিনি? আমি কি বেঁড়ের হয়ে কথা কইনি! কিন্তু সে কানই দিল না। হুকুম দিল পাঁচ মিনিটের ভেতর জলে ফেলে দেবে!'

'জাখারিচ!.. দয়া করো ... আবার গিয়ে ওকে বলো ... কুকুরটা অসুস্থ, বলো ওকে!'

'চেষ্টা করব কিন্তু আমার সন্দেহ আছে তাতে কোন কাজ হবে কি না... আস্ত জানোয়ার!..' বলেই আবার সে ছুটল প্রধান অফিসারের কাছে।

ইতিমধ্যে অসুখের ফলে বেঁড়ের আর স্বাভাবিক ফুর্তি নেই, চোখ দুটো রক্তাভ, নির্বোধ — এক ধরনের লজ্জা-পাওয়া বিবেকপীড়িত ভাব নিয়ে কোচ্‌নেভের কাছে এসে তার হাত চাটতে লাগল। স্নেহের উচ্ছ্বাসে কোচ্‌নেভ ওর গায়ে হাত বুলোতে লাগল, তার বিষণ্ণ মুখে একটা অবর্ণনীয় ভালবাসার দ্যুতি।

মিনিটখানেক বাদেই ফিরে এল গরদেয়েভ। তার মুখের বিষণ্ণ ভাব দেখেই বোঝা গেল গিয়ে কোন কাজ হয়নি।

'ও আমাকে নীচে নাবিয়ে দেবে বলে শাসিয়েছে!..' গজ গজ করে উঠল সারেঙ্গ।

'ভাইসব!' অগ্রমাস্তুলের পুরোবর্তী ডেকের নাবিকদের দিকে তাকিয়ে বলল কোচ্‌নেভ। 'তোমরা কি শুনেছ শয়তানটা কী করতে চায়? আমাদের জাহাজের কুকুরকে জলে ডোবাবার কী অধিকার আছে ওর? কে ওকে এ ক্ষমতা দিয়েছে?'

গম্ভীর মুখ উত্তেজনায় জ্বলে উঠল। চোখে ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ।

নাবিকদের মধ্যে উঠল একটা ক্রুদ্ধ গুঞ্জন। শোনা গেল অনেকগুলো গলা:

'ওর শয়তানীর আর শেষ নেই, অভিশপ্ত "কটুভাষীটা"!'

'এরকম করবার কোন অধিকার নেই ওর, ওই জানোয়ারটার!'

'কেন একটা অসহায় জীব জলে ডুবে মরবে?'

'এসো ভাইসব! ওকে আমরা বাঁচাই! চলো যাই ক্যাপ্টেনের কাছে! তিনি ভদ্র, যা সুবিচার তাই করবেন! কিছুতেই তিনি এমন কাজ করতে দেবেন না!' উত্তেজিতভাবে সবেগে চেঁচিয়ে উঠল কোচ্‌নেভ। বুঝি বেঁড়েকে হারাবার ভয়ে সব সময়ে নিজের পাশে ধরে রেখেছে সে।

'চলো যাই ক্যাপ্টেনের কাছে!' কয়েকটা গলা শোনা গেল।

'আকিম জাখারিচ! নাবিকদের লাইন করাও!'

ব্যাপারটা সাংঘাতিক হয়ে উঠছে। আকিম জাখারিচ দুশ্চিন্তার সঙ্গে মাথা চুলকোতে লাগল।

ঠিক সেই মুহূর্তে নাবিকদের প্রিয় তরুণ অফিসার কশ্‌তিচ সেখানে হাজির। অফিসারকে দেখে লোকগুলো চুপ মেরে গেল। সারেঙ্গ সাগ্রহে ওর দিকে তাকিয়ে বলল:

'ব্যাপারটা এরকম, স্যার। প্রধান অফিসার আমাকে হুকুম দিয়েছেন বেঁড়েকে জলে ফেলে দিতে। নাবিকরা বিচলিত হয়ে পড়েছে। আপনি ত জানেন স্যার,

ও কত ভাল কুকুর, দু'বছর ধরে আছে আমাদের সঙ্গে... এখন ব্যাপারটা এই ওর পেটটা হয়েছে খারাপ... এই ওর একমাত্র অপরাধ।'

কী ভাবে গোলযোগের সূত্রপাত তা বুঝিয়ে বলে সারেঙ্গ যোগ করল:

'আমাদের একটু দয়া করুন, স্যার। বেঁড়ের জন্য একটু বলুন... বলুন ওকে রেহাই দিতে...'

আর বেঁড়েও যেন ওরা কী বলছে বুঝতে পেরে অফিসারের চোখের দিকে বন্ধুর মত চাইল, ল্যাজটুকু নাড়তে লাগল ধীরে ধীরে।

'ঐ যে স্যার! বেঁড়েও নিজেই আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছে!'

অফিসারটি এইমাত্র যা শুনল তাতে স্তম্ভিত হল, কথা দিল কুকুরের হয়ে সে কথা কইবে। নাবিকদের উত্তেজনা কমে এল, কোচ্‌নেভের মুখ আশায় উজ্জ্বল।

## ৬

'ব্যারন!' কশুতিচ অফিসারদের ঘরে ঝড়ের মত ঢুকে বলে উঠল, গলায় উত্তেজনা। 'নাবিকরা বলছে আপনার আদেশ ফিরিয়ে নিয়ে বেঁড়েকে ছেড়ে দিতে... লোকগুলো কেন তাদের কুকুরটাকে খোয়াবে?.. কী দোষ করেছে ও, ব্যারন?..'

'এটা আপনার ব্যাপার নয়, কশুতিচ', ব্যারন জবাব দিল। আপনাকে বলছি নিজ পদের কথা স্মরণ রাখতে, নিজের মতামতকে মনে মনে রাখতে। ওকে জলে ফেলা হবে!'

'এই আপনার ইচ্ছে!'

'চুপ করুন!' বলল ব্যারন, মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে এল।

'তাহলে আপনার নির্মমতা দিয়ে নাবিকদের ভেতর একটা হাঙ্গামা বাধাতে চাইছেন?' ঘৃণায় কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে উঠল কশুতিচ। 'বেশ, দেখি আপনি কী করতে পারেন। এই আমি যাচ্ছি ক্যাপ্টেনের কাছে।'

সঙ্গে সঙ্গে সে হাজির হল ক্যাপ্টেনের কেবিনে।

ঐ ঘরে-বসা বাকি অফিসাররা প্রকাশ্য শত্রুর ভাব নিয়ে চাইল ব্যারনের দিকে। তার সাদাটে ঠোঁটে একটা ঘৃণ্য উদ্ধত হাসি, বিমূঢ়ভাবে একটি জুলপীতে হাত বুলোতে লাগল সে।

মিনিট দুয়েক বাদে ক্যাপ্টেনের চাকর ঘরে ঢুকে জানাল ক্যাপ্টেন ওর সঙ্গে দেখা করতে চান।

'কুকুরটার সম্পর্কে এসব কী শুনছি, ব্যারন?' ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ নীরস।

'কিছুই না, স্যার। আমি ওটাকে জলে ফেলে দিতে বলেছি।' উত্তেজনাশূন্য গলায় বলল ব্যারন।

'কী কারণে?'

'আমি লোকদের সতর্ক করে দিয়েছিলাম — কুকুরটা যদি ডেক নোংরা করে আমি ওকে জলে ফেলে দেব। এই মাত্র দেখে এলাম ও তাই করেছে। অতএব, সেই আদেশই দিয়েছি। মনে করি নৌ-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রধান অফিসারের আদেশ কঠোরভাবে পালিত হবে !'

'ওরে জার্মান গর্দভটা!' মনে মনে বলল ক্যাপ্টেন, মুখটা আরও কুঁচকে গেল।

জোরাল গলায় বলল:

'আপনাকে বলছি, ব্যারন। এখুনি আপনার আদেশ বাতিল করুন। ভবিষ্যতে কুকুরটাকে শান্তিতে থাকতে দিন, এই আমার ইচ্ছে। আমার অনুমতিতে ওটা জাহাজে আছে... আমি দুঃখিত, কিন্তু আদেশ আপনাকে বাতিল করতেই হবে। আপনার ওরকম আদেশ দেওয়া আর বিনা কারণে লোকদের জ্বালান উচিত হয়নি।'

'সে ক্ষেত্রে, ক্যাপ্টেন, আমি আপনাকে অনুরোধ করব আমার আদেশ বাতিল করতে কারণ আমার পক্ষে এটা করা অসম্ভব। তাছাড়া...'

'কী?' ক্যাপ্টেন নীরস কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'তাছাড়া, আমি অসুস্থ। প্রধান অফিসারের কাজ থেকে আমি ছুটি চাইছি।'

'তাহলে আপনার রিপোর্ট দিন... সম্ভবত তীরের আবহাওয়ায় আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।'

ব্যারন নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

পরের দিন জাহাজ নাগাসাকিতে পেঁছিতে ব্যারন জাহাজ ছেড়ে চলে গেল। খুশি হল প্রত্যেকে। ওর বদলে এল আর একজন প্রধান অফিসার। নাবিকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ব্যারন চলে যেতে বেঁড়ে ফিরে পেল তার দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন। ওরই জন্য ওরা 'কটুভাষীর' হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে বলে নাবিকদের কাছে সে আরও প্রিয় হয়ে উঠল।

আগেরই মত বেঁড়ে তার বন্ধু কোচ্‌নেভের সঙ্গে পারে যায় আর তাকে পাহারা দেয়। 'পাহারাদারের' কাজ করে সে, খেলা দেখিয়ে নাবিকদের দেয় আনন্দ। 'কটুভাষী আসছে!' শুনলেই নীচু ডেকে ছুট মারে, পুরোনো শত্রুটা আর জাহাজে নেই জেনে সঙ্গে সঙ্গে আবার সেখানে ফিরে আসে।

# বন্ধুদের মাঝখানে

১

যুদ্ধ-জাহাজটির বিদেশ যাত্রার কিছুদিন বাদেই ইভান আর্‌তেমিয়েভ নামে একজন কমবয়েসী নাবিক বর্ষা-ভেজা শেষ শরতের একটি দিনে ঠাণ্ডা লাগিয়ে নিউমোনিয়ায় পড়ল। যুবকটি দেখতে সুন্দর, গালের রঙ গোলাপী, কালো চুল, স্বাস্থ্যে ডগমগ, দুঃসাহসী, কৌশলী উঁচু পালের নাবিক এবং ক্যাপ্টেনের নৌকোর প্রথম মাঝি।

অসুখে ভুগে ভুগে নাবিকটি ক্রমশঃ দুর্বল হতে লাগল। এক মাস বাদে জাহাজটি যখন কয়েকদিনের জন্য ব্রেস্তে থামল, মাত্র পাঁচ বছর হল মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী পাশ-করা জাহাজের ছোকরা ডাক্তার তার রোগীর কালো-

হওয়া বুকটিকে অনেক সময় ধরে পরীক্ষা করল, এক সময় এই যুবক ছিল কত শক্তিশালী, এখন শোচনীয়ভাবে রক্তশূন্য, পাতলা চামড়ার ভিতর দিয়ে পাঁজরা দেখা যায়। পরীক্ষার পর ডাক্তার ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করল, আরতেমিয়েভকে জাহাজ থেকে নাবিয়ে ব্রেস্তের নৌ-হাসপাতালে ভর্তি করান উচিত।

'ওর অবস্থা কি এতই খারাপ, ডাক্তার?' ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ স্যার, খুবই খারাপ ... এ হল ত্বরিৎ যক্ষ্মা।'

'ভাল হবার কোন আশা নেই?'

'আমার মতে, মোটেই না!' খুব তরুণ ডাক্তারদের ভেতর যা দেখা যায় সেই আত্মগত ভাব নিয়ে বলল সে, আরও গম্ভীর হয়ে উঠল।

'অপরিচিতের মধ্যে ওকে মরতে পাঠান একটা লজ্জার ব্যাপার ... কিন্তু কীই বা আর করা যায়? আর যাই হোক, আমাদের এই রোগীর ঘর থেকে তীরে সে ভাল থাকবে। আমার ত মনে হয় রোগীর পক্ষে জায়গাটা সুবিধের নয়, কী বলুন?'

'কঠিন অসুখের জন্য ভাল নয়। ঘর অত্যন্ত ছোট, হাওয়া চলাচল নেই, সুখসুবিধেও কম ...'

'ঠিক তাই ... আপনি কি আর্‌তেমিয়েভকে এর মধ্যে বলেছেন?'

'না, এখনো বলিনি। কিন্তু আজই বলব। আপনি অনুমতি দিলে কালই ওকে হাসপাতালে নিয়ে ফরাসী ডাক্তারদের হাতে দেব।'

এই আলোচনার ঘণ্টাখানেক বাদে কিছুটা দুর্বলচিত্তে কিন্তু ভাবটা গোপন করে, ডাক্তার সামনের ডেকের পরিচ্ছন্ন ছোট্ট কেবিনটিতে ঢুকল। দরজার ভিতর দিয়ে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও নীচু ছাতওলা ঘরটির বাতাস স্যাঁৎসেঁতে আর গুমোট। ভিতরে ওষুধের একটা তীব্র গন্ধ। কেবিনে চারটে বাঙ্ক, প্রত্যেক পাশে দুটো করে — একটার উপর আর একটা সাজান। তিনটে বাঙ্কই খালি, কেবল নীচের চার নম্বর বাঙ্কে জাহাজের পার্টিশনের দিকে মাথা ঘুরিয়ে শুয়ে আছে রোগীর ঘরের একমাত্র বাসিন্দা দক্ষ নাবিক ইভান আর্‌তেমিয়েভ।

চোখ মেলে শুয়ে আছে সে — টানা, কালো, উজ্জ্বল চোখ — তাতে সেই গভীর বিষাদের দৃষ্টি যা দেখতে পাওয়া যায় দুরারোগ্য ব্যাধিতে দীর্ঘকাল-ভোগা মানুষের চোখে। টিকলো নাক এবং বাহ্যতঃ স্বচ্ছ নাসারন্ধ্র, লম্বা হাড়ওলা চিবুক না-কামান দাড়িতে কালো হয়ে আছে, ক্ষয় রোগের স্বভাবসিদ্ধ ডগডগে লালিমাসহ বসে-যাওয়া গাল, সুস্পষ্ট বেরিয়ে-আসা চোয়ালের হাড় ও শুকনো, ফোলা ঠোঁটসহ উদভ্রান্ত কালো মুখ শান্ত ও সুন্দর কিন্তু মৃতবৎ পাণ্ডুর। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় কয়েক দিন আগেকার এই সবল, স্বাস্থ্যবান দেহের উপর মৃত্যু ওঁৎ পেতে আছে।

এ সময়ে ডাক্তারকে আসতে দেখা তার পক্ষে অস্বাভাবিক। বালিশের ওপর থেকে মাথা তুলল সে। রোগীর চুল ঘামে ভেজা — আবার মাথাটা নাবিয়ে নিল সে। দীর্ঘ, কৃশ আর শীর্ণ আঙুল দিয়ে মোটা পশমী কাপড়ের সাদা বিছানা-ঢাকার প্রান্ত মোচড়াতে মোচড়াতে ডাক্তারের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল, চোখে একটা ভীত, প্রশ্ন-ভরা সন্দেহজনক চাউনি।

‘কী ভাই, জ্বরটা এখনো ছাড়ল না?’ গলার স্বরটাকে হাল্কা ও সহজ করার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করল ডাক্তার। এইভাবে সে আর্‌তেমিয়েভকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি হল ওর আতঙ্কিত ভাব দেখে।

‘ছাড়েনি, স্যার, কিন্তু মনে হচ্ছে অন্যদিক থেকে আমি ভাল আছি, ভেতরে জ্বালাযন্ত্রণা নেই,’ আগ্রহভরে উত্তর দিল আর্‌তেমিয়েভ।

দৃষ্টিটা তখনো সন্দেহ-ভরা, সন্ধানী। ডাক্তারের দিকে চেয়ে দ্রুত বলে চলল:

‘যদি এই জ্বরটুকু চলে যায়, স্যার, তাহলেই আমি আবার শক্তি পাব… কিন্তু এটা যাচ্ছে না।’

তার শূন্য কণ্ঠে একটা আশার সুর ছিল। এটা স্পষ্ট যে আসলে সে যতটা দুর্বল তার চাইতে কম দুর্বল দেখাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। মনে হল, তার সম্পর্কে ডাক্তারের অভিসন্ধিতে কেমন যেন একটা সন্দেহ এসেছে, তাই ডাক্তারকে বোঝাবার চেষ্টা করছে সে।

অমায়িক, দয়াপ্রবণ, মস্কোবাসী এই ডাক্তারটি এখনো তার কাজে এমন

ঝানু হয়নি যাতে সে মানুষের কষ্টে অবিচলিত থাকতে পারে। বিচলিত অবস্থাটা ঢাকবার জন্য সে মাথা নীচু করল, একটু কাশল এবং রোগীর কালো, অনুসন্ধানী চোখ এড়াবার জন্য আগের মত জোর-করা ফুর্তির হাল্কা ভাব নিয়ে বলতে লাগল:

'ঐটেই আসল কথা। তোমার ঐ জ্বরটাকে আমাদের তাড়াতে হবে... তবে জেনো তোমাকে আমরা ঠিক ভাল করে তুলব...'

এক মুহূর্ত থামল সে। তারপর চেয়েই দেখতে পেল রোগীর দৃষ্টিতে আনন্দ আর বিশ্বাস।

এই দৃশ্যের পর তার মনে পীড়াদায়ক অনুভূতি জাগা সত্ত্বেও সে আরও বেশী আস্থা ও আনন্দ নিয়ে বলতে লাগল:

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ভাল হয়ে যাবে আর আগেরই মত সুন্দর শক্ত সবল হয়ে উঠবে। কিন্তু এখন যা তোমার দরকার তা হল তীরে কিছুটা বিশ্রাম। সুস্থ হবার পক্ষে আমাদের জাহাজটা ভাল জায়গা নয়। বুঝতে পারছ কী বলতে চাইছি?'

'তীরে? কোন তীরে?' যেন স্তম্ভিত হয়ে, ভীত, করুণ কণ্ঠে রুগ্ন লোকটি ফিস ফিস করে বলল।

'কেন, এখানে এই ব্রেস্তে। নৌ-হাসপাতালে... সুন্দর হাসপাতাল এটা। ও'রা তোমাকে সত্বর ভাল করে তুলবেন... আর তুমি ভাল হয়ে উঠলেই তোমাকে ওরা ক্রনস্টাড্‌ট পাঠিয়ে দেবেন। তখন তুমি নিজের দেশে, নিজের গ্রামে ফিরে যেতে পারবে... আমি এ জন্য তোমাকে একখানা সার্টিফিকেট দেব।'

ডাক্তার ভাবল কথাটা বেশ ভাল হল শুনতে, কিন্তু তার প্রথম কয়েকটি কথার পর তরুণ নাবিকের মুখে এমন একটা আতঙ্কজনক মর্মান্তিক ভাব ফুটে উঠল যে তার বক্তব্যটা যে-রকম বাহ্যিক আনন্দময় আন্তরিকতার সঙ্গে সে শুরু করেছিল তার বদলে শেষ করল সম্পূর্ণ অন্য সুরে।

যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে এমনিভাবে অসুস্থ লোকটি কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল।

পরে আর্ত অনুনয় জানিয়ে বলে উঠল:

'উঃ, স্যার! দয়া করুন! আমাকে পারে পাঠাবেন না। এখানে থাকতে দিন! ভগবানের নামে আপনাকে প্রার্থনা জানাচ্ছি, স্যার!'

ডাক্তার ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল। তীরে সে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে কিন্তু জাহাজে থাকলে কদ্দিন অসুখ চলবে ভগবান জানেন।

'ও, স্যার! দয়া করুন... আমি সারব না এই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছে, আমাকে অন্ততঃ নিজেদের লোকের ভিতর মরতে দিন, বিদেশে নয়, স্যার!'

'উত্তেজনায় সে কাশতে লাগল। বুক থেকে উঠতে লাগল একটা আতঙ্কজনক ঘড় ঘড় শব্দ। টানা সুন্দর চোখ দুটিতে এমন একটা মরিয়া অনুনয়ের দৃষ্টি নিয়ে ডাক্তারের দিকে চাইল যে তরুণ ডাক্তার বাহ্যত বিচলিত হয়ে উঠল।

'কিন্তু শোনো, আর্তেমিয়েভ... পারে তোমার পক্ষে ভাল হবে!..' আবার সুরু করল সে।

'ভাল? বিদেশীদের মাঝখানে? কী করে, স্যার। নিঃসঙ্গতায় আমি যে মরে যাব। এখানে অন্তত বন্ধুদের মধ্যে আছি। দয়ামায়া নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবে এরা। কিন্তু ওখানে? আমাকে ওরকম করবেন না, স্যার। আমাকে থাকতে দিন! সত্বর আমি ভাল হয়ে উঠব, দেখবেন আপনি। গরমের দেশে গেলেই আমি আগের মত সমর্থ নাবিক হব,' তার অসুস্থ অবস্থা এবং সে যেমন ভালো, উদ্যমী নাবিক ছিল তেমনটি আর নেই বলে যেন ক্ষমা চাওয়ার মত অনুনয় জানাল সে।

এই যুক্তিতে বিচলিত হল ডাক্তার, তার সিদ্ধান্ত কত নিষ্ঠুর বুঝতে পেরে সদয়ভাবে বলল:

'আচ্ছা, আচ্ছা, অস্থির হয়ো না। যদি না যেতে চাও যেয়ো না।'

আর্তেমিয়েভের বিবর্ণ মুখে একটা সানন্দ, কৃতজ্ঞ হাসি ফুটে উঠল। আবেগ নিয়ে সে বলল:

'যদ্দিন বেঁচে থাকব, আপনার দয়ার কথা ভুলব না, স্যার।'

অতএব ডাক্তার ফিরে গেল ক্যাপ্টেনের কেবিনে, তরুণ নাবিক মরিয়া হয়ে

যে যুক্তি দেখিয়েছে জানাল সে কথা এবং শেষ পর্যন্ত তাকে জাহাজে রাখারই অনুমতি চাইল।

ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে এই মন্তব্য করল:

'শীগগিরই আমরা পৌঁছব গ্রীষ্মমণ্ডলে ... আশ্চর্য আবহাওয়া ওখানকার ... হতে পারে তাতে ওর ভাল হবে। কী বলুন, ডাক্তার?'

'বলতে দুঃখ পাচ্ছি কিন্তু কোন কিছুই এখন আর বেচারাকে ভাল করতে পারবে না। ওর দিন ঘনিয়ে এসেছে!' তার পেশাগত মতামত সম্পর্কে ক্যাপ্টেনের সন্দেহ আছে ভেবে ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়ে প্রত্যয়ের সঙ্গে সে জবাবটা দিল।

'কিন্তু নাবিক ছিল ও কী চমৎকার!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্যাপ্টেন।

## ২

আর্তেমিয়েভকে তীরবর্তী ফরাসী হাসপাতালে পাঠাবার কথা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে জাহাজেই থাকতে দেওয়া হয়েছে, অগ্রমাস্তুলের পুরোবর্তী ডেকে জাহাজ জীবনের সব ঘটনার যেখানে আলোচনা হয়, নাবিকদের সেই ক্লাবঘরে খবরটা পৌঁছতে সবাই আন্তরিক খুশি হল।

চারদিক থেকে এরকম মন্তব্য শোনা গেল:

'বেচারাকে যদি মরতেই হয়, এখানে বন্ধুদের মাঝখানেই মরুক, কুকুরের মত অচেনা গর্তে পড়ে নয়!'

'সত্যি কথা... এত জলে ফেলে দেওয়ার সামিল!'

'এখানে ত ওকে দেখবার লোক আছে কিন্তু সেখানে তাদের একটি বর্ণও ও বুঝতে পারবে না।'

'তার উপর যাজকও নেই। ভেবে দেখো বিধর্মীর মত মরা কী জিনিষ...'

'ডাক্তার কী করে এ কথা ভাবতে পারল! ওকে ফরাসীদের হাতে সঁপে দেওয়া! অথচ কী ভালো ছেলে ও!'

'সত্যি, অদ্ভুত ব্যাপার ...'

'বয়েসটা খুবই কম, ঐতেই যত বিপদ। ও যদি ভেবে থাকে রুশি নাবিক বিদেশে মরতে চায়, তাহলে ওর বিশেষ বুদ্ধিশুদ্ধি আছে বলে মনে হয় না। ভদ্দর লোকের বেলা এটা খাটতে পারে কিন্তু নাবিকরা কখনো তা চাইবে না', ঘরে-তৈরী তামাক দিয়ে ভর্তি তার ছোট্ট পাইপটা ধরিয়ে, যে জলের টবের চারপাশে নাবিকরা জমায়েত হয়েছিল তার উপর হেলান দিয়ে বুড়ো পাতি অফিসার আর্খিপভ কর্তৃত্বের সুরে বলল কথাটা।

পাইপটা ধরিয়ে জোরের সঙ্গে ওজন দিয়ে কথাটা যোগ করল:

'হুঁ! লেখাপড়া জানা চতুর লোক বটেন, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি পাকেনি। ভেবে দেখো একটা লোককে পাঠাচ্ছে ফরাসীদের কাছে! ও নিজেই একজন ফরাসী এটা প্রকাশ পেলেও অবাক হব না।'

এই মন্তব্যে সবাই একটু চুপচাপ করে রইল, যেন ছোকরা ডাক্তারের অদ্ভুত আচরণের একটা কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে। পাতি অফিসার আর্খিপভের মত গণ্যমান্য ব্যক্তির মুখ থেকে যে কথা বেরিয়েছে তা, বলতে গেলে, সমস্যা সমাধানকারী সূত্রের মত। জাহাজের লোকরা ওকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

সেদিন থেকে জাহাজের এই দয়ালু ডাক্তারটির বানান নাম হল 'ফরাসী'।

'ইগ্নাত স্তেপানিচ, ইভান আর্তেমিয়েভ মরতে বসেছে, একি সত্যি?'

কথাটা জিজ্ঞেস করা হল ডাক্তারের এসিসটেন্টকে। সে সেইমাত্র ওদের কাছে হাজির হয়েছে। প্রশ্নকারী রিয়াব্কিন, দেখতে কালো, সুগঠন, মাঝবয়েসী, ভাল মানুষের মত মুখ আর নীল নাক — জীবনের প্রধান ত্রুটির চিহ্ন। জাহাজে তার তিন রকমের খ্যাতি: ভাঁড়, রসিক ও গল্প বলিয়ে। এছাড়া, সে ছিল দুঃসাহসী নাবিক, উঠত একেবারে উঁচু পালের কিনারাতে, আর ছিল পাঁড় মাতাল ও দুশ্চরিত্র। পারে জাহাজ ভিড়লে সে শুধু তার শেষ কপর্দকটি পর্যন্তই মদ গিলত না, বাকি সবকিছুই শেষ করত।

ডাক্তারের এসিসটেন্টের বয়স প্রায় চল্লিশ, চুলগুলো গাজরের মত, ব্রণক্ষত, ছুলিবোঝাই বিশ্রী মুখ কিন্তু তবু ক্রনস্টাড্টের পরিচারিকাদের কাছে নিজেকে

সে অপ্রতিরোধ্য ডন জুআন বলে ভাবে। ডাক্তারদের কাছ থেকে নকল-করা গম্ভীর ভাব নিয়ে, কোটের ভাঁজে বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে কিছুটা আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলল:

'যক্ষ্মা ... কিছু করার নেই।'

'কী বলছ? ক্ষয়রোগ?'

'দু'রকমের আছে, একটা নিউমোনিয়া আর একটা যক্ষ্মা। কিন্তু এসব তোমাদের মাথায় ঢুকবে না। একমাত্র বিশেষজ্ঞ ওটা ধরতে পারে!..' বলল সে। (এ ধরনের কথার কায়দায় সঙ্গীদের সে চমকে দিতে ভালোবাসত।) 'আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি ওর দিন ঘনিয়ে এসেছে।'

'সত্যি?' রিয়াব্‌কিন ধরা গলায় বলল।

'হ্যাঁ, ভাই! যক্ষ্মা নিয়ে ইয়ার্কি নয়। ঘোড়াকেও সাবাড় করে, মানুষ ত বটেই।'

'আহা বেচারা! কী ভালোই না ছিল ও!' বলল রিয়াব্‌কিন, মুখের অভ্যস্ত হাসিটুকু গেল মিলিয়ে।

উপস্থিত সব নাবিকরাই আর্‌তোমিয়েভের জন্য দুঃখ পেল।

'ওকে মারবার জন্য এত ব্যতিব্যস্ত হয়ো না!' মন্তব্য করল বুড়ো পাতি অফিসার জোরাল গলায় গুরুত্বের সঙ্গে। 'কে বলতে পারে? তোমরা যা বলছ তা সত্ত্বেও ভগবান ওকে ভাল করতে পারেন।'

'আমি কী বলছি, প্রশ্নটা তা নয়। আমার একমাত্র ইচ্ছে ও ভাল হয়ে উঠুক। এটা আমার কথা নয়, বিজ্ঞানের কথা!'

'বি-জ্ঞান!' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল আর্‌খিপভ। 'ঈশ্বর যদি ইচ্ছে করেন তোমাদের এই বিজ্ঞানকে নস্যাৎ করে দিতে পারেন...'

পাইপটা পকেটে গুঁজে ধীরেসুস্থে চলে গেল সে।

ডাক্তারের এসিস্‌টেণ্ট শুধু ঘাড়টা কোঁচকাল, যেন এটাই বলার উদ্দেশ্য: 'তোমার মত লোকের সঙ্গে কথা বলে কী লাভ!'

## ৩

পক্ষকাল বাদে জাহাজটা ভেসে চলল গ্রীষ্মমণ্ডলের সমুদ্রে, গতি দক্ষিণে। আবহাওয়া চমৎকার — আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই। অবাধ ও একটানা প্রাণ-জুড়োন বাতাস আর সমুদ্রের সতেজ আর্দ্রতা গ্রীষ্মমণ্ডলের উত্তাপকে দমন করছে।

জাহাজ তার সব পাল মেলে সাত বা আট নটে মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে। নাবিকরা ঠিকই বলে থাকে যে অনুকূল আয়ন বাতাসে গ্রীষ্মমণ্ডল অঞ্চলে জাহাজ চালান 'ছুটি' উপভোগেরই মত। সত্যিই এটা ওদের বিশ্রামের সময়। পাল ঠিক করার জন্য কখনো তাদের একটি পাও নড়তে হয় না। সমুদ্রে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ সময় এটা! পালা করে ওরা পাহারা দেয়—পাহারার কাজও যতদূর সম্ভব প্রীতিকর। সব সময় ঝড় বা খারাপ আবহাওয়ার জন্য সতর্ক থাকতে হয় না, পাল গুটোন বা পাল টাঙাবার হাঙ্গামা নেই—এক কথায়, সব সময় উচ্চাটন থাকতে হয় না। পাহারার সময় কিছুই করার নেই, বসে বসে গল্প আর তাদের বহু দূরের ঘরবাড়ির স্মৃতি মন্থন। সেই সুদূর গ্রীষ্মমণ্ডলে কখনো বা তিমির জলের ফোয়ারা তোলা উপভোগ করা কিংবা উড়ুক্কু মাছকে সূর্যালোকে চক চক করতে দেখা: ক্ষুদে পেট্রেল তীর ছেড়ে বহু দূর দিয়ে উড়ে চলেছে, বরফ-সাদা বিরাট আলবেট্রস বা ফ্রিগেট পাখিরা উড়ছে আকাশের সুউচ্চ স্বচ্ছ বুকে। আর অগণিত ঝিকিমিকি তারা বোঝাই মোহময়ী গ্রীষ্মমণ্ডলের রাতে নাবিকরা ঘুমোয় ডেকের উপর আর পাহারাদাররা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মনের কথা বলে বা ওস্তাদ গল্প বলিয়ের কাহিনী শুনে রাত কাটায়।

তরুণ পাহারা অফিসার হাল্কা, সাদা ইউনিফর্ম পরে ব্রিজের উপর পায়চারি করছে। চলমান জাহাজের আলো দেখবার জন্য তার দৃষ্টি দিগন্তে প্রসারিত। বুক ভরে ঠাণ্ডা বাতাস নিচ্ছে আর স্মৃতির মোহে নিজেকে মগ্ন করে স্বপ্নাকুল হয়ে চিন্তা করছে। দীর্ঘ পায়চারিতে ক্লান্ত হয়ে রেলিংএর হাতলের উপর ভর দিচ্ছে সে। একমাত্র নাবিকদের দ্বারা যা সম্ভব সেইভাবে চোখ খোলা রেখেই একটু

ঝিমিয়ে নিয়ে আবার পায়চারি সুরু করছে। আবার তার মন ভেসে যায় বন্ধু ও প্রিয়জনের কাছে — দূরে, বহু দূরে কিংবা একজোড়া সুন্দর চোখের কাছে, যে চোখ এই সমুদ্রের বুকে আরও অপরূপ মনে হচ্ছে। কখনও সে ভাবে একটি ছোট্ট হাতকে, তাতে লম্বা আর কৃশ আঙুল, কোমল সাদা হাতটিতে ফুটে আছে নীল শিরাগুলি—একখানা ছোট্ট হাত যাতে একটু আগেও ক্রনস্টাড্টে সে লুকিয়ে চুমো খেয়েছে ... যারা অনেক দিন তীরে নাবেনি, এই গ্রীষ্মমণ্ডলের সোহাগ-ভরা রাতে তাদের পক্ষে ভাবালু হওয়াই স্বাভাবিক।

জাহাজটি মৃদু দোল খেতে খেতে রাতের অন্ধকারে পাড়ি জমিয়েছে। তর তর করে, স্বচ্ছন্দে সাগরের বুক কেটে এগিয়ে চলেছে সে, উঠছে একটা মৃদু হিস হিস শব্দ আর জল বিক্ষিপ্ত হচ্ছে হাজার হাজার উজ্জ্বল চূর্ণে — পিছনে পড়ে আছে অনুপ্রভ আলোকে ঝিকিমিকি মুক্তা-সদৃশ প্রশস্ত পথ।

গ্রীষ্মমণ্ডলে জাহাজ ভ্রমণের যে নীরব মাধুর্য কখনো কখনো প্রবল ঝড় আর মুষলধার বৃষ্টিতে তা বিঘ্নিত। পাহারা অফিসার এই প্রচণ্ড বাত্যার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। দূরবীণের ভিতর দিয়ে একটু আগেও অত পরিষ্কার দূর দিগন্তে হঠাৎ দেখতে পায় একটা ধূসর রঙের ছোট্ট টুকরো। সেই টুকরোটা ত্বরিৎগতিতে বড় হতে হতে ঝড়ের মেঘ হয়ে ওঠে, রৌদ্রোজ্জ্বল বৃষ্টির কাৎ-হওয়া ধূসর স্তম্ভের সঙ্গে সমুদ্রে মিশে যায়। মেঘ আর ধূসর এই চওড়া স্তম্ভ জাহাজের উপর ছুটে আসে। সূর্য অদৃশ্য, সমুদ্র কালো, বাতাস গুমোট ও তপ্ত। মেঘ এগিয়ে আসে কাছ থেকে আরও কাছে ... জাহাজ এই আকস্মিক আগন্তুককে গ্রহণের জন্য তৈরী হয়। নীচের বড় পালগুলো সংকুচিত, উঁচু পাল গুটোন, ঝড় ছুটে আসে ওর দিকে, ঢেকে দেয় ধূসর কুয়াশায়, জাহাজটাকে এ কাৎ ও কাৎ করতে থাকে, কিছু সময়ের জন্য প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলে, বৃষ্টির প্রলয়ে নাবিকদের দেয় ডুবিয়ে — তারপর আবার ছুটে চলে যায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কালো মেঘ আর বৃষ্টির স্তম্ভ দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে যেতে থাকে যতক্ষণ না তারা আবার ডান পাশের উল্টো দিগন্তে একটা ক্ষুদ্র টুকরোয় পরিণত হয়।

আবার জাহাজের উপর ফুটে ওঠে প্রসন্ন স্বচ্ছ নীল আকাশ। বাতাসে একটা

উপাদেয় সজীবতা। জাহাজটি পূর্ণ পালে সেই একই ধরনের একটানা মৃদু আয়ন বাতাসে আগেরই মত এগিয়ে চলে। নাবিকদের সার্ট শুকিয়ে যায় চটপট, কেবল পালের দড়ির উপর বৃষ্টির ফোঁটা চক চক করতে থাকে। ইতিমধ্যে নতুন-খাটান চাঁদোয়া চোখ-ধাঁধান রশ্মি থেকে নাবিকদের মাথাগুলোকে ছায়া দেয়।

আর্তেমিয়েভ একটু সুস্থ। আগের মত ঘন ঘন আর জ্বর হয় না তার। বোধ করে অপেক্ষাকৃত সবল, ভাল খিদে নিয়ে অফিসারদের খাবার খায় আর রোজই দু'গ্লাস করে মদিরা পান করে। ডাক্তারের নির্দেশ মত সকালে তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। জাহাজের পাশে ঝোলান দোলনার উপর শুয়ে থাকে সারাদিন। এখান থেকে সকালবেলাকার ডেক পরিষ্কার, অন্যান্য কাজ ও কুচকাওয়াজ দেখে, শোনে অফিসারদের হুকুম আর সারেঙ্গের রংদার গালিগালাজ। তাকে দেখতে-আসা নাবিকদের সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে। নূতনত্বের একটা মোহ-ভরা এই সব দৃশ্য যেন তাকে তন্ময় করে রাখে। কখনো বা সূর্যালোকে উদ্দীপ্ত সমুদ্রের অপার বিস্তৃতি ও নীলকান্ত আকাশের দিকে চেয়ে থাকে অপলক, চেয়ে থাকে আর চিন্তায় ডুবে যায়, যেন প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর চিন্তা ও দীর্ঘ অসুস্থতা থেকে জন্ম নেওয়া অদ্ভুত নতুন ভাবনার যে রহস্য তার উত্তর খুঁজে বেড়ায় সে।

কখনো সে বাড়ির কথা ভাবতে থাকে—সুদূর রাশিয়ায় তার সেই ধোঁয়া-ভরা কুটির-সর্বস্ব দারিদ্র্য-পীড়িত ছোট্ট গ্রাম, সেখানকার চাষীদের কঠোর জীবন আর সেই গভীর বন যেখানে বাবার সঙ্গে প্রায়ই যেত 'ঈশ্বরের গাছ' কাটার জন্য। ঐ গাছগুলোকে কোন কারণবশতঃ সরকারী সম্পত্তি মনে করা হত। এই সব চিন্তা তার মনকে গভীর ভারাক্রান্ত করে তোলে, দুঃখ পায় গ্রামীণদের জন্য, চাষীদের দুর্দশায় ক্লিষ্ট বোধ করে, প্রশ্ন জাগে ঈশ্বর কেন প্রত্যেকের উপর সমান করুণাময় নন। পরে আবার সে আবিষ্ট হয় স্বপ্নালু চিন্তায়—চেয়ে থাকে সুন্দর নীল আকাশের দিকে, ঐ আকাশ যেন জীবন-রহস্যের উত্তর দিতে পারবে ...

প্রায়ই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় সে। অল্প সময় ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে। এই সব স্বপ্নে আবার সে সবল, সুদৃঢ় নাবিক হয়ে ওঠে, যেন সে ছুটে চলেছে উপরে উঁচু

পাল গুটোবার জন্য অথবা ক্যাপ্টেনের ছিমছাম নৌকো চালাবার জন্য দাঁড়ের উপর ভর দিয়ে আছে ...

তার পর হঠাৎ জেগে, দুঃখ নিয়ে উপলব্ধি করে তার অসহায় অবস্থার কথা, করুণভাবে তাকায় তার রক্তশূন্য হাতের দিকে, হাত বুলোয় তীক্ষ্ণভাবে স্পষ্ট হওয়া পাঁজরার উপর আর ধীরে ধীরে আরোগ্য হওয়ার জন্য ডাক্তারকে দোষী করে। প্রতিদিন সকালে মর্মস্পর্সী সরলতা নিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায় ওকে ভাল করে দেবার জন্য।

এই উষ্ণ অঞ্চলেও কিন্তু সে ভাল হয়ে উঠল না। ক্রমে বেশী খিটখিটে ও অস্থির হয়ে উঠল অথচ মৃত্যুর কথা একবারও মনে হল না তার। তখনো তার আশা জ্বর সেরে যাবে, শেষ পর্যন্ত সে আবার সবল হয়ে উঠবে।

যা তাকে বিভ্রান্ত করত তা হল প্রত্যেকের এখন ওর উপর আগের চাইতে বেশী মনোযোগ। ক্যাপ্টেন আর অন্যান্য অফিসাররা এসে ওকে জানায় দয়া আর উৎসাহ। এমনকি ঐ ভয়ঙ্কর বুড়ো সারেঙ্গটা যে ওর মাথায় চাঁটি মারত আর সব সময়েই গালিগালাজ দিত, সেও ওকে দেখতে আসে। সারেঙ্গের ঘ্যাড় ঘ্যাড়ে গলায় একটা বর্ণনাতীত কোমল ভাব, যদিও অসুস্থ লোকটার বিবর্ণ মুখ দেখে সে ভ্রূ কোঁচকায়। আর্‌তেমিয়েভকে কয়েকটা কথা বলে প্রায়ই সে যোগ করে:

'বুঝলে ভাই, শীগগিরই সেরে উঠবে এবার ... নাবিকের হাত দুটোকে কদ্দিন আর অকেজো করে রাখবে। ঈশ্বর দয়াময় ... আবার ভাল হয়ে উঠবে তুমি।'

আর্‌তেমিয়েভ বুঝতে পারে সবাই ওর সঙ্গে বিশেষ সদয় ব্যবহার করে।

'এর মানে কী?' এই সব দয়ায় অভিভূত হয়ে মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করে সে।

এর কারণ বার করতে বেশী দিন লাগল না। দু'জন নাবিককে বলাবলি করতে শুনল, ডাক্তারের মতে ও আর বেশী দিন বাঁচবে না। 'আর দিন দশেক টিঁকলেও ভাগ্যের কথা,' ও যে সেখানেই আছে এ কথা ভুলে গিয়ে কথাটা বলে ফেলল ওরা।

স্তম্ভিতের মত পড়ে রইল সে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতর কী যেন একটা তাকে বলে দিল ওরা যা বলেছে তা ঠিক: এ পৃথিবীতে বেশী দিন আর নেই ও।

ওর সুন্দর চোখ দুটি দিয়ে দুঃখের তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

## ৪

উঃ, ছোট্ট গুমট কেবিনটায় শেষের কটা রাত কতই না দীর্ঘ, কী নিঃসীম, কী ক্লান্তিকর! ঘুম প্রায় ছিলই না তার। একটু ঝিমিয়ে নিয়ে পর মুহূর্তেই জেগে উঠে চোখ মেলে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে। রোগীর ঘরের আবছা অন্ধকারে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো। চারদিক চুপ চাপ। শোনা যায় শুধু জাহাজের পাশে ঢেউয়ের ধাক্কা আর জাহাজের মৃদু ক্যাঁচকোঁচ।

জ্বালাময়ী যন্ত্রণা! আশাহীন ক্লিষ্টতা!

মাতাল ও দুশ্চরিত্র রিয়াব্‌কিন কিন্তু রাত্রির নিঃসঙ্গতায় অসুস্থ লোকটিকে ভোলেনি। প্রতি রাতে পাহারার আগে বা পাহারার পর সে পা টিপে রোগীর ঘরে যায়, না ঘুমিয়ে আর্‌তেমিয়েভের বাঙ্কের পাশে মেঝেতে বসে অফুরন্ত গল্প বলে ওকে আরাম আর উৎসাহ দিতে চেষ্টা করে।

মন-মাতান ওস্তাদের মত বলে এই গল্পগুলোকে। এদের মূল পরিণতি যদি দুঃখদায়ক বা মৃত্যুতে শেষ হয়, তাহলে নিজের মত করে বৈচিত্র্য এনে কাঠামোটা দেয় বদলে।

তরুণ নাবিক গল্প শুনে কিছুটা সান্ত্বনা পায়, গল্প-বলিয়ের গলার কোমল ছন্দে ঘুমিয়ে পড়ে।

কখনো সখনো কিন্তু আর্‌তেমিয়েভ হঠাৎ ওর গল্পে বাধা দিয়ে বলে ওঠে:

‘শোনো, রিয়াব্‌কিন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই...’

‘কী, ভানিয়া?’

‘এটা পরলোক সম্পর্কে... তোমার কী ধারণা, জায়গাটা কেমন? সেখানে কি আমাদের মত লোকের জীবন কঠিন হবে?’

রিয়াব্‌কিন কখনো এরকম সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায়নি, একটু চিন্তা করে সে। নিজস্ব বুদ্ধি খেলিয়ে একটা উত্তর বার করে জোরের সঙ্গে বলে:

'বুঝলে ভায়া, আমরা এটা ধরেই নিতে পারি আমাদের মত লোকের জীবন সেখানে হবে সহজ আর এখন যারা ভদ্দর তারা নির্ঘাৎ মজাটি টের পাবে ... কারণ এখানে ওরা সুখে আছে... ওরা সটান যাবে নরকে — এই যে, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, দয়া করে এই রাস্তায় চলে আসুন! তবে কি জানো, আমাদের সবাই যে স্বর্গে যাবে তা মনে হয় না ... এই ধরো আমার কথা। আমি পাঁড় মাতাল বলে নরকে আমার জন্য বেশ ভাল শাস্তির ব্যবস্থা আছে। ওখানে যেতেই ওরা আমাকে গলান তামা গেলাবে ... হলে হবে কি, মদ আমি ছাড়তে পারব না, বুঝলে বুড়ো! হুঁ, পরলোকে ব্যাপারটা এমনি দাঁড়াবে!' রিয়াব্‌কিন শেষ করল। মনে হল তার এই হঠাৎ ধারণাটা যে সত্যি এ বিষয়ে সে স্থির নিশ্চয়।

তরুণ নাবিকটি একটু চুপ করে থেকে বলল:

'কখনো কি মনে মনে একথা ভেবে দেখেছ, মানুষ মরে গেলে তার কী হয়?'

'কী সব আজেবাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ! ছাড়ো এসব! তুমি আর আমি এখনও বহু দিন আছি এই পৃথিবীতে। ঈস্, সারেঙ্গ কাল রাতে ভাস্কা স্কোব্‌লিকভ্‌কে কী ঘুঁষিটাই না মারলে, দেখেছ নিশ্চয়! এক্কেবারে নাকটার উপর! রক্ত ঝরছে শুয়োরছানার মত', রিয়াব্‌কিন হঠাৎ বিষয়টার মোড় ঘোরাল, উদ্দেশ্য দুঃখের চিন্তা থেকে বন্ধুর মন ফেরান।

কিন্তু আর্‌তেমিয়েভের এতে কোন কৌতূহলই নেই। অতীতে যে সব জিনিষ নিয়ে সে ভাবত তাতে আর কোন উৎসাহ নেই তার। ও সব এখন দূর অতীতের।

'তার পর ধরো তোমার ঐ গিয়ে মিখাইলভটার কথা — ব্যাটা উঁচু পালটা ঢিল দেয়নি। প্রধান অফিসার কী গালাগালিই না দিল ওকে কিন্তু ঘুঁষি চাপিয়েছে শুধু একবারই।'

আর্‌তেমিয়েভ কোন মন্তব্য করল না। এর বদলে হঠাৎ বলে উঠল:

'আমি মরতে চাই না, ভাই, কিন্তু মনে হচ্ছে মরতেই হবে আমাকে। সাগরে ফেলে দেয়া হবে আমাকে, এই যেন ভগবানের ইচ্ছে!' কথায় দুঃখ ঝরে পড়ল।

'বোকামি করো না! যত সব বাজে কথা! তুমি কি ভাবছ নাবিকদের সব খবর আমি রাখি না? মায় তাদের ভবিষ্যৎ পর্যন্ত। বারটি বছর বুঝি এমনিই নাবিকগিরি করে কাটালাম... কেন, ঐ ত 'কোপ্‌চিকে' একটা ছোকরা ছিল — তোমারই মত অসুখ। প্রায় একটি বছর বিছানায় পড়েছিল জাহাজেই। কিন্তু পরে দিব্যি ভাল হয়ে গেল!'

কিন্তু স্পষ্টই ওর কথা আর্‌তেমিয়েভকে বিশেষ কোন সান্ত্বনা দিল না। রিয়াব্‌কিন টের পেয়ে আর একটা গল্প ফেঁদে বসল।

'এবার তোমার ঘুমোন উচিত, রিয়াব্‌কিন।'

'ঘুম? মোটেই ঘুম পাচ্ছে না... সকালে ভাল করে ঘুমোব!'

'সত্যি তোমার সহানুভূতি আছে, রিয়াব্‌কিন। তোমার আত্মা সৎ আর দয়ায় ভরা। ঈশ্বর তোমার মদ খাওয়া ক্ষমা করবেন!'

## ৫

জাহাজটি বিষুবরেখার দিকে এগুচ্ছে। আর্‌তেমিয়েভ দ্রুত শেষ হয়ে আসছে।

একদিন ভোরে সে নৌ-কলেজের ছাত্র য়ুশ্‌কোভকে ডেকে পাঠাল। য়ুশ্‌কোভ ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। প্রায়ই এসে ওর সঙ্গে গপ্প করে, ওর হয়ে গ্রামে মা বাবার কাছে চিঠি লেখে। তরুণ নাবিকটিকে খুবই ভালবাসে সে।

'আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি বলে ক্ষমা করবেন, স্যার... শেষ বারের মত একটু দয়া করুন আমাকে। আমার হয়ে দেশে মা-বাবার কাছে একখানা চিঠি লিখুন আর রাশিয়ায় ফিরে গিয়ে ওঁদেরকে এই জিনিষগুলো পেঁাছে দেবেন...'

য়ুশ্‌কোভ ওকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু আর্‌তেমিয়েভ বাধা দিয়ে বলল:

'কোন লাভ নেই, স্যার! আমি জানি, মরতে চলেছি।'

ন্যাকড়ায় জড়ান দুটি স্বর্ণমুদ্রা দিল য়ুশ্‌কোভের হাতে; তার ঘরের টেবিলে রাখা একখানা মোটা পশমী রুমাল, দুটো সার্ট, এক জোড়া জুতো, একটি বোনা স্কার্ফ দেখিয়ে ওগুলিকে মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ জানাল।

'আপনি এই কথা লিখুন যে আমি মারা গেছি ... আমি সব সময়েই ছিলাম বাধ্য সন্তান, পরলোকে আমি তাঁদের জন্য, সমস্ত কৃষকদের জন্য প্রার্থনা জানাব... আমার ভাই, বোন আর প্রতিটি গ্রামবাসীকে আমার গভীরতম ভালবাসা জানাচ্ছি ... এই কথাগুলি কি আপনি লিখবেন, স্যার?'

'নিশ্চয়ই!' কোন রকমে চোখের জল সামলিয়ে বলল য়ুশ্‌কোভ।

'স্যার, আর একখানা চিঠি ক্রনস্টাড্‌টে আভ্‌দোতিয়া মাত্‌ভেয়েভনা নিকলায়েভার কাছে... আপনি যখন ক্রনস্টাড্‌টে যাবেন এই উপহার কয়টি ওকে পাঠিয়ে দেবেন।'

এই বলে সে চোখ ঘুরিয়ে একখানা লাল রেশমী রুমাল আর কৃত্রিম পাথর বসান একটি ছোট্ট আংটি দেখাল। এগুলো সে কিনেছে কোপেনহেগেনে।

'ঠিকানাটা রুমালের উপরেই আছে... তার মায়ের বাজারে একটি দোকান আছে... লেখবার সময় একথাটুকু উল্লেখ করবেন, আমাকে বিশ্বাস না করে ও ভুল করত ... ও ভাবত আমি ওর সঙ্গে শুধু খেলা করছি, কেবল ঠাট্টা করত আমাকে। এও জানাবেন, অন্য মেয়েদের সঙ্গে মিশলেও তা শুধু মনে দুঃখ ছিল বলেই, সত্যি আমি ভালবাসতাম কেবল ওকেই। তাকে জানাবেন আমার সর্বোত্তম ভালবাসা দিচ্ছি ওকে—ওর মিষ্টি ঠোঁটে চুমো খাচ্ছি। ঈশ্বর ওর মঙ্গল করুন। এসব লিখবেন ত স্যার?'

'লিখব।'

'আর সব শেষে, আপনাকে ধন্যবাদ, স্যার, আমাকে এত দয়া করলেন আপনি—বিদায়!'

য়ুশ্‌কোভ মুমূর্ষুর কপালে চুমো খেল, কান্না চাপতে না পেরে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সেদিন রাতেই তরুণ নাবিকটি মারা গেল।

তারা ওর দেহটিকে ঢেকে দিল পুরো নাবিকের পোষাকে। পরের দিন ভোরে দেহটিকে নিয়ে গেল কোয়ার্টার ডেকে, রাখল পায়ার উপর ভর দেওয়া একটি কাঠের ফলকের উপর। দুপুরে ক্যাপ্টেন, অফিসার ও জাহাজের আর সবার সামনে পুরোহিত শেষ কৃত্যের মন্ত্র পড়ল। গৃহ ও প্রিয়জন ছাড়া দূরে, বহু দূরে সেই উজ্জ্বল, অনন্ত সমুদ্রের মাঝখানে ঐ মন্ত্র এবং নাবিকদের সমবেত উদাত্ত কণ্ঠের শোকসঙ্গীত প্রত্যেকের মনে অসহ্য দুঃখের ছায়াপাত করল।

কৃত্য শেষ হলে, কমরেডের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য নাবিকরা লাইন বেঁধে এগিয়ে চলল। ভোর থেকেই মৃত্যুর সঙ্কেত হিসেবে পতাকা অর্ধনমিত।

শেষ অপরাহ্নে দেহটিকে আঁটসাঁট থলিতে পুরে সেলাই করা হল, পায়ের দিকে রাখা হল একটি কামানের গোলা। শেষ কৃত্য ও সামরিক সম্মানের পর গভীর নিস্তব্ধতার মাঝখানে চার জন নাবিক দেহশুদ্ধ কাঠের ফলকটিকে জাহাজের পাশে নিয়ে দেহটিকে জলে নাবিয়ে দিল। সাগরের স্বচ্ছ নীল জলে একটা মৃদু আলোড়ন তুলে দেহটি গেল মিলিয়ে।

কঠোর স্তব্ধতার মাঝখানে লোকগুলি চলে গেল চারদিকে। অনেকেরই চোখে জল, রিয়াব্‌কিন কাঁদছে শিশুর মত।

জাহাজের দক্ষিণে বহু দূরে রক্তাভ জ্যোতিতে দিগন্ত উজ্জ্বল করে সূর্য অস্ত যাচ্ছে ধীরে ধীরে মহীয়ান মূর্তিতে।

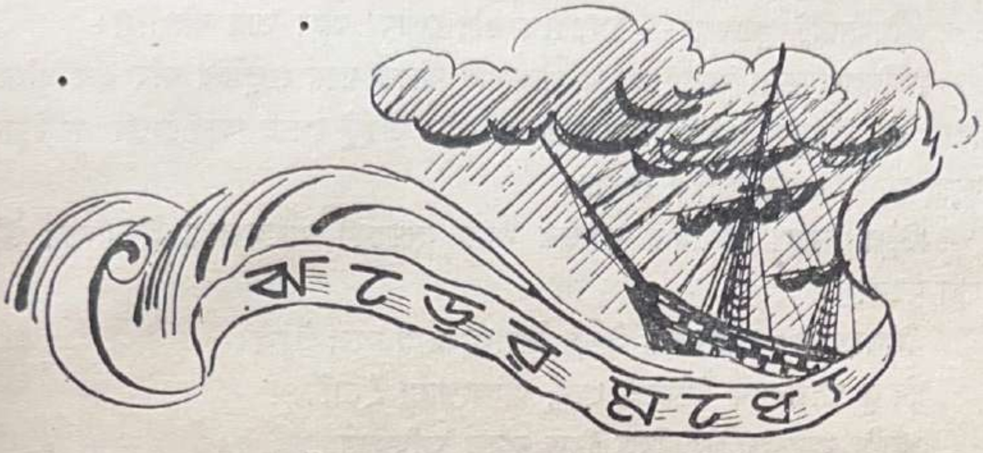

# ঝড়ের মধ্যে

১

উঠুন, স্যার! আলেক্সান্দ্র ইভানিচ! উঠুন!'

জাহাজের অফিসার অপোলিয়েভের আর্দালি কিরিল্লভ কর্তার উদ্দেশ্যে কথা কয়টি বলল। আর্দালিটি খাট, বলিষ্ঠ গড়ন, কালো, কমবয়েসী, এক কানে একটা আংটি। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পা দুটোকে ফাঁক করে একহাতে দরজার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে, আর এক হাতে অফিসারের পা ধরে মৃদু টান মারছে। প্রচণ্ড আলোড়নে আটলাণ্টিকের উত্তাল তরঙ্গের উপর 'সোকল' বলের মত উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে কিন্তু অফিসারটি এ সত্ত্বেও তার ছোট্ট কেবিনটিতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

উত্তরে টুঁ শব্দ নেই।

অফিসারটি কুম্ভকর্ণ — 'দেরীতে-ওঠা লোক' বল্লে তার আর্দালি।

কিরিল্লভ ভাল করেই জানে পাহারার কাজে তার প্রভুটির যদি একমিনিটও দেরী হয় তাহলে গালি খেতে হবে তাকেই। একটু থেমে আবার সে পা টানতে সুরু করল, এবার আরও জোরে।

'উঠুন স্যার! আপনার কাজের সময় হয়েছে! আলেক্সান্দ্র ইভানিচ! উঠুন দয়া করে!'

'নিপাত যাও!' বাঙ্কের উপর নিদ্রালু গলা বলে উঠল।

'কিন্তু আপনাকে উঠতেই হবে, আলেক্সান্দ্র ইভানিচ!'

'আমি মরে গেছি!' বিড় বিড় করল অফিসার...

আর্দালি যে পাটা ধরে টানছিল সেটাকে সরিয়ে নিয়ে মাথার উপর কম্বল টেনে আর এক পাশ ফিরে ঘুমোতে যাচ্ছিল, এমন সময় জাহাজের এক প্রবল ধাক্কায় পার্টিশনে কপাল ঠুকে ঘুম গেল একেবারে ছুটে।

বিছানার ভিতর থেকে উঁকি মারল ঘুম ঘুম, ছেলেমানুষের মত একখানা মুখ—কোমল, গোলাপী, সুন্দর, তাতে সবে গজাতে সুরু করেছে রেশমী দাড়ি আর নতুন গোঁফ, মাথায় শস্য-স্বর্ণাভ চুল। তার বড়, গোল, পিঙ্গল চোখ কুঁচকে স্বপ্ন-দেখা শিশুর মত ঘুম-ছাওয়া, খুশির হাসি হাসল সে—স্পষ্টই সে এখনো এমন কোন মায়ায় আচ্ছন্ন যা তাকে বর্তমান পরিবেশ থেকে বহু দূরে নিয়ে গেছে।

গ্রামের একটি বাগানে বসে আছে সে। বাগান উজ্জ্বল সবুজ পাতা আর সুগন্ধী ফুলে ছাওয়া... চারপাশে লাইম গাছের মিষ্টি গন্ধ, গাছের নীচে একটা সরু ছোট্ট বেঞ্চ। তার উপর খোদাই-করা দুটি নাম—'লেনা' ও 'আলেক্সান্দ্র'। নক্সাছাড়া সাদা লিনেনের ফ্রক-পরা একটি সুন্দরী মেয়ে বসে আছে তার পাশে। কালো বিষণ্ণ চোখ দুটি ভালবাসায় কোমল... সুন্দর, কোঁকড়া চুলের উপর লাইলাকের একটি ক্ষুদ্র বৃন্ত ... ওর চোখের দিকে চেয়ে আছে মেয়েটি, দৃষ্টিতে আকুল মায়া। এই মিষ্টি মেয়েটি তার প্রেমিকের রভসাকুল কথা শুনছে। কথা বললে পাছে এই সুখের সম্মোহন ভেঙে যায় এ জন্য ওর নরম, উষ্ণ হাতখানা দিয়ে জোরে ওর হাত ধরে আছে — আঁখিপক্ষ্মে কাঁপছে অশ্রু বিন্দু। 'চির

দিনের জন্য', বলে ও। 'চির দিনের জন্য,' উত্তর দেয় সে—ঠিক ওরই মত প্রায় শোনা যায় না এমনি গলায়। অনেকক্ষণ বসে রইল সেখানে। কোমল, মায়াবিনী সন্ধ্যা এল ঘনিয়ে, তবু ওরা বসে রইল সেখানে, নির্বাক আনন্দে... বাগানের উপর গভীর নিস্তব্ধতা ... এতটুকু শব্দ, একটি মর্মরও নেই। ঊর্ধ্বে মায়া-ভরা তারার দল ঝিকমিক করছে। যেন তারা তরুণ প্রেমিকদের প্রশস্তি জানাচ্ছে, শুনছে ওদের উচ্ছ্বসিত বুকের স্পন্দন।

'লেনা! আলেক্সান্দ্র ইভানিচ! চা খাবে এসো!' লেনার মায়ের নরম গলা এখনও কানে বাজছে।

ঐ আশ্চর্য স্বপ্ন এই স্মৃতিকে তার কাছে ফিরিয়ে এনেছে, মনে হচ্ছে যন্ত্রণাদায়কভাবে স্পষ্ট ও বাস্তব। সেই মায়ায় এখনো সে আবিষ্ট, তার একান্ত ইচ্ছা স্বপ্নটিকে আরও কিছুক্ষণ ধরে রাখা।

কিন্তু বাতাসে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত স্বপ্নটা মিলিয়ে গেল কয়েক মুহূর্তে।

কেবিনের ভিতর ক্ষীণ আলো। আলোর ছেঁদাটি কষে আটকান। এক সময় ফেনিল সমুদ্রে ছিল ডুবে, আবার উপরে ওঠায় আবছা কাঁচের ভিতর দিয়ে ভোরের আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। অপোলিয়েভ তার কার্যকুশল, চটপটে, ছোটখাট আর্দালিটিকে দেখতে পেল, দাঁড়িয়ে আছে দুহাতে দরজা ধরে, কেবিন আর তার ভেতরকার অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে সেও দুলছে। শুনতে পেল জাহাজের উন্মাদ আর্তনাদ, আত্মস্থ হল প্রচণ্ড আলোড়ন সম্পর্কে। শেষ পর্যন্ত ঘুম ছুটে গেল একেবারে।

মুখ থেকে মিলিয়ে গেল আনন্দের হাসি।

'আরে বাপ্‌স্‌, জাহাজটা পাক খাচ্ছে যে!' জাহাজের পার্টিশনে ধাক্কা না খায় এমনি একটা জায়গা খুঁজে নিতে নিতে সে বলল, মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

'সমুদ্রটা প্রচণ্ড রকম খারাপ, স্যার!'

'কটা বেজেছে?'

'আটটা বাজতে মাত্র আধঘণ্টা।'

'ডেকের অবস্থা কী?'

'ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। আগুনের মত গর্জাচ্ছে ওটা!'

'গত রাতে বুঝি সুরু হয়েছে?'

'হ্যাঁ, স্যার। ওরা সামনের পাল গুটিয়ে ফেলেছে। আর বাকিগুলোকে ছোট করেছে। ক্যাপ্টেন রাতভর জেগে আছেন,' আর্দালিটি জানাল।

একটু থেমে তরুণ নাবিকটি (এই ওর প্রথম দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা) ভয় পাওয়া রহস্যময় গলায় বলল:

'অগ্রমাস্তুলের পুরোবর্তী ডেকে লোকরা বলছে রকমসকম দেখে মনে হচ্ছে রীতিমত একটা ঝড় আসছে। পালের দড়াদড়িতে বাতাস গর্জাচ্ছে... আর ঢেউগুলো — ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন — বিরাট চক্কর-খাওয়া পাহাড়ের মত।'

'তুমি দেখছি ঝড়কে ভয় পাও।'

'হ্যাঁ, স্যার। ভয় পাই আমি।' আর্দালিটি বলল খোলাখুলি, সঙ্কোচের সঙ্গে।

'ভয় পাবার কিছু নেই, বুঝলে। আমরা ঝড়কে ঠিক সামলাতে পারব!' তরুণ অফিসার কর্তৃত্বের সুরে, কৃত্রিম বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে বলল। সত্যি বলতে কি, সে নিজেও কখনো ঝড়ে পড়েনি। ওটা প্রকাশ না করলেও যে পৈশাচিক আলোড়নে জাহাজটা খোসার মত পাক খাচ্ছে তাতে সে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করল।

নীচের এই কেবিনটায় বিপদ যতটা না ছিল তার চাইতেও বেশী মনে হচ্ছে।

'হ্যাঁ, স্যার!' কিরিল্লভ দ্রুত সমর্থন জানায়। এটা সে করল শৃঙ্খলাবোধ ও সঙ্কোচের জন্য, তার 'দয়ালু প্রভুটির' প্রতিবাদ করা সম্ভব নয়। অন্য কোন কারণ নেই।

কিন্তু যে অনৈচ্ছিক ভয় সে গোপন করার চেষ্টা করছিল তা দূর হল না।

'ডেকে কি ঠাণ্ডা?'

'দারুণ ঠাণ্ডা, স্যার।'

'আমার চামড়ার কোট বার করেছ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আচ্ছা, এবার আমাকে তৈরী হতে হবে!'

বাঙ্কের উষ্ণতা ছেড়ে আসবার আগে, অফিসারটি আবার বিচলিত স্মৃতিতে আবিষ্ট হল। ঠিক এই মুহূর্তে অনেক বেশী ইচ্ছে হল তার, স্বপ্নটা যদি সত্য হত, আপনা থেকে বেরিয়ে-আসা কথাটা বলল হঠাৎ:

'মনে হয়, তীরে থাকাই ভাল, কী বলো, কিরিল্লভ?'

'ঠিক বলেছেন, স্যার!' তরুণ নাবিকটি সাগ্রহে উত্তর দিল, মুখে ফুটল হাসি। 'শুকনো ডাঙ্গায় লোকের ভাল লাগে ... শক্ত মাটি, বুঝলেন কি না! কিন্তু এখানে আস্ত নরক। স্বাধীন থাকলে সোজা চলে যেতাম আমার গ্রামে ...'

'যেতে তুমি?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল অফিসার।

'হ্যাঁ, স্যার, যেতাম।'

'আর আমিও সোজা চলে যেতাম জাসিঝে', অফিসারটি ভাবল।

শুকনো হেসে বলল সে:

'দুর্ভাগ্য, এখান থেকে যাবার উপায় নেই, কি বলো কিরিল্লভ?'

'না, স্যার, চারদিকে জল ছাড়া কিছুই নেই!'

'অতএব এর ভেতর একটু চায়ের জোগাড় করো। মনে থাকে যেন গরম হওয়া চাই!'

'হ্যাঁ, স্যার! চা তৈরী। প্রধান অফিসার ইতিমধ্যে খেতে সুরু করেছেন। কিন্তু জাহাজ যখন এভাবে দুলছে, খাওয়াই মুস্কিল', কিরিল্লভ মন্তব্য করে 'দয়ালু প্রভুটির' জন্য চা আনতে গেল। অফিসারটি তার আর্দালির সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, কথাবার্তা বলে মন খুলে।

রান্নাঘরের দিকে এগুল সে। দোলানি তাকে পাগলের মত একবার এদিকে, একবার ওদিকে ফেলে দিতে লাগল। পা ঠিক রাখাই দায়। সেখানে দেখতে পেল ওরই মত আর একজন ছোকরা নাবিককে, অন্য অফিসারের চাকর। কিরিল্লভ নিজেকে চাঙ্গা করতে চাইল এবং একই সঙ্গে রান্নাঘরে বসে-থাকা আর সব নাবিকদের কাছ থেকে নিজের ভয়টাকে লুকোবার উদ্দেশ্যে একটা রসিকতার ভাব নিয়ে বলল:

'ঠিক দোলনার মত! হাঁটা ত দূরের কথা, পা ঠিক রাখতে পারলেই যথেষ্ট!' চট করে এই কথাটুকু যোগ করল:

'কি হে, ভাসিলি, কী ব্যাপার? ভয় পাচ্ছ না কি?'

'ভাবতেই পাচ্ছি না ... কী হবে যদি ... কী ঝড়, বাপ্‌স্!' সাগর-পীড়া আর আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে বলল নাবিকটি।

'এরকম ভাবতে নেই, ভাসিয়া। ভয় পাবার কী আছে? ঝড় যদি আসেই, আসুক না। ওকে ঠিকই রুখতে পারব আমরা!' অফিসারের কথার পুনরুক্তি করে সাহস দেখিয়ে বলল সে।

জোর করে একটু হাসল যদিও মনে মনে ভয়ের চোটে সে সাবাড়।

## ২

মিনিট দশেক বাদে স্নান সেরে, জামাকাপড় পরে তরুণ অফিসারটি কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। এই দশ মিনিট ধরে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তাকে এমন সব অবিশ্বাস্য অঙ্গভঙ্গী করতে হয়েছে যা দড়াবাজির লোকদেরও জানা নেই।

নীচটা স্যাঁৎসেঁতে ও গুমট। নাবিকদের বদ্ধ ঘরে কটু গন্ধ। সবগুলো ছেঁদা শক্ত করে আটকান — বাইরের বাতাস ভিতরে ঢুকতে পাচ্ছে না। পাহারা থেকে ছুটি-পাওয়া লোকগুলো ডেকের উপর বসে বা শুয়ে আছে, গম্ভীর, নিঃশব্দ, মাঝেসাঝে 'অভিশপ্ত' আবহাওয়া নিয়ে দু'একটা মন্তব্য করছে। এদের কেউ কেউ সাগর-পীড়ায় কাতর। ইঞ্জিনের দরজার কাছে বুড়ো নাবিক শ্চের্‌বাকভ (জাহাজের বিগ্রহের ভার ওরই উপর, পাদরী বা মন্ত্রোচ্চারক হিসেবে ধর্মকৃত্য করে থাকে) নীচু আর একঘেয়ে কণ্ঠে বাইবেল পড়ছে। চারপাশে নাবিকদের একটা ছোট্ট দল তন্ময় হয়ে পাঠ শুনছে। প্রাচীন স্লাভ গ্রন্থের অর্থ ততটা হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না যতটা প্রশংসা চলেছে পাঠকের আবেগময় কণ্ঠ আর গাম্ভীর্যমণ্ডিত উন্নত স্বরের।

ডেকের উপর হাঁটা সোজা ব্যাপার নয়। মনে হচ্ছে পায়ের তলা থেকে ওটা

সরে সরে যাচ্ছে। ডেক পার হবার জন্য চাই ঠিক মুহূর্তটিকে বেছে নেবার প্রচুর কৌশল আর দক্ষতা।

চা খেতে জমায়েত-হওয়া অফিসারদের ঘর সাধারণত এ সময়টা থাকে সরগরম। কিন্তু এখন প্রায় খালি। সব অফিসাররাই প্রায় তাদের কেবিনে শুয়ে আছে। মেঝের সঙ্গে আটকান টেবিলের উপর লণ্ঠনটা পার্টিশনের একঘেয়ে আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দুলছে। ডেকের সঙ্গে কষে লাগান বইয়ের আলমারি ও পিয়ানোটাও ক্যাঁচ ক্যাঁচ করছে। অফিসারদের ঘরের শক্ত করে আঁটা ছাদের জানলা দিয়ে বাইরে গর্জমান বাতাসের গোঁ গোঁ শোনা যাচ্ছে। জাহাজটা কাঁপছে আগাগোড়া — নীচের ডেকের কাঁপনটা প্রচণ্ডতর। সাধারণত হৈ চৈ ও হাসি হল্লায় ভর্তি অফিসারদের ঘরটিতে নিরানন্দ গম্ভীর ভাব।

ফূর্তিবাজ, খেলুড়ে লাইকা একটা দিশী কুকুর — হাল্কা লাল চুল, ছোট্ট ল্যাজ, জাতটা অজানা। সাগর পারে যাওয়ার জন্য জাহাজটা যখন ক্রনস্টাড্‌টে গোছগাছ করছিল ওটা জাহাজের ভিতর ঢুকে পড়ে। নাবিকরা ওর নাম দিয়েছে 'লাইকা'। অফিসার ঘরের এক কোণায় এখন পড়ে আছে ও। মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ করে উঠছে করুণভাবে আর ফ্যাকাশে চোখে অসহায়ভাবে চারদিকে চাইছে, যেন অবাক হয়ে এই কথাই ভাবছে একটা সামান্য কুকুরের পক্ষে পিছল অয়েল ক্লথটায় ঢাকা মেঝের উপর পা ঠিক রাখা কী করে সম্ভব। আর একজন যার কোন হদিসই নেই সে হল লাইকার বান্ধবী ভাস্‌কা — একটা মোটা সোটা বেড়াল। এর মালিক কামান বিভাগের অফিসার। বোঝা যাচ্ছে ভাসকাও সাগর-পীড়ায় কাতর।

অফিসার ঘরের একমাত্র উপস্থিত ব্যক্তিটি হল প্রধান অফিসার — বলিষ্ঠ গঠন, শক্তিশালী, কালো চুল, বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস। একটা ছোট, পুরু সুতির কোট পরে, রোদ-পোড়া মুখে একটা গম্ভীর উত্তেজনার ভাব নিয়ে সোফার উপর বসে আছে। পেশীবহুল, লোমশ আর ব্রোঞ্জ-রঙা হাত দিয়ে সযত্নে চায়ের একটা গ্লাস ধরে তাল সামলাচ্ছে — অপেক্ষা করছে সেই মুহূর্তটির জন্য যখন চা না ফেলে দিয়ে ঘন, কালো গোঁফের কাছে সেটিকে তুলে চুমুক দিতে পারবে।

'গুড মর্নিং, আলেক্সেই নিকলাইচ!'

'গুড মর্নিং, আলেক্সান্দ্র ইভানিচ!'

টেবিলের পাশে মেঝের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আঁটা বেঞ্চ ধরে তরুণ অফিসার প্রধান অফিসারের সঙ্গে করমর্দন করতে এগিয়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওরই গায়ের উপর।

'ওরা বলছে রাতে হাওয়াটা বেড়েছে, আলেক্সেই নিকলাইচ।' সোফার পাশে বেঞ্চের উপর বসতে বসতে বলল তরুণ অফিসার।

'হুঁ, বেড়েছে!' সংক্ষিপ্ত জবাব এল। চিন্তিতভাবে চুপচাপ চা খেতে লাগল সে। পরে বলল:

'হতচ্ছাড়া এই দামাল সমুদ্র! ভালো করে নজর না রাখলেই একটা নৌকো খসিয়ে নেবে বা জাহাজের কাঠামো ভেঙে ছাড়বে!' রাগ আর দুশ্চিন্তা মেশান কথাগুলো। চা খেয়ে ঘর ছেড়ে ডেকে চলে গেল প্রধান অফিসার।

'এই আর্দালি! চা আসবে কখন?' একলা বসে অপোলিয়েভ চিৎকার দিয়ে উঠল।

কিন্তু কথা শেষ হতে না হতেই দরজার সামনে ভেসে উঠল কিরিল্লভের চৌকো, ছোট্ট করে চুল ছাঁটা কালো মাথাটা। জাহাজটা কাৎ হতেই সে হঠাৎ সামনে হোঁচট খেয়ে পড়তে যাচ্ছিল কিন্তু কোনরকমে তাল সামলে নিল, ধরে থাকল তোয়ালে-জড়ান চায়ের গ্লাসটাকে। তারই পিছনে এল আর একজন চিনির পাত্র আর বিস্কুট নিয়ে। এসব নির্বিঘ্নে তার সামনে পৌঁছতেই একচুমুকে চাটা সাবাড় করে আর এক গ্লাসের হুকুম দিল সে।

ঠিক এই সময় প্রধান নৌ-চলাচল অফিসার 'উত্তেজক' হিসেবে একগ্লাস গরম চা খাবার জন্য সেখানে এল। ছোটখাট বৃদ্ধ মানুষটি, কোটের উপর জলের কণা চক চক করছে, একটা লম্বা স্কার্ফ গলায় জড়ান, টুপিটা নাবান চোখ পর্যন্ত। পরনের সবকিছুই পুরোনো আর জবড়জং কিন্তু পোষাক পরার কায়দা এমনি যে তাকে খুব চটপটে দেখায়, তার ভেতরে একটা ঝানু নাবিকের ভাব ফুটে ওঠে।

প্রচণ্ড দোলানি সত্ত্বেও তার প্রকৃত 'নাবিক পর্দের' সাহায্যে কোন কিছু

না ধরেই তাল সামলিয়ে ডেকের উপর দিয়ে আসতে লাগল সে। জাহাজ যেমন এদিক ওদিক কাৎ হচ্ছে সেও তেমনি বিচিত্র ভঙ্গীতে তাল সামলাচ্ছে।

তার অমায়িক, রেখাবহুল মুখের ভাব দেখে তরুণ অফিসারটি বুঝতে পারল লোকের প্রশ্নে ঝালাপালা হয়ে বা জাহাজ যখন বিপজ্জনক সাগর পাড়ি দেয় সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত ধারণা না থাকায় তার মেজাজ স্বভাবত যেমন খারাপ থাকে, এখন তেমন নয়। স্বাভাবিক সম্ভাষণের পর তরুণ অফিসার জিজ্ঞেস করল:

'ওখানকার হালচাল কেমন, ইভান ইভানিচ?'

'নিজেই দেখতে পাবেন... মনে হচ্ছে আপনারই পাহারা এখন — আজ সকালে সব প্রথমেই আপনি!' হাসতে হাসতে জবাব দিল বুড়ো। 'সমুদ্রে সাধারণত ব্যাপারটা যেমন হয়ে থাকে, তাই!' চা খেতে খেতে বলে সে। ওটাকে 'সুস্বাদু' করার জন্য সঙ্গে একটু ব্র্যান্ডি মিশিয়ে নিল।

'আমরা এখন কোথায়, ইভান ইভানিচ?'

'বিস্কে উপসাগরে — পার থেকে একশ মাইল দূরে। এসো, আর এক গ্লাস নেয়া যাক!' বুড়ো আর্দালিকে হাঁক দিল। 'আর ব্র্যান্ডির কথাটা ভুলো না! ওতে স্বাদটা হয় চমৎকার!' তরুণ অফিসারটির দিকে ফিরে বলল সে। 'এটা আপনার খেয়ে দেখা উচিত... সাগর-পীড়ার উত্তম প্রতিষেধক... কি, সাগর-পীড়া হয়েছে না কি?'

'মোটেই না!' তরুণ অফিসার অহঙ্কার করল।

'অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত সবাই এ অসুখে ভোগে, বুঝলেন কি না ... কিন্তু, কেউ কেউ আছে কোন দিনই অভ্যস্ত হয় না... মনে পড়ে, কাজ করতাম এক লেফ্‌টেনান্টের সঙ্গে... সেও ছিল ও রকম। বেচারাকে রাশিয়ায় ফেরৎ পাঠাতে হয়েছে।'

'বোধ করি সন্ধ্যা নাগাদ কমে আসবে,' গলার স্বরটাকে সহজ ও স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলল অপোলিয়েভ। আবহাওয়া যাই হোক না কেন যেন তাতে কিছুই যায় আসে না। জবাবে ইভান ইভানিচ হাসল।

'কী বললেন, কমে আসবে?'

'হ্যাঁ, কেন কমবে না নাকি?'

'মনে হচ্ছে সন্ধ্যায় আমরা আসল ঝড় টের পাব। দুদ্দাড় কাঁচ ভাঙছে।'

বুড়ো নৌ-চলাচল অফিসার তার দীর্ঘ নাবিক জীবনে বহু বার ঝড়ে পড়েছে, এমনকি কামচাৎকা ছাড়িয়ে একবার জাহাজ-ডুবিতেও পড়ে। এমন শান্ত গলায় কথাগুলো বলল যেন অতি সাধারণ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছে। তারপর চায়ের সঙ্গে ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে বার কয়েক চুমুক মেরে একটা আরামের আওয়াজ করে বলল:

'ব্যস্, কাশিটা আমাকে আর জ্বালাবে না... ওখানটায় ডেকে হরদম কাশছিলাম ... এই ভাসিলিয়েভ!' একটা ডাক ছাড়ল বুড়ো।

আর্দালি হাজির হল।

'আরও খানিকটা ব্র্যাণ্ডি... ব্যস্, এই যথেষ্ট! আর ঠাণ্ডা লাগছে না!' নিজের এই কায়দাকে তারিফ জানিয়ে যেন করল মন্তব্যটা। নিজের ও অপরের অসুখকে ব্র্যাণ্ডি দিয়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে শেরি বা মারসালা দিয়ে সে সারাতে পারে বলে বিশ্বাস করত।

অন্য কোন মদকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, শ্যাম্পেনের উপর বিশেষ ঘেন্না, এর নাম দিয়েছিল 'মেয়েদের কুলকুচো'।

'তাহলে আপনি কি বলতে চান, ঝড় হবে?' অপোলিয়েভ আবার জিজ্ঞেস করল উদ্বেগ না দেখিয়ে কিন্তু লজ্জা পেল এই ভেবে যে তার গলার স্বর যে কেঁপে উঠল বুড়ো হয়ত তা টের পেয়েছে।

'ওতে আর কোন সন্দেহ নেই! সত্যিকারের ঝড়! এই বিস্কে উপসাগরটি অতি মারাত্মক জায়গা, বুঝলেন? যতবারই এটা পেরিয়েছি ঝড়ের সামিল হতেই হয়েছে!'

স্পষ্ট তৃপ্তির সঙ্গে গ্লাসটাকে শেষ করে টুপিটা নীচে টেনে চলে গেল সে।

অপোলিয়েভ দেয়ালের ঘড়িটার দিকে চাইল। আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। চা শেষ করে, চামড়ার কোট পরবার জন্য কিরিল্লভের সাহায্য নিয়ে আটটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল অপোলিয়েভ। জীবনে 'প্রথম ঝড়ের' অভিজ্ঞতা পাবে বলে উত্তেজিত বোধ করল কিন্তু মুহূর্তেই

তার মন চলে গেল সেই সুগন্ধী বাগানটিতে, লেনা আর তার গোলাপী গালের কালো তিল আর প্রিয় চোখ দুটির কাছে ...

'কী অপরূপ সেখানে, কিন্তু এখানে...' মনে মনে ভাবল তরুণ অফিসারটি।

ডেকে আসতেই একেবারে আলাদা অবস্থার মুখোমুখী হল সে।

এক পশলা জলকণা সমেত একটা তীক্ষ্ণ, হিমেল বাতাস বয়ে গেল তার উপর দিয়ে, দড়াদড়ির ভিতর দিয়ে বাতাসের গর্জন শুনতে পেল, দেখল ধূসর উত্তাল সমুদ্র, সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটা বইল অন্য খাতে, সমুদ্র সম্পর্কে।

উদাসীন ভাব নিয়ে বেপরোয়াভাবে সে ব্রিজের উপর উঠল যেন নরক হলেও সে ভয় পায় না, ঝড়-ঝাপ্টা তার কাছে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

## ৩

প্রথমটায় একটা প্রচণ্ড রকমের আতঙ্ক আসা সত্ত্বেও উত্তাল সমুদ্রের মহান দৃশ্য তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করল। পঞ্চভূতের প্রচণ্ড শক্তির সামনে 'প্রকৃতির সম্রাটের' হীনবল সম্পর্কে একটা নম্র উপলব্ধি আর ভয় ও শ্রদ্ধা জাগল তার মনে।

চারদিকে, যতদূর দৃষ্টি চলে, সমুদ্র একটা ফুটন্ত ফেনপুঞ্জ, পাহাড়-সমান ঢেউয়ের বিস্তৃতি যেন বিস্ফোরক শক্তিতে পূর্ণ হয়ে প্রচণ্ড গর্জনে তাদের রৌপ্য শীর্ষ গুঁড়ো গুঁড়ো করছে, ঢেউগুলিকে দূরে মনে হচ্ছে পাহাড়ের মত, কাছে আসতেই জল-ভরা প্রকাণ্ড পর্বত আর তারই মাঝখানে কখনো বা গভীর খাতে ডুবে, কখনো বা ঢেউয়ের উঁচু চূড়ায় উঠে ছোট্ট কালো জাহাজটি চলেছে ভেসে। জাহাজে পাল নেই বললেই চলে, উঁচু মাস্তুলগুলি আসন্ন ঝড়ের অপেক্ষায় নাবিয়ে নেয়া হয়েছে, জোর করে জাহাজের গতি ফেরান, ওপরের পাল সঙ্কুচিত।

প্রচণ্ডভাবে দুলতে দুলতে, এপাশ ওপাশ করে জাহাজ পথ কেটে এগুবার জন্য ঢেউয়ের মাথায় উঠছে, কখনো বা ডুবছে খাতের ভিতর। ঢেউয়ের কিছু অংশ অগ্রমাস্তুলের পুরোবর্তী ডেককে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর বাকিটা

প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানছে জাহাজের পাশে যার ফলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে হীরক চূর্ণের এক এক পশলা। জাহাজের উপর তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে বার বার, ঢেউয়ের চূড়া গড়িয়ে যাচ্ছে ডেকের উপর দিয়ে আর বেরুচ্ছে উল্টো দিকের ছোট্ট ছেঁদা দিয়ে ...

ভয়ঙ্কর উত্তাল ঢেউগুলি এগিয়ে আসছে... ঐ যে সে, জাহাজের পশ্চাদ্ভাগের উপর উঁচু হয়ে ছুটে আসছে। ছোট্ট একটা গোলার মত ছোটো জাহাজটির উপর পড়ে এই বুঝি তাকে আর তার দু'শ বাসিন্দাকে একেবারে সাবাড় করবে... কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটা ঢেউয়ের মাঝখানে জাহাজের সামনের ভাগ গেল ডুবে, খাড়া হয়ে ভেসে উঠল পিছনের অংশ। জলের একটা বিরাট পাহাড় ওর উপর ভেঙে পড়ল, আবার পিছনের ভাগটা গেল জলে ডুবে।

মাথার উপর দিয়ে একই দিকে ছুটে-চলা কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। মুহূর্তের জন্য সূর্য উঁকি মেরে ধূসর সমুদ্রকে উজ্জ্বল আলোয় ভরিয়ে দিচ্ছে, পরেই আবার ডুব মারছে মেঘান্তরালে। বাতাস ছুটে চলেছে প্রচণ্ড গতি, যেতে যেতে ঢেউয়ের চূড়াকে ছিন্নভিন্ন করছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে রূপালী শীকরধারা। মাস্তুলের দড়ির মাঝখানে বাতাসের ক্রুদ্ধ গর্জন, তাদের নাড়া দিচ্ছে, চাবুক মারছে — বাধা পেয়ে যেন রাগে ফুলে উঠছে...

নীল ফ্লানেলের সার্টের উপর তেরপলের পোষাক পরে পাহারাদাররা মাস্তুলের দড়াদড়ি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই ওরা চুপচাপ, গম্ভীর—নেই এতটুকু হাস্য পরিহাস। এক একটা উঁচু ঢেউয়ের শীকরধারা যেমনি ওদের আঘাত করছে, হাঁসের মত জল ঝেড়ে ওরা একবার উন্মাদ সমুদ্র আর একবার ব্রিজের উপর তাকাচ্ছে।

যেন শেকল দিয়ে বাঁধা — এমনিভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বয়স্ক ক্যাপ্টেন, পা দুটো ফাঁক করা, হাত রাখা ব্রিজের রেলিংএ। একবার দিগন্ত আর একবার পালের উপর তাকাবার সময় ওর মুখের ভাব দেখাচ্ছে প্রশান্ত। রাতভর জেগে আছে সে, ক্লান্ত, সমাহিত, বাত্যাক্ষুব্ধ মুখখানাকে মনে হচ্ছে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক। এখন দু'এক ঘণ্টার জন্য চলে যেতে চায় সে, কিন্তু যাবার

আগে ঠিক করল উঁচু পাল গুটোতে হবে যাতে কম প্রতিরোধে একমাত্র ঝোড়ো পালে আসন্ন ঝড়কে রোখা যায়।

তীক্ষ্ন কর্কশ গলায় হুকুম দিল অপোলিয়েভকে:

'উঁচু পাল গুটিয়ে ফেলো, নীচের পাল ছোট করো, পিছনের ঝোড়ো পাল আর সামনের দড়ির পাল তুলে দাও!'

'আচ্ছা, স্যার!' জবাব দিল তরুণ অফিসার, মুখের সামনে মেগাফোন এনে হাঁক মারল:

'উঁচু পালে যাও। তৈরী হও উঁচু পালের লোক!'

উঁচু পালের লোকেদের মাস্তুলের দড়ির উপর উঠতে সে হুকুম দিল: 'পাল গুটিয়ে মাস্তুলে রাখো!'

শক্ত করে দড়ি ধরে নাবিকরা ধীরে ধীরে সতর্ক হয়ে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। উপরে উঠে প্রচণ্ডভাবে দোল-খাওয়া মাস্তুলের ডাণ্ডির উপর বুকে হেঁটে এগুতে লাগল তারা। তরুণ অফিসার রুদ্ধ নিঃশ্বাসে উপরে-ওঠা ঐ ক্ষুদে মনুষ্য মূর্তির দিকে চেয়ে রইল। কাঁপা দণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুলছে এদিক থেকে ওদিকে, সেই আতঙ্কজনক হাওয়ার বুকে গুটোচ্ছে পাল। মনে হল যে কোন মুহূর্তে একটা লোক জলে ছিটকে পড়তে পারে। মাস্তুলের দণ্ডটির ওপর তার ভয়-পাওয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ। ক্যাপ্টেন ও প্রধান অফিসারও ওদের উপর নজর রাখল। স্পষ্টই ওরাও অপোলিয়েভের মতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

নাবিকরা কিন্তু হাত ও পা দিয়ে শক্ত করে আটকে রইল। যতক্ষণ না কাজ শেষ হল ওরা এক হাতে মাস্তুলের দণ্ড ধরে আর এক হাতে ভারি ক্যানভাসের পাল গুটোতে লাগল। কাজটা শেষ হলে অপোলিয়েভ হাল্কা বোধ করে হুকুম দিল:

'উঁচু মাস্তুলের লোক, ডেকে এসো!'

এর পর টাঙান হল ঝড়ের পাল। ক্যাপ্টেন তার স্বভাবসিদ্ধ কর্তৃত্বের সুরে বলল:

'কোন কিছু হলে, আমাকে ডেকো... আর খেয়াল রেখো হালে যেন ওরা সতর্ক থাকে!' কর্ণধারদের কানে যাতে কথাটা যায় এ জন্য চেঁচিয়ে বলল সে।

বিশ্রামের জন্য কেবিনে গেল ক্যাপ্টেন। প্রধান অফিসার অপোলিয়েভের সঙ্গে ডেকে রইল।

পাহারা শেষ হওয়া অবধি অপোলিয়েভ তার কাজে বেশ সহজ বোধ করল, ঝড়ের আতঙ্কও কমে এল অনেকটা। দুপুরে ছুটি হতে এমন একটা গর্বিতভাবে ঢুকল অফিসারদের ঘরে যাতে মনে হয় সে 'সবকিছুর ভিতর দিয়ে এগিয়ে এসেছে,' কিন্তু কেউ তার এ ভাব খেয়াল করল না।

খারাপ আবহাওয়ায় জাহাজের রান্নার ব্যাপার তচনচ হয়ে গেছে, সুতরাং লাঞ্চে জুটল শুধু ঠাণ্ডা খাবার: শুকরের মাংস আর টিন খাদ্য। টেবিলের উপর আটকান কাঠের তাকে খাবার দেওয়া হল। তাকের ফাঁকে ফাঁকে রাখা হল বিভিন্ন খাবার আর তোয়ালে-জড়ান বোতল প্রভৃতি। আর্দালিরা কষ্ট করে খাবার পরিবেশন করল। জাহাজ এপাশ ওপাশ করছে — পা ঠিক রাখা কঠিন। সবাই চুপচাপ, চট করে খাওয়া শেষ করল। ফুর্তিবাজ স্বাভাবিক কথাবার্তা নেই, অনেকেরই খিদে ছিল না। কেবল স্বাভাবিক সেই বুড়ো নৌ-চলাচল অফিসার একাই মেরে দিল দু'জনের মত, লাঞ্চের পাওনা এক বোতল মার্সালা খেল।

খাওয়া শেষ হলে চলে গেল যে যার কেবিনে।

### ৪

রাত্রি আসতে প্রচণ্ড বাতাস ঝড় হয়ে উঠল।

অপোলিয়েভ পোষাক পরে ঘুমোতে যাচ্ছিল, জেগে উঠল একটা তীব্র বাজ পড়ার আওয়াজে। চোখ মেলে দেখে বিদ্যুতের আলোয় সমস্ত কেবিনটা ভরে গেছে। পরেই আবার অন্ধকার, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গর্জন।

অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে দরজার দিকে এগুল, পড়ো পড়ো করে এল নাবিক-ডেকের উপর। জাহাজটা সবদিকেই কাৎ হচ্ছে। একটি নাবিকও ঘুমিয়ে নেই। নাবিকদের ঝুলোনো বিছানাগুলো খালি। ছুটি-পাওয়া

পাহারাদাররা ভয়-পাওয়া বিবর্ণ মুখে ছোট ছোট দলে জড়সড় হয়ে বসে আছে। অনেকেই দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, ফিস ফিস করে প্রার্থনা বলে ক্রুশচিহ্ন আঁকছে। দোল-খাওয়া লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় আতঙ্কিত লোকগুলোর চেহারা অবসাদগ্রস্ত। এদের একজন জোরে গুঙিয়ে বলে উঠল, 'পরিষ্কার সার্ট পরার সময় হয়েছে। এই আমাদের শেষ!'

সঙ্গে সঙ্গে সারেঙ্গ লোকটাকে একচোট গালিগালাজ দিয়ে ভারি গলায় বলল:

'চোপরাও!... লোকদের ভয় দেখাচ্ছ! তোমাকে শিক্ষা দেব! তোমরাই আবার নাবিকের পরিচয় দাও!'

প্রচুর শাপান্তের সঙ্গে বক্তব্য শেষ করতে নাবিকরা একটু চাঙ্গা হল।

সকালের মত মূর্তিরক্ষক বুড়ো শেচর্‌বাকভ ইঞ্জিনঘরের দরজায় বসে একদল লোককে বাইবেল পড়ে শোনাচ্ছে।

বাজের ডাকের ফাঁকে ফাঁকে তার একঘেয়ে, গম্ভীর ও একটানা গলা কানে আসছে।

'ঠিক সেই দিবসটিতে যীশু ঘরের বাহিরে আসিলেন এবং সমুদ্রের তীরে বসিলেন। বিরাট একদল লোক তাঁহার চারিপাশে ভিড় করিল, তিনি একটি জাহাজে গেলেন এবং সেইখানে বসিলেন আর সমস্ত জনতা সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া রহিল...'

দু' হাতে সিঁড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে কিরিল্লভ, আপন মনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

'কিরিল্লভ না কি?' অপোলিয়েভ ডাক দিল।

'হ্যাঁ স্যার!'

'হায় ভগবান, তুমি কাঁদছ না কি, এ্যাঁ?'

'ভয় লাগছে, স্যার। আর শেচর্‌বাকভ এমন করুণভাবে পড়ছে।'

'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত... তুমি কি নাবিক নও?'

'হ্যাঁ, স্যার!' চোখের জল বন্ধ করার কঠিন চেষ্টা করে বলল সে।

'বেশ, তাহলে নাবিকের মত আচরণ করো। এসো, ওরকম বাজে ব্যাপার আর করো না!' সদয় কণ্ঠে বলল তরুণ অফিসার। 'আমরা সত্যি এমন কিছু

বিপদে পড়িনি, বুঝলে!' নিজেই বিবর্ণ ও উত্তেজিত, ভৃত্যের পিঠ চাপড়াল সে। সিঁড়ির হাতল ধরে আগল খুলে গেল ডেকের উপর।

অবলম্বন হিসেবে জাহাজের কামান ধরে ব্রিজের তলায় জাহাজের পিছন দিকে এগুতে লাগল। সেখানে পেঁৗছে চারদিকে চেয়ে যা দেখল তাতে আতঙ্কে সে কাঠ হয়ে গেল।

জাহাজটা পাগলের মত ঢেউয়ের বুকে ডুবছে আর ঢেউগুলো তার পাশ কেটে হা হা করে ছুটে চলেছে। বজ্রপাত আর বিদ্যুতের ঝলকানি চলেছে সমানে, আনত ঝড়ের মেঘকে চিরে দিচ্ছে আঁকাবাঁকা অগ্নিশিখায়, পাহাড়-সমান ঢেউয়ে উত্তাল সমুদ্র এবং জায়গায় জায়গায় জাহাজের বিধ্বস্ত পাশসহ ডেকটাকে উজ্জ্বল করে তুলছে। একটা নৌকো খসে গেছে ইতিমধ্যে।

মনে হচ্ছে ঝড় এখন সবচাইতে প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে, জাহাজটাকে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার উপর। জাহাজ কিন্তু নিজেকে সামলে রেখেছে, ঢেউয়ের মাথায় ঠেলে উঠে, খাতের গভীরে ডুবে এগিয়ে চলেছে বিপজ্জনক পথ ধরে, যন্ত্রণায় যেন তার সারা শরীর থেকে একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ আর গোঙানির আওয়াজ উঠছে। নাবিকরা জাহাজের পিছন ভাগে আর কোয়ার্টার ডেকে জড় হয়ে লম্বা করে টাঙান দড়ি ধরে আছে। প্রতিবার বিদ্যুৎ যেমনি একটা চোখ-ধাঁধান ঝলকানি দিচ্ছে অমনি ওরা ক্রুশচিহ্ন আঁকছে।

হালের কাছে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন, কোন পথে সংক্ষেপে পার হওয়া যায় ছজন কর্ণধারকে দিচ্ছে সেই নির্দেশ। তীক্ষ্ন আদেশের বাণী! লণ্ঠনের আলোয় তার পরিশ্রান্ত, গম্ভীর, ফ্যাকাশে মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাশে দাঁড়িয়ে প্রধান নৌ-চলাচল অফিসার ইভান ইভানিচ ও প্রধান অফিসার।

প্রথম কয়েক মিনিট তরুণ অফিসারকে আঁকড়ে ধরল মৃত্যুবৎ আতঙ্ক, ধীরে ধীরে সেটা ডুবে গেল এক ধরনের অনড় জড়ত্বে।

'জাহাজ ডুবলে আমরা নির্ঘাৎ মারা পড়ব!' চিন্তাটা খেলে গেল মনে।

কিছু একটা ধরে সে দাঁড়িয়ে রইল স্তম্ভিত, নির্বাক।

'ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন!' তার থেকে সামান্য দূরে দাঁড়ান সঙ্কেতকারীর গলা পাওয়া গেল। 'ওই যে, দেখুন, স্যার!'

অপোলিয়েভ আগেই দেখেছে। অনতি দূরে বিদ্যুতের আলোয় একটা ডুবন্ত জাহাজের ছায়ামূর্তি ভেসে উঠল। নাবিকদের চেহারা দেখতে পেল সে, হতাশায় হাত বাড়ান। আপনা থেকেই চোখ বন্ধ হল তার।

আর একবার বিদ্যুতের ঝলকে সমুদ্র উজ্জ্বল হল কিন্তু জাহাজটা আর নেই।

অপোলিয়েভ ক্রুশ করল, তার পাশের নাবিকদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস।

'সবাই ডুবে গেল রে!' বলল একজন।

* * *

অপোলিয়েভ ডেকেই থাকল, দেখতে লাগল ঝড়ের তাণ্ডব। এক ঘণ্টা, দু' ঘণ্টা — ঠিক ক' ঘণ্টা নিজেও জানে না।

শেষটায় মনে হল ঝড়টা একটু কমে এসেছে। নীচে গেল সে।

সেখানে আগেরই মত আতঙ্কের রাজত্ব। শ্চেরবাকভ বাইবেল পড়ে চলেছে।

তরুণ তার বিছানায় গিয়ে হাত পা ছড়িয়ে দিল, কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুম এল না। এই মাত্র যা সে দেখেছে তাতে অস্থির লাগছে। শেষ পর্যন্ত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হল সে।

## ৫

যখন ঘুম ভাঙল কেবিনে স্পষ্ট দিনের আলো। বাঙ্কের উপর উঠে বসল, সানন্দ বিস্ময়ে লক্ষ্য করল জাহাজটা দুলছে একেবারে অন্যভাবে — স্থায়ী, স্বাভাবিক দোলন। কেবিনের দরজা দিয়ে মাথা বার করে

দেখল নাবিকরা নিজেদের ভিতর ফুর্তি করে কথাবার্তা কইছে। সমস্ত ছেঁদা খোলা, ভাপসা গন্ধ নেই আর।

'কিরিল্লভকে পাঠিয়ে দাও!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

কিরিল্লভ হাজির হল, খুব খুশি দেখাচ্ছে তাকে।

'গুড মর্নিং! ঝড়টা থেমেছে তাহলে, কি বলো?'

'হ্যাঁ, স্যার!'

'বলেছিলাম কি না ঝড়কে আমরা রুখতে পারব!'

'হ্যাঁ, স্যার!'

অফিসারদের ঘরটি সবচাইতে সরগরম। সবাই হাজির। ঝড় নিয়ে চলছে আলোচনা। জাহাজের কাঠামোর সামান্য ক্ষতি আর একখানা নৌকো খোওয়া যাওয়া ছাড়া 'সোকল' ঝড়কে সামলিয়েছে চমৎকার। ডুবে-যাওয়া জাহাজটি নিয়ে কিন্তু তারা কোন আলোচনা করল না।

'একটা পাকা রকমের ঝড়। বেশ একটা নাড়া দিয়ে গেল আমাদের!' বলল বুড়ো নৌ-চলাচল অফিসার। 'এখনো পর্যন্ত তেজে বাতাস বইছে!.. যাক, কুছ পরোয়া নেই ... ব্যারোমিটারের পারাটা উঠছে!' বলেই দু'গ্লাস ব্র্যান্ডির সঙ্গে চা গিলে ডেকে গেল 'সূর্য পর্যবেক্ষণ করতে'।

তখনও আবহাওয়াটা খারাপ, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে চা খাওয়া সম্ভব। গতকালের না-খাওয়াটাকে পোষাবার জন্য অপোলিয়েভ চায়ের সঙ্গে আধ টিন বিলিতি বিস্কুট মেরে দিল। ঐ সঙ্গে ফুর্তিবাজ আদুরে লাইকা আর মোটা সোটা ভাসকাকেও খাওয়াতে ভুলল না।

এর পর সে গেল সমুদ্র দেখতে।

বুঝতে পারা যায় সমুদ্র শান্ত হয়ে আসছে। বড় ঢেউগুলো তখনও ভাঙছে বটে কিন্তু তাদের আর আগের প্রচন্ডতা নেই। জাহাজটি উঁচু পাল গুটিয়ে একটানা সতেজ বাতাসে এগার সমুদ্র মাইল বেগে তর তর করে এগিয়ে চলেছে।

ছুতোর মিস্ত্রীরা লেগে গেছে জাহাজের পাশের ভাঙ্গাচোরার মেরামতির কাজে, ওদের গুন গুন গান শোনা যাচ্ছে।

## ৬

দুদিন বাদে কিরিল্লভ সকাল আটটায় তার কর্তাকে ডেকে তুলল।

'স্যার! আলেক্সান্দ্র ইভানিচ! উঠুন, স্যার! আমরা মাদেইরায় পৌঁছিলাম বলে!'

প্রচুর ঝাঁকুনির পর উঠল সে।

'শীগগিরই নোঙর করব আমরা। দিনটা আশ্চর্য!' কিরিল্লভের কণ্ঠ খুশিতে ভরা।

অপোলিয়েভ চট করে পোষাক পরে ছুট মারল ডেকে।

চোঙা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বার করে জাহাজটি বাষ্পে এগিয়ে চলেছে একটা খাড়া, পাহাড় ঘেরা দ্বীপের দিকে। দ্বীপটা ঝাপসা কুয়াশায় ঢাকা। ঝড়ে যে ক্ষতি হয়েছিল তা মেরামত এবং সাফাই ও পালিশের পর চোখ ধাঁধান রোদে জাহাজটি ঝলমল করছে। সূর্য উঠছে ধীরে ধীরে নির্মেঘ নীল আকাশের বুকে। একটু আগেই যে সমুদ্র তাদের ভীষণ আতঙ্কে ফেলেছিল সে এখন শান্ত ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে। এর মন-ভোলান স্বচ্ছ নীল লেহন করছে স্থিরগামী জাহাজের পার্শ্বদেশ।

## ১

ট্রানসুন্দের পথে, যেখানে বাল্টিক নৌবহরের শিক্ষার্থী নৌবাহিনী সংক্ষিপ্ত গ্রীষ্মের বেশীর ভাগ সময়টুকুর জন্য নোঙর করে আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে লোহার পাতে মোড়া 'গ্রজিয়াশ্চি'। এর নায়ক একজন বয়স্ক রিয়াঁর এডমিরাল — নৌবাহিনীর ফ্ল্যাগ অফিসার সে। 'নাবিক জীবনের' কাজের মেয়াদ শেষ করে ভাইস এডমিরাল ও বড় ফ্ল্যাগ অফিসারের পদ দখল করতে চলেছে।

জুনের শেষ ভাগের ঠাণ্ডা ও মেঘলা দিনের বারোটা বেজে গেছে। নাবিকরা এইমাত্র যুদ্ধ-জাহাজগুলিতে ডিনার খেয়েছে, সারেঙ্গরা তাদের বিশ্রামের সঙ্কেত জানিয়েছে।

পাঁচ মিনিট বাদে দেখা গেল 'গ্রজিয়াশ্চির' সারেঙ্গ জ্‌দানভ তার ছোট্ট, গোছান কেবিনটিতে বসে চা খাচ্ছে আর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। ঘরটির সাজসজ্জা কম সম্ভ্রান্ত নয়।

ধূসর পশমী কম্বলে সুন্দর করে মোড়া এবং মাথার দিকে রাখা সাদা ওয়াড়-পরান দুটো বালিশশুদ্ধ বাঙ্কের উল্টো দিকের পার্টিশনের উপর যথাভাবে সাজান উপরওয়ালাদের ফটো। এর মধ্যে আছে ক্রনস্টাড্‌টের ফাদার জোহান এবং 'গ্রজিয়াশ্চির' নায়কের ছবি। এগুলো নক্সা-কাটা সুন্দর ফ্রেমে বাঁধান, সারেঙ্গকে 'উপহার' হিসাবে দেবার জন্য এক নাবিকের তৈরী।

বাঙ্কের উপরে একটা শস্তা কম্বলের মাঝখানে আকাশ-নীল রঙের ফ্রেমের উপর হাতে আঁকা ফরগেট-মি-নট ফুলের ছবি আর তারই ভেতরে কেবিনেট মাপের একটি যুবতীর ফটো — মুখটি সুন্দর, বলিষ্ঠ রূঢ় গড়ন, আংটি দেখাবার জন্য তার অত্যধিক বড় হাতের আঙ্গুলগুলো স্পষ্টই লম্বা করে আঁকা, ছোটখাট গলায় একটা ব্রুচ, কানে দুল।

বলা বাহুল্য যে এই সুন্দর পোষাক আর পালকের টুপি পরা এই রমণী সারেঙ্গ জ্‌দানভের স্ত্রী।

সে আদৌ আগেকার দিনের সারেঙ্গদের মত নয়, সেই সব সাহসী নাবিকের দল যারা বীরত্বের কাজ করত অথচ কখনো জানত না যে তারা বীর, সেই যাচ্ছেতাই রকমের গালিবাজ লোক, তীরে পৌঁছে বেপরোয়া মদ্যপায়ী, চাষাড়ে কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির নয়, কখনও যারা সঙ্গীদের অবজ্ঞা করে না, তাদেরই মত হতভাগা নাবিকদের স্বাভাবিকভাবে নিজেদের সঙ্গী ভাবে এবং উপরওয়ালা অফিসারদের কাছে 'কথা লাগান'কে সারেঙ্গের উপযুক্ত কাজ বলে মনে করে না।

তারা আরও জানত, যে সারেঙ্গ ঠিকমত চলবে না কিম্বা বেপরোয়াভাবে মারধোর করবে, নাবিকদের অলিখিত নিয়মমতে তাকে ঠিক পথে আনা হবে।

জ্‌দানভ ছিল আধুনিক কায়দার সারেঙ্গ এবং স্বভাবতই সংস্কৃতির অতুলনীয় উচ্চ স্তরে আসীন। খাটো, বলিষ্ঠ গঠন, বছর তিরিশের যুবক, ঝোঁকটা মেদবাহুল্যের দিকে। পরে ছিমছাম পোষাক, জানে আদব কায়দা, গলার স্বরটাকে সম্ভ্রান্ত পর্যায়ে রাখে। চোখ দুটো বড় এবং গোল—তাতে

একটা ঝানু, কড়া দৃষ্টি, মুখটা ছুলি ভর্তি গোলাপী সাদায় মেশা, গম্ভীর ও আত্মতুষ্ট, ছোট করে ছাঁটা লাল্‌চে চুল আর ঘোর লাল ছোট্ট দাড়ি। পরিষ্কার হাতের অনামিকাতে সোনার তৈরী বিয়ের আংটি আর কনিষ্ঠাতে নীলকান্ত মণি।

ভদকা বা অন্য মদ সে খায় না, শুধু কখন সখন বীয়ার টানে। তার শাপশাপান্ত সুস্থির, সংক্ষিপ্ত এবং ফলপ্রদ — ঝানু গালিবাজের একটানা রস নেই তাতে।

অহঙ্কার ও হামবড়াভাবে ডগমগ হয়ে নাবিকদের থেকে নিজেকে সে দূরে রাখে পাছে 'সাধারণ অসভ্য লোকদের' সঙ্গে 'মেলামেশায়' তার সম্মানের হানি ঘটে। তার মত দরের সারেঙের সঙ্গে ব্যবহারে যে দূরত্ব রেখে চলা দরকার তা ভুলে যাওয়া ওদের পক্ষে অসম্ভব নয়, সে এমন লোক যে সবদিক থেকে ওদের অনেক উপরে। সে কি আর এমনিই 'আলোক' পত্রিকার গ্রাহক, বই পড়ুয়া! নিজেকে সে এমনি জবর চতুর আর সূক্ষ্ম বুদ্ধিমান মনে করে, পৃথিবীতে তার নিজের উন্নতির জন্য সে সদা সচেষ্ট।

নাবিকরা যাতে মনে রাখে তেমনি কঠোরতা নিয়ে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করে, যারা শৃঙ্খলা মানে না তাদের উপর সে বিশেষ করে নির্দয়। কোন প্রতিবাদই সহ্য করে না সে। অপর দিকে অফিসারদের সামনে সে স্বয়ং শ্রদ্ধার প্রতিমূর্তি।

জ্‌দানভ নাবিকের কাজ ভালবাসত না, বিশেষ করে সমুদ্র তার অপছন্দ, ওর ভয়ঙ্কর মূর্তিকে সে ভয় পায়। কিন্তু সারেঙ্গ হিসাবে সে ছিল চটপটে আর উৎসাহী, সাড়ম্বরে সে তার পাণ্ডিত্য আর নিখুঁত আচরণ জাহির করত অফিসারদের সামনে।

অবস্থার সুযোগ নিয়ে জ্‌দানভ তার ভবিষ্যত গোছাবার জন্য যে সব পথ নিয়েছিল তা খুব নীতি-সঙ্গত নয়। ছ' বছর নাবিক জীবনে সে বেশ দু'পয়সা বানিয়েছে। কৃপণ ও চতুর, কাজ থেকে ছাড়া পাবার পর ব্যবসা করবে বলে মতলব এঁটেছে।

নাবিকরা এই উদ্ধত ও পীড়ক সারেঙ্গটিকে ভয় ও অপছন্দ করত — কিন্তু তাতে ওর কোন দুশ্চিন্তা নেই। সে জানত নাবিকদের উপর ওর এই কঠোরতা তার ক্যাপ্টেন ও প্রধান অফিসারের তারিফ ও সমর্থন পাবে। নাবিকরা ওর নামে অভিযোগ করতে সাহস পাবে না। এ ব্যাপারে তারা 'নির্ভরযোগ্য', তাছাড়া, ওরা হাতের মুঠোয়।

একটি মাত্র ব্যতিক্রম অবশ্য আছে — সেটি হল 'গ্রজিয়াশ্চিতে' প্রথম বছর কাজে লাগা একজন নাবিক। এর উপর সারেঙ্গের উদ্বেগ আর বিরক্তি নিয়ে নজর রাখতে হয়।

'লোকটা রীতিমত বেপরোয়া!' সারেঙ্গ ভাবে।

যদিও সে জানে নাবিকদের বিশ্রামের সময় বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তাদের বিরক্ত করার অধিকার ওর নেই, তবু সে 'বেপরোয়াকে' ডেকে পাঠাল।

## ২

কালো-পানা খর্বাকৃতি তরুণ নাবিকটি সারেঙ্গের কেবিনে ঢুকে বিন্দুমাত্র ভয়ের লক্ষণ না দেখিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়াল, সারেঙ্গ টের পেল তার নিজের মধ্যে বিরক্তির একটা অস্বস্তিকর ভাব ঠেলে উঠছে।

ধীরেসুস্থে চা শেষ করতে লাগল সে, ইচ্ছা করেই উপেক্ষা করল নাবিকটিকে।

শেষটায় তার উপর কঠোর, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে গলা নাবিয়ে ধীরে ধীরে অর্থপূর্ণভাবে বলল:

'মিত্যুশিন!'

'হুঁ!'

'আশা করি তুমি আন্দাজ করতে পারছ, কেন তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি?'

'আন্দাজের ব্যাপারে আমি কাঁচা!' মিত্যুশিন জবাব দিল।

নাবিকটি সারেঙ্গকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করল না, বা তার নাম বা পৈত্রিক নামে (ইভান আর্তেমিয়েভিচ) ডাকল না। সে দিব্যি দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

সুন্দর কালচে তার স্বাভাবিক চঞ্চল মুখটিতে একটা গম্ভীর ভাব স্পষ্ট। একটানা, নিষ্প্রাণ, স্বভাবসিদ্ধ মৃদু স্বরে একটা চাপা বিদ্রূপ, তীক্ষ্ণ কালো চোখ দুটোতে ফুটে উঠল ব্যঙ্গাত্মক হাসি।

'দেখো, কী ভাবে শয়তানটা তার সারেঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে আছে!' জ্‌দানভ বলল মনে মনে।

'একবার চেষ্টা করে দেখো!' বিরক্তিতে লাল হয়ে বলল সে।

'কী নিয়ে আমাকে আন্দাজ করতে হবে?'

'একটা বিষয় জেনো যে আমি লোকের ভিতরটা দেখতে পাই, তার আগাগোড়া বুঝি।'

মিত্যুশিন কিছুই বলল না। তার এই স্তব্ধতার মাঝেও একটা বিদ্রূপের ভাব আছে।

'আমার কথার মানে বুঝলে?'

'বোধ হচ্ছে, না!'

'তবু তুমি নিজেকে কত বড়ই না মনে করো, তাই না?' জ্‌দানভ ঠাট্টা করল।

মিত্যুশিন এই মন্তব্যটাকেও যেতে দিল। ওর চোখ দুটো শুধু হাসতে লাগল। পাতলা উঁচু ঠোঁটের কোণাটা কুঁচকে উঠল, মুখে ফুটল একটু উদ্ধত ভাব।

লোকটির অ-গোপন ঘৃণা সারেঙ্গের দৃষ্টি এড়াল না। ওর চোয়ালটা থেঁৎলে দিতে পারলে তার কী আনন্দই না হত! কিন্তু সে 'বেপরোয়াকে' ভয় করে। ওর কাছ থেকে যে কোন জিনিষ আশঙ্কা করা যায়।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে নিজেকে সামলাতে না পেরে সারেঙ্গ ধীরে ধীরে কঠিন শাসানির ভাব নিয়ে বলল:

'মনে রেখো কঠিন বিপদে না পড়ো!'

মিত্যুশিন একঘেয়েমী ও ঔদ্ধত্যভরে হাই তুলল, প্রশ্ন করল গা-ছাড়া ভাবে:

'কী বিপদ?'

'ন্যাকামি করো না... আমি তোমার এতটুকু বেয়াদপি সইব না... কার সঙ্গে কথা কইছ বলে মনে করো।'

'সারেঙ্গের সঙ্গে।'

'সতর্ক হও বলছি!' নিজেকে সামলাতে না পেরে জ্‌দানভ ভীষণভাবে চে'চিয়ে উঠল।

'কিসের জন্য সতর্ক?'

'তোমাকে আমি সারেঙ্গ কি জিনিষ দেখিয়ে ছাড়ব!'

'তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। তোমার মত সারেঙ্গ আমার দেখা আছে। কাজ আমি ঠিকমত করছি আর আইনও আমার জানা আছে।'

'বটে, তোমার জানা আছে!' ভয় দেখিয়ে বলল সারেঙ্গ, মুখ ফ্যাকাশে।

'খুব জানা আছে!' উদ্ধতভাবে বলল নাবিক।

জ্‌দানভ এমনভাবে লাফিয়ে উঠল যেন কিছুতে তাকে কামড়ে দিয়েছে। রাগ-রুদ্ধ গলায় বলল:

'তুমি ভেবেছ আমি জানি না কোন খেলা খেলতে যাচ্ছ তুমি। জঘন্য নাবিক-উকিল, বিদ্রোহের কোন চিন্তা তোমার মাথায়?.. লোকগুলোকে ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছ তোমার ঐ অধিকার ও অন্যান্য কথা বলে। তোমার কর্তৃত্ব ফলাচ্ছ সব জায়গায়। "আমি জানি কিসে কী হয়, কোন কিছুকে পরোয়া করি না, কিন্তু তোমরা সব মুখ বুজে সহ্য করো..." যেন জানি না নিজেকে তুমি কত চতুর ভাব, তোমার উপরওয়ালা অফিসারদের উপর টেক্কা মারতে চাও অথচ সামরিক নিয়মমত তোমার তাদের সম্মান করা উচিত। কিন্তু মনে রেখো আমি তোমার রস মজাব। তোমাকে সিধে করে ছাড়ব। আর তাতে যদি না হয় কয়েদী বানাতে দেরী লাগবে না। চাবুক পড়লেই আইনটা টের পাবে, যদি তাই বাসনা হয়ে থাকে। যদি জানিয়ে দিই তুমি কী ধরনের পাল-ছাড়া গরু তা হলে অবশ্য এর আগেই শায়েস্তা হবে। শিক্ষা পাবে নাবিকদের মধ্যে নষ্টামী করার ফল কী...'

নাবিকের চোখে ফুটল একটা ক্রুদ্ধ ঝলক। 'বেশ, লাগাও আমার নামে।' জ্বলে উঠল সে। 'যাও গিয়ে মিথ্যে বলো! আমি আমার অধিকার নিয়ে লড়ব!'

'চোপরাও! এতদূর স্পর্ধা তোমার!'

'আমি ত তোমার চতুর বক্তৃতা শুনলাম, এবার পাল্টা হিসেবে আমারটা শোনো!' উত্তেজিত দৃঢ়তা নিয়ে বলল মিত্যুশিন। 'এখানে কোন সাক্ষী নেই। আমার মনে হয় না তুমি জানো, লোকে তোমাকে কী রকম জঘন্য আর ঘুসখোর বলে মনে করে। যাও, লাগাও গে, মিষ্টার সারেঙ্গ... আমার উপর আইন খাটাও... পরোয়া আমি করি না! তুমি যে নাবিকদের কাছ থেকে টাকা নাও আর তাদের দিয়ে কাজ করাও হয়ত বা সেই সত্য প্রকাশ পাবে। কেউ তোমার চেয়ার বানায়, কেউ সেলাই করে, কেউ বানায় বুট কেউ বা করে চাকরের কাজ... আমাদের মারা আইন বিরোধী, কিন্তু তুমি সারেঙ্গরূপী নোংরা ঝাঁটা, তাই পাতি অফিসাররা ঘুঁষি মেরে আমাদের দাঁত ভাঙে... তোমরা খুব ভাল করেই জান লোকেরা অভিযোগ করতে ভয় পায়, তাই তাদের নির্যাতন করো! তুমি যা জান তা হচ্ছে চারদিকে হাতড়ে বেড়ান, কোথায় টাকার গন্ধ আছে তাই চাও জানতে, ঐটেই তোমার ভগবান... ঈশ্বর শুধু তোমার মুখে — আত্মার মধ্যে তোমার আর্থিক লোভ আর যথেচ্ছাচার! তুমি আমাকে বলছ নাবিক-উকিল আর গোলমেলে লোক কারণ আমি বলে থাকি এমন বিবেকহীন লোক আছে যারা আইনের ব্যভিচার করে। তোমাকে অন্যায় করতে দেখে তাই যদি ফাঁস করে দিই, অমনি তুমি তাকে বলবে বিদ্রোহ! এই যে, এখানে দেখছি আমারই মত একজন যে একদিন ছিল পায়ের নীচে ঠিক আমারই মত, আজ আমাকে শাস্তি আর চাবুকের ভয় দেখাচ্ছে... তুমি ভাবছ এতে আমি ভয় পাব, আর সবার মত হব। চালাক, তাই না? তুমি নাকি মানুষের ভিতরটা দেখতে পাও, কিন্তু তুমি যা দেখতে পাও না তা এই যে সব মানুষই শুয়োরের মত নীচ নয়, দু'পয়সার জন্য সবাই আত্মাকে বিক্রি করে দেয় না। আমি বলতে পারি প্রধান অফিসার জানেন না তুমি কত জঘন্য ধরনের শয়তান!'

সেই ওস্তাদ সারেঙ্গটি যে নিজেকে নাবিকদের রাজা আর জাহাজের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ লোক বলে মনে করত, এই আক্রমণের দুঃসাহসিকতায় এমনই স্তম্ভিত হল যে সেই ক্রুদ্ধ বক্তৃতার জোয়ারকে রুখবার চেষ্টাও করল না সে।

ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে নাবিকের উপর তুলে ধরল উদ্যত মুষ্টি। মৃত্যুবৎ নীল হয়ে মিত্যুশিন নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তোমার এত বড় সাহস', বলল সে। 'তোমার ওই থোঁতা মুখ ভোঁতা করে ছাড়ব!'

জ্দানভ মুখ ঘুরিয়ে ঘুঁষি নাবিয়ে নিল। ক্রোধে রুদ্ধশ্বাস হয়ে ধীরে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল:

'সবুর করো, তোমার অধিকার নিয়ে কেমন দাঁড়াও টের পাওয়াব! সারেঙ্গকে অপমান করা কী জিনিষ বুঝবে তখন। বেরিয়ে যাও!'

'যাও, গিয়ে আমার নামে লাগাও, বিশ্বাসঘাতক! মনে থাকে যেন নিজে না এ জন্য সাবাড় হও... তুমি বিদ্রোহ খুঁজে বার করেছ একথা সবাই বিশ্বাস করবে না।'

ঘেন্নার সঙ্গে কথাগুলো বলে মিত্যুশিন কেবিন থেকে বেরিয়ে এল।

## ৩

নাবিকরাও মিত্যুশিনকে বলত 'বেপরোয়া'।

তারা এই 'মাথাওয়ালা', অস্থির, ছোট্ট মানুষটিকে দেখে অবাক হত। সে 'কোন কিছুকে ভয় করে না,' অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় বলিষ্ঠভাবে আর আইনের বিরুদ্ধে কাজ হলে 'দুশ্চিন্তায় পাগল হয়'।

নাবিকরা কৌতূহল নিয়ে তার আবেগময় বক্তৃতা শুনত কিন্তু এই নাবিক-উকিলটিকে বিশেষ পছন্দ করত না এবং ওর তিক্ত ভাষণ আর বিদ্রূপোক্তির জন্য লজ্জা পেত। প্রায়ই তারা এই ভেবে অবাক হত, অন্য সব দিক থেকে আদর্শোচিত এই নাবিকটি কেন 'এত উত্তেজিত হয়ে ওঠে', সঙ্গীদের নিয়ে কেন ওরকম বিদ্রূপ করে।

'এক কথায় বেপরোয়া, ঐ হল ওর স্বভাব, নিজেকে ভাবে হামবড়া!' এই ছিল ওর সম্পর্কে সাধারণ মত।

'বেপরোয়া' জানত ন্যায়ের জন্য তার এই যে উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা তাতে কারও সহানুভূতি নেই, তার কটু কথার জন্য সবাই তাকে অপছন্দ করে এবং সে সংগ্রাম করে চলেছে একাই।

এ সত্ত্বেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লোকগুলোর মধ্যে একটা প্রতিবাদের মনোভাব সৃষ্টি করতে সে কসুর করত না, যারা অসাড় প্রকৃতির তাদের খোঁচা মেরে কথা বলত।

তার অন্তরের দংশনময় অস্থিরতার সঙ্গে যুক্ত হল অপমানের গভীর ক্ষত! নাবিকদেরই একজন তার বিরুদ্ধে ঐ সারেঙ্গ ইঁদুরটাকে লাগিয়েছে! কিন্তু কেন? যেহেতু মিত্যুশিন নাবিকদেরই মঙ্গলের জন্য ন্যায় বিচার চায়!

সে জানে সারেঙ্গকে কথা শুনিয়ে সে শৃঙ্খলা ভেঙেছে — 'এ জন্য ফ্যাসাদে পড়তে হবে'। 'ঐ শূকরটা যদি প্রধান অফিসারের সামনে মিথ্যের বোঝা জড় করে তাহলে সামরিক বিচারও হতে পারে!' চিন্তা করল সে।

সত্যের জয় সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে যখন সে কল্পনা করত কয়েদী হবার পর 'আইন অনুসারে' নিষ্ঠুর চাবুক খাওয়ার অপমানকর দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে সে, সেই মুহূর্তটিতে নিজেকে দুর্বল লাগত।

'বেপরোয়া' অবশ্য যা ঘটেছে তার জন্য দুঃখ করল না, বরং একটা নৈতিক আনন্দ পেল। সারেঙ্গকে এক হাত নিতে পেরেছে বলে কিছুটা যেন স্বস্তিও বোধ করল।

'আমি অন্ততঃ বুঝিয়ে দিয়েছি ও কতখানি জঘন্য!' ভাবল মিত্যুশিন।

তার মনে হল সারেঙ্গ এর মধ্যেই প্রধান অফিসারকে তার অমার্জিত অবাধ্যতার কথা বলেছে আর সে তাকে কাজের পর ডেকে জবাব চাইবে।

উদ্বেগ ও অস্থিরতা নিয়ে অপেক্ষা করতে করতে এই কথাই ভাবতে লাগল সে:

'প্রধান অফিসার লোকটা কড়া হলেও আমার কথা শুনবে এবং বুঝবে যে আমার মত ভদ্র, কঠোর পরিশ্রমী নাবিক ব্যক্তিগত কারণে সারেঙ্গের কথার জবাব দেয়নি। ন্যায় বিচার চায় আর সারেঙ্গের নোংরা কার্যকলাপ হজম করতে পারে না বলে তাকে বিদ্রোহী বলা চলে না!'

'বেপরোয়া' ঘুমোল না। মনে মনে জল্পনা করতে লাগল, সারেঙ্গ যখন প্রধান অফিসারকে তার বিরুদ্ধে লাগিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলবে তখন সে তাকে কী বলবে। সবল হৃদয় থেকে সবল উত্তর বেরিয়ে এল। তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে কারণ তা সত্য।

বায়ু তাড়িত মেঘের মত সন্দেহ দূর হল। অশান্ত স্বপ্নাতুর আত্মা তার বিশ্বাস রাখে 'সত্যের জয় হবেই হবে' এবং প্রধান অফিসার 'আসল জিনিষ দেখতে পাবে'।

এ প্রসঙ্গে বলা চলে মিত্যুশিন এতদিন অবধি 'গ্রজিয়াশ্চিতে' ভাল ব্যবহার পেয়েছে:

সত্যি বলতে গেলে জাহাজী সঙ্গীদের কাছ থেকে কিছুটা শ্রদ্ধাও সে পেয়েছে।

'গ্রজিয়াশ্চিতে' এমন সব অফিসার ছিল যারা আগেকার সেই খারাপ দিনগুলির তথাকথিত নৌশিক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দিত। মনে হত সেইটেই আবার চালু হতে যাচ্ছে, এমনকি তরুণ অফিসাররা নাবিকদের মারধোর করতে ইতঃস্ততঃ করত না।

তারা অবশ্য এটা বুঝত যে মিত্যুশিনের আত্মমর্যাদা, তার অধিকার সম্পর্কে চৈতন্য তাকে আর সব নাবিকদের থেকে আলাদা করে রেখেছে। সুতরাং ওর ক্ষেত্রে আইনই ওকে দুর্ব্যবহার থেকে বাঁচিয়েছে। তাছাড়া, চমৎকার কাজের রেকর্ড আছে তার, বুদ্ধিমান পরিশ্রমী নাবিক সে, তার উপর শিক্ষার 'প্রক্রিয়া' প্রয়োগের কোন সুযোগই সে দিত না।

বিশ্রামের সময় শেষ হতে নাবিকদের কাজে লাগার সঙ্কেত দেওয়া হল।

তারপর এল কামান মহড়ার সঙ্কেত।

## ৪

এডমিরাল ব্রিজের উপরে উঠে এল। খাটো মোটা লোক, ভদ্র মুখটির চারপাশে পাকা দাড়ি। মুখে লেগে আছে একটি স্মিত অমায়িক হাসি। জাহাজগুলো নোঙর করা থাকলে সদাই তার মুখে এই হাসিটি দেখতে পাওয়া

যায়। নৌবাহিনীর বড় ফ্ল্যাগ অফিসারের পদ পাবার জন্য সে কাজের মেয়াদ শেষ করছে, নৌবাহিনীর নিরাপত্তার জন্য এখন কোন উদ্বেগ নেই তার। সবাই জানে বিরাটকায় জলজন্তুর মত এই জাহাজগুলি চালাতে কী সূক্ষ্ম কৌশলের দরকার, কারণ তারা পাহাড়ে ধাক্কা খেতে পারে বা চড়ায় ঠেকতে পারে।

বড় বড় কামানগুলোর ভেতর যে রকম দক্ষতার সঙ্গে গোলাভর্তি করা হচ্ছিল তা দেখে এডমিরালের সদয় ছোট্ট চোখ দুটিতে একটা স্বপ্নালু আনন্দের ভাব জেগে উঠল। মনে হল সে কল্পনা করছে একটি সত্যিকার যুদ্ধের—যে কখনও যুদ্ধে যায়নি তার দ্বারা যদি এরকম কল্পনা সম্ভব হয়—এ ক্ষেত্রে অবশ্য 'গ্রজিয়াশ্চি' ইংরেজদের একটা জাহাজের সঙ্গে লড়াইয়ে জয়লাভ করছে।

'অপূর্ব, ভিক্তর ইভানিচ! আমাদের ছেলেগুলিকে দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে... ছোকরাগুলো চমৎকার', এডমিরাল বলল ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেন ওর সামান্য পিছনে দাঁড়িয়েছিল। এডমিরাল এমনভাবে মাথা উঁচু করে আর বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল যাতে তাকে মনে হচ্ছে বেশী লম্বা ও সমরকুশলী।

ক্যাপ্টেন মাঝবয়েসী, মোটা সোটা, কালো চুল ও সম্ভ্রান্ত চেহারা। টুপিতে হাত দিয়ে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে কিছুটা উদ্বেগ নিয়ে কামান মহড়া দেখছে।

'আপনি কি জানেন আমি কী ভাবছি, ভিক্তর ইভানিচ?'

'না, স্যার।'

'আমি ভাবছি ইংলণ্ড যদি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, আমাদের এরকম সৈন্যদের সামনে ওরা দাঁড়াতে পারবে না। নৈতিক শক্তি আসল জিনিষ... আপনার কি তাই মনে হয় না?'

'আমিও তাই মনে করি, স্যার!' সুশৃঙ্খল অধীনস্থ কর্মচারীর শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে উত্তর দিল ক্যাপ্টেন। যদিও ভিতরে ভিতরে ভাবল: 'তুমি জান না এডমিরাল তুমি কী বলছ। আমরা আমাদের নৌবহরকে ক্রনস্টাড্টে লুকিয়ে রাখব যেমন আমরা এমনিতে সাগরে না গিয়ে বেশীর ভাগ তীরে দাঁড়িয়ে থাকি।'

ক্যাপ্টেনের দিক থেকেও অবশ্য এটা খুব যুৎসই।

এডমিরালের মত সেও সমুদ্র-যাত্রা পছন্দ করে না। সে প্রায় ভীরুর সমান সতর্ক, ওর স্নায়ুর উপর সমুদ্রসফর একটা মস্ত বড় চাপ। তার নিজের উপর বা যে জাহাজ সে চালাচ্ছে এদের কোনটা সম্পর্কেই তার কোন আস্থা নেই।

মাত্র দু' মাস হল সে 'গ্রজিয়াশ্চির' ভার পেয়েছে। এর গুণাগুণ সম্পর্কে ওর কোন ধারণা নেই (আগে সে অন্য ধরনের যুদ্ধ-জাহাজে কাজ করেছে), এ কারণে, জাহাজটি ত্রানসুন্দে আছে বলে সে খুশি। ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে এই সত্তর লক্ষ রুবলের জাহাজটা নিয়ে যাবার দায়িত্বের কথা ভেবে কিছুটা উদ্বেগ বোধ করল। কী যে ঘটবে কে বলতে পারে!

'ঐ গোলন্দাজটির নাম কী, ভিক্তর ইভানিচ?' একটা কামানের ভার-পাওয়া 'বেপরোয়ার' দিকে সাদা, মোটা আঙুল দেখিয়ে এডমিরাল জিজ্ঞেস করল।

'মিত্যুশিন, স্যার!'

'চমৎকার গোলন্দাজ... ওকে দেখে বড় উৎসাহ পাচ্ছি!'

'লোকটি পরিশ্রমী, স্যার... তাই না ইভান পেত্রোভিচ?'

বছর তিরিশ বয়েস, লম্বাটে, চশমা-পরা প্রধান অফিসারকে প্রশ্ন করল ক্যাপ্টেন। লোকটার পুরনো জ্যাকেটটার বুকের উপর পিন দিয়ে আটকান নৌ-কলেজের একটি প্রতীক, কিছু-ভুলে-যাওয়া মানুষের মত একটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভাব, খিটখিটে ও বিভ্রান্ত। লম্বাটে মুখের উপর টানা নাক আর চাপা কপাল দেখে জলচর পাখির কথা মনে পড়ে।

ক্যাপ্টেনের মতকে সমর্থন করে এডমিরালকে সম্বোধন করে সে বলল:

'একজন চটপটে ও চতুর নাবিক, স্যার!'

'আর স্বভাব চরিত্র?'

'খুবই ভাল।'

'মেজাজ খারাপ করে না?' সুরসিকের মত চাপা হেসে জিজ্ঞেস করল এডমিরাল।

'না, মদটদ খায় না...'

'তাহলে ওকে পাতি অফিসার বানাচ্ছ না কেন?' এডমিরাল প্রস্তাব করল।

'ওর নাম পদোন্নতির তালিকায় আছে... একজন ভাল সারেঙ্গও হতে পারে ও।'

'লোকের মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারি। দেখলে, কেমন লোকটাকে বাছাই করলাম সঙ্গে সঙ্গে', এডমিরাল বলল।

কামান মহড়া শেষ হলে প্রধান অফিসার মিত্যুশিনের কাছে গিয়ে বলল:

'সাবাস, মিত্যুশিন! এডমিরালের নজর পড়েছে তোমার উপর।'

'হ্যাঁ, স্যার!' কোন মতামত না জানিয়ে বলল মিত্যুশিন।

'এমনি কাজ করতে থাকো। তোমাকে পাতি অফিসার করা হবে।'

'বেপরোয়া' কোন উৎসাহ দেখাল না বা কিছু বলল না। প্রধান অফিসার যখন লম্বা লম্বা পা ফেলে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে চলে গেল, মিত্যুশিন বিদ্রুপের হাসি হেসে মনে মনে বলল:

'"উট পাখিটা" একজন ভাল পাতি অফিসার খুঁজে বার করেছে! সারেঙ্গের নালিশে কী ফল হবে কে জানে! সারেঙ্গ আজ সন্ধ্যায় ওর কাছে এক গাদা মিথ্যে বলা পর্যন্ত ও অপেক্ষা করুক। মনে হয় তখন "উট পাখিটা" আমাকে ডেকে পাঠাবে।'

কিন্তু সন্ধ্যা হল, নাবিকরা রাতের খাবার খেল অথচ প্রধান অফিসার মিত্যুশিনকে ডেকে পাঠাল না।

## ৫

অনিশ্চয়তায় মিত্যুশিন উদ্বিগ্ন হল। সে চাইল সহানুভূতিশীল কোন লোকের কাছে বিশ্বাস করে কিছু বলে মনের ভার লঘু করতে।

সেদিন সন্ধ্যায় সারেঙ্গের সঙ্গে তার সংঘর্ষের কথা বলল কর্ণধার চিজোভের কাছে। চিজোভ সাবধানী, ভদ্র ও হাসিখুশি লোক। কখনো সে 'নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে না' (মিত্যুশিনের ভাষায়), 'বেপরোয়া' যখন মুখ খোলে হয় সে চুপ করে থাকে বা চলে যায়। কিন্তু মনে হয় মিত্যুশিনের উপর তার সহানুভূতি আছে এবং একবার, গোপনে, 'আইন' সম্পর্কে মিত্যুশিনের

কথা সে সমর্থন করেছিল; কিন্তু একই সঙ্গে সারেঙ্গের সঙ্গেও সে মিলেমিশে চলে।

মিত্যুশিনের খোলা কথা কিন্তু এবার তার কাছ থেকে সহানুভূতি পেল না।

চিজোভ দুঃখের সঙ্গে সাদাটে চুলওলা মাথা নেড়ে তার ধূর্ত বাঁকান চোখে ভয়ার্তভাবে চারদিকে চেয়ে নীচু গলায় বলল:

'এজন্য তুমি ফ্যাসাদে পড়বে, মিত্যুশিন... ব্যাপারটা তোমার পক্ষে খুব খারাপ!'

'তোমার তাই মনে হয়?' সন্দেহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল মিত্যুশিন।

'তুমি বেশী দূর এগিয়ে গেছ। সারেঙ্গকে ওরকমভাবে কথা বলা ঠিক হয়নি। তোমার এ অধিকারও নেই। কেন, সে কি তোমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে না?'

'করলেই বা কী হত!'

'সে তোমাকে মারধোরও করেনি, গালিগালাজও দেয়নি?'

'ওরকম করার সাহস নেই তার।'

'ও যা চেয়েছিল তা সম্মান ... গোলমাল বাধিয়ে লাভ কী?.. তুমি শুধু ওর রাগ বাড়িয়েছ... কথায় জবাব দিয়ে, ওর সম্পর্কে মতামত জানিয়ে কোন খেয়ালে গোলমাল পাকিয়ে তুললে?.. এতে তোমার কোন্ ভালটা হবে শুনি?' মিত্যুশিনের আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে নীতি উপদেশের মত কথাগুলি বলল চিজোভ।

'কী ভাল?' 'বেপরোয়া' জানতে চাইল।

তার বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে আশাহত লোকের সেই বিষণ্ন ভাব যে লোক তার বিশ্বাসীর কাছ থেকে সমর্থন পায়নি।

'সারেঙ্গকে বিদ্রূপ করে তোমার ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলে। বেশ, তা ত করলে, কিন্তু এতে কোন লাভ হল কি? যা করলে তাতে খামকা ঝামেলা ডেকে আনা। সারেঙ্গ যে তার লোকদের জানে, এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। সে রীতিমাফিক তার কর্তৃপক্ষকে নালিশ জানাবে, তোমাকে বিদ্রোহী

হিসেবে পাকড়াও করাবে। আমি দেখতে চাই তুমি কী করে তা মিথ্যে প্রমাণ করো!'

'আমি তা প্রমাণ করব!' 'বেপরোয়া' জোরের সঙ্গে চিৎকার দিয়ে উঠল।

'না, তুমি পারবে না। ওরা নির্ঘাৎ তোমাকে কয়েদীর দলে পাঠাবে।'

'আমি পরোয়া করি না!' মিত্যুশিন বলল ক্রোধ আর বিরক্তির সঙ্গে।

'পছন্দ কর চাই নাই কর, গোখরোর গায়ে যখন হাত দিয়েছ ছোবল খেতে হবেই... তোমার মাথার মধ্যে আইন ঢুকেছে... তুমি ভাব তোমার অধিকার আছে, তাই না? ওরা তোমাকে অধিকার বুঝিয়ে ছাড়বে... আর লোকে ভাববে মুখ্যু বলে তুমি শাস্তি পেয়েছ। যমের সঙ্গে লড়াই করতে গেছ... যে কোন কাজের চাতুর্য আর মাথা আছে তোমার। তোমাকে পাতি অফিসার করে দেবে... বড়দের সঙ্গে সদ্ভাব রাখলে শান্তিতে ভদ্র জীবন চালাতে পার। অথচ তোমার পাগলাটে কল্পনার ফলে এই তুমি পেতে বসেছ—ওরা তোমাকে সাবাড় করবে... প্রধান অফিসার কড়া লোক। অবাধ্যতার জন্য কখনও কাউকে ক্ষমা করে না। মনে রেখো, এরকম ব্যাপার কেউ ক্ষমা করে না। সঙ্গে সঙ্গে ওরা তদন্ত সুরু করবে। তুমি যে সব সময় আইনের কথা বলে বেড়াচ্ছ আর অফিসারদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছ তা জানতে পারবে। ভুলে যেয়ো না যে তুমি নিজেই একজন নাবিক... সবাই ভাবে তুমি যা কিছু কর সবই বোকার মত... সারেঙ্গের সঙ্গে এই ঝামেলা না বাধালে তুমি আর সবার মতই থাকতে পারতে...'

'বেপরোয়া' চিন্তিতভাবে চুপচাপ বসে রইল, স্পষ্টই সে মনমরা হয়েছিল।

ওকে ভয় দেখাতে পেরেছে মনে করে চিজোভ বলল:

'তোমার কেবল একটিমাত্র পথ আছে...'

'কী সেটা?'

'সারেঙ্গের কাছে ক্ষমা চাওয়া। সে কোন মতেই এ নিয়ে তোমার চাইতে বেশী হৈ চৈ বাধাতে চায় না... সহজেই তোমাকে ক্ষমা করবে সে... আমার কোন সন্দেহ নেই তাতে। কী ক্ষতি এতে তোমার বলো?'

'একেই বলে ঠিক পথে আসা! ধন্যবাদ তোমাকে!' 'বেপরোয়া' গম্ভীরভাবে জবাব দিল।

'কেন ধন্যবাদ?.. কী বলতে চাইছ তুমি?'

'শেষটায় তোমার নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেছ।'

'লোকের যুক্তি তোমার পছন্দ হয় না, দেখছি।'

'তোমার যুক্তি আমার পছন্দসই নয়। তুমি আমাকে বোকা ঠাউরেছ, তাই না?..'

'তুমি তাই। অনুতাপের পরোয়া নেই, নিজেকে বড় বেশী মনে কর। ভুলে যেয়ো না, তুমিই একমাত্র নাবিক নও।'

'আর আমি যদি সারেঙ্গের কাছে ক্ষমা চাই আর পাতি অফিসার হয়ে তোমার মুখ্য মুখটাকে ঘুষিয়ে থেঁৎলো করি তাহলে খুব বুদ্ধির পরিচয় দেব, তাই না?' 'বেপরোয়া' বিদ্রূপ করল।

'তাহলে তোমার মতে এটা কৌতুকের ব্যাপার?'

'আর কি?'

'কয়েদীর দলে যেতে চাও?'

'নিশ্চয়! না ভেঁবে পারছি না — তুমি আমাকে হাসালে।'

'শীগগিরই তোমাকে অন্য হাসি হাসতে হবে।' রেগে উঠল চিজোভ।

'বোধ করি সময়টাও বলতে পার।'

'যতটা জানি, কালই তোমাকে ওরা শায়েস্তা করবে।'

'কারণ?'

'প্রথম কথা সারেঙ্গের ব্যাপারে তুমি সাজা পাবে। ওরা কি গত গ্রীষ্মে এখানে একজনকে চাবুক মেরে কয়েদীর দলে পাঠায়নি? সোজা ব্যাপার ওটা!'

কাল তাকে লজ্জাকর শাস্তি পেতে হবে, সঙ্গীরা ওর অপমান আর বেয়াদপি দেখে উল্লসিত হচ্ছে, এই চিন্তায় মিত্যুশিন চমকে উঠল।

অগ্রমাস্তুলের পুরোবর্তী ডেকের অন্ধকারে জাহাজের পাশে দাঁড়িয়ে ওরা কথা কইছিল। মিত্যুশিনের বিবর্ণ, উত্তেজিত মুখ আর উজ্জ্বল কালো চোখ দুটো চিজোভের নজরে পড়ল না।

'আমি পরোয়া করি না। তুমি বসে বসে ঐ নিয়ে মাথা ঘামাও!' আতঙ্ক লুকোবার চেষ্টা করে মিত্যুশিন বলল উদ্ধতভাবে।

'তোমাকে আমি বুঝতে পারি না', অবাক হয়ে বলল চিজোভ। 'কোত্থেকে এমন বেপরোয়া চরিত্র পেলে তুমি?'

'হাওয়া থেকে...'

'কোথায়?'

'একটা কারখানায়।'

'ও। আর জারের চাকরী করেও তুমি একে কাটিয়ে উঠতে পারলে না', 'বেপরোয়ার' কথার ভঙ্গীতে অপমান বোধ করে ঠাট্টার সুরে বলল চিজোভ।

'তাই কি মনে হচ্ছে...'

'মজার ব্যাপার কিন্তু...'

'মানুষ ন্যায়ের জন্য হাহাকার করতে পারে, একথা তুমি কখনো শুনেছ বলে মনে হয় না', হঠাৎ বলে উঠল মিত্যুশিন।

চিজোভ হাসল অবিশ্বাসীর মত।

'কী করেই বা বুঝবে? তোমার আত্মাটা শুকরের আর মনটা নীচ... আইনের বিরুদ্ধে নাবিক চাবুক খাচ্ছে এতে তোমার আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নেই! তোমার ধারণা এতে মানুষ শুধু দেহের আঘাতই পায় — এর সঙ্গে যে লজ্জা আর অবিচার জড়িয়ে আছে তা তোমার মনেও আসে না... আর কী পরামর্শই না তুমি আমাকে দিলে! যদিও বা তোমার বিবেক বলে কিছু ছিল তাকে দেশেই জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছ। জানতাম তুমি ভীরু, তবু ভেবেছিলাম চুপ করে বুঝবার চেষ্টা করবে!' গলা চড়িয়ে বলল মিত্যুশিন।

'কেন তুমি আমায় গালাগালি দিচ্ছ? কে তোমায় এ অধিকার দিয়েছে?'

'দৌড়ে যাও তোমার সারেঙ্গের কাছে... যাও না... শুয়োরের মত ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আমার নামে লাগাও গে... এর মধ্যে তা করে থাকলেও অবাক হব না...'

'আর বেশী দেরী নেই, তোমাকে ওরা শায়েস্তা করবে, মাথা-পাগলা শয়তান কোথাকার!'

ঘেন্নার সঙ্গে কথাটা বলে চিজোভ চলে গেল।

ঘুমোবার দোলনা বিলি করা হল। বিষণ্ণ চিন্তায় অস্থির মিত্যুশিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোতে পারল না।

মাঝরাতে পাহারা দিতে গিয়ে ডেকের উপর পায়চারি করতে লাগল। কারও সঙ্গে কথা কইল না। ক্লিষ্ট ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় আবার দুশ্চিন্তায় ডুবে গেল সে, এমন সময় প্রথম বছর কাজে লাগা এক ছোকরা নাবিক এল ওর কাছে।

মিত্যুশিন থামল। জিজ্ঞেস করল, 'কী চাও তুমি?'

ফিস ফিস করে কথা বলার মত গলা নাবিয়ে সলজ্জ ও আন্তরিকভাবে তরুণটি বলল:

'সত্যি বলার সাহস দেখিয়েছ বলে ঈশ্বর তোমাকে বিপদ থেকে বাঁচাবে, মিত্যুশিন। আমি একটা নগণ্য মানুষ কিন্তু আমি বুঝেছি তোমার অন্তর কী চাইছে। সে খুঁজছে ন্যায়বিচার। এ জন্যই সারেঙ্গের সম্পর্কে তোমার ধারণা তাকে বলেছ। আমাদেরই জন্য দুঃখ পাও তুমি! অশান্ত তোমার আত্মা!'

'ধন্যবাদ চেরেপকোভ, দয়া-ভরা কথা শুনে ভাল লাগল!' আবেগ-গভীর গলায় বলল মিত্যুশিন।

মন থেকে নেবে গেল একটা বোঝা, হঠাৎ তার মনে হল সে আর একা নয়।

## ৬

পরের দিন সকালে জাহাজ পরিষ্কারের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ চলার সময় সারেঙ্গ জ্‌দানভ মাথায় আঘাত-পাওয়া ভল্লুকের মত থমথমে চেহারায় এদিক ওদিক পায়চারি করতে লাগল।

সামান্য ত্রুটি ধরে আগের চাইতে অনেক বেশী জঘন্য অত্যাচার চালাতে লাগল নাবিকদের উপর, সুরু করল অভ্যাসের চাইতে অনেক বেশী শাপ-শাপান্ত, নাবিকদের পিটোতে লাগল ইচ্ছাকৃত পাশবিকতা আর ধীর নিঃশব্দ বিবেচনা নিয়ে।

'বেপরোয়া' বিপর্যস্ত বোধ করল।

নিজের রক্তাক্ত মুখটার শুশ্রুষা করছিল একজন নাবিক, জোরাল উত্তেজিত গলায় বলল তাকে:

'কেন তুমি সারেঙ্গ জানোয়ারটাকে মারতে দাও? তোমাকে মারার কোন অধিকার নেই ওর!'

নাবিকটি নিঃশব্দ। চারদিকে দাঁড়ান নাবিকরাও তাই। কী ঘটে দেখবার জন্য তারা অধীরভাবে অপেক্ষা করছে। সারেঙ্গ কাছেই দাঁড়িয়েছিল, প্রতিটি কথা শুনতে পেল সে।

যাই হোক সে শুধু মিত্যুশিনের দিকে তাকাল জিঘাংসার দৃষ্টিতে, শত্রুর উদ্ধত ও কঠোর ভাব নিয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

'আজকেই এর ফল পাব!' স্থির করল মিত্যুশিন।

সত্যিই তাই, নিশান তোলার পোনে একঘণ্টা আগে প্রধান অফিসারের আর্দালিটি ছুটে এল মিত্যুশিনের কাছে।

'প্রধান অফিসার তোমাকে তাঁর কেবিনে দেখা করতে বলেছেন!' আর্দালির গলা শোকার্ত।

গলা নাবিয়ে ফিস ফিস করে সহানুভূতির সঙ্গে আবার চট করে বলল:

'ও একেবারে ক্ষেপে গেছে... এইমাত্র সারেঙ্গ ওর কাছে গিয়ে তোমার নামে একগাদা লাগিয়েছে... কেবিনে ঢুকে শুনতে পেলাম একটার পর একটা বলে চলেছে। ভাবলাম তোমাকে সাবধান করে দিই।'

'ধন্যবাদ তোমাকে!' এক নিশ্বাসে বলল মিত্যুশিন।

'আমার পরামর্শ নাও। চুপ করে থেকো... প্রতিবাদ করতে যেও না। ওকে যা বলবার আগে বলতে দিও। ওর কথার তোড় কমে এলে তোমারটা বলবে।'

কড়া যে সব কথা সে বলতে চেয়েছিল বিবর্ণ ও উত্তেজিত মিত্যুশিন তা মনে আনতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল অফিসারদের ঘরে।

জাহাজের প্রায় সব অফিসাররাই বড় টেবিলে বসে চা খাচ্ছে।

'বেপরোয়া' আসতে হঠাৎ তাদের সজীব কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল।

অফিসারদের ঘরের সবাই এইমাত্র জেনেছে এই বুদ্ধিমান ও নিয়ম-মানা

নাবিকটি লোকদের সামনে এডমিরালকে 'তুচ্ছ তাচ্ছিল্য' এমনকি গালিগালাজ করেছে। সারেঙ্গকেও কেবল মারতে বাকি রেখেছে।

দৃঢ় স্থিরভাবে যেমনি সে প্রধান অফিসারের কেবিনের দিকে এগুতে লাগল এই 'উদ্ধত' দৃষ্টি, কালো ও বেঁটে নাবিকের দিকে বহু অফিসার চেয়ে রইল বিস্ময় ও ক্রূর দৃষ্টি নিয়ে।

'অসভ্য পশু! নিজেকে কী ভাবে ও, ওই জঘন্য আন্দোলনকারীটা?' একজন সুদর্শন তরুণ অফিসারের ঘৃণ্য মন্তব্য শোনা গেল।

'লোকটাকে গাল দিচ্ছ কেন? এটা কি ভদ্রলোকের কাজ! যতটা জানি তাতে সারেঙ্গের রাগ থাকতে পারে ওর উপর, কেবল প্রতিশোধ নেবার জন্যই এ কাজ করেছে সে। ওর কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়!' বলল আর একজন অফিসার ফরাসী ভাষায় তিরস্কার-ভরা গলায়। লোকটি ভদ্র, লম্বা, কালো চুল, মুখখানা অমায়িক।

মিত্যুশিন অনুমান করল তিনি ওর হয়ে কিছু বলছেন। সে জানত নাবিকদের সঙ্গে এই কালো চুল অফিসারটির ব্যবহার ভদ্র। 'আইন বোঝে' লোকটি।

'বেপরোয়া' তার এই একমাত্র সমর্থকের দিকে কৃতজ্ঞভাবে চট করে চেয়ে প্রধান অফিসারের কেবিনের দরজায় জোরে ধাক্কা মারল।

'ভেতরে এসো!'

মিত্যুশিন বাতাস বোঝাই চওড়া ঘরটিতে ঢুকে তার পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিল, বিবর্ণ ও উত্তেজিত অবস্থায় দাঁড়াল সেখানে, প্রধান অফিসারের দিকে চাইল কঠোরভাবে। যেসব কথা সে বলবে ভেবেছিল তখনকার মত সব গেল গুলিয়ে।

লম্বা আর রোগা ইভান পেত্রোভিচ তার টেবিলে বসেছিল। পা দুটো দীর্ঘ, হাঁটু মোড়া, চশমার পিছনে ধূসর চোখ দুটো ক্রুদ্ধভাবে জ্বল্ জ্বল্ করছে। মোটা সিগারেটটায় টান মারছে ঘন ঘন আর রাগের সঙ্গে হাড়-বার-করা আঙুল দিয়ে কটা রঙের ছোট্ট দাড়িটুকু টানছে।

প্রধান অফিসার মিত্যুশিনের দিকে তাকাল। ওর ভিতর আদৌ অপরাধীর

ভাব নেই। লোকটার নির্লজ্জ ঔদ্ধত্যে অফিসারের চোখ দুটো বিস্ময়ে গোল হয়ে গেল। এমন কটমট করে তাকাল ‘বেপরোয়ার’ দিকে যেন আগে ওকে দেখেনি, এই সাংঘাতিক বদমায়েস যে এমন দুঃসাহসিকভাবে আইন ভেঙেছে, এরকম বিদ্রোহের ধারণা যার মাথায় তাকে যেন ভালো করে দেখে নিতে চাইল।

প্রধান অফিসার রাগে গজরাতে লাগল।

কেটে গেল কয়েকটি মুহূর্ত।

মিত্যুশিন ওর দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে।

## ৭

‘তাহলে এই তোমার স্বরূপ!’ সিগারেট শেষ করে শেষ পর্যন্ত সুরু করল ইভান পেত্রোভিচ। ‘একজন রুশ নাবিক তার সামরিক শপথ ভেঙেছে… হ্যাঁ… শপথ ও বিবেকের বিরুদ্ধে গেছে! তুমি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লোকগুলোকে অবাধ্য হবার উস্কানি দিয়েছ… সারেঙ্গকে অপমান করেছ, তাকে মারবে বলে ভয় দেখিয়েছ! উপরওয়ালা অফিসারদের বিদ্রূপ করেছ! আর আমি কিনা তোমাকে পাতি অফিসারের পদ দিতে চাইছিলাম। আমি তোমার সামরিক বিচার করাব… তোমাকে জেলে পাঠাব।’

তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগের কথা বলা হল এবং প্রধান অফিসার তাকে যে শাস্তি দেবে বলে ভয় দেখাল, তা শুনেও যেন সে তা বিশ্বাসই করতে পারল না।

‘আমাকে বুঝিয়ে বলতে দিন, স্যার!’ সে সুরু করল।

‘চুপ করো!’ চিৎকার দিয়ে উঠল প্রধান অফিসার।

মিত্যুশিন চুপ করে রইল। অবস্থাটা বোধ হল অসহায়… প্রধান অফিসার বলতে লাগল, ক্রমশঃ রাগ বাড়তে লাগল তার, জঘন্য অপরাধের জন্য চরমতম শাস্তি দেবার ভয় দেখাল সে।

‘তোমাকে গ্রেপ্তার করাব! রুটি আর জল খাইয়ে রাখব। আর ফের যদি তুমি উদ্ধত হও লাগাব চাবুক!’ প্রধান অফিসার শেষ করল তার বক্তব্য।

পর মুহূর্ত থেকে তার রাগ পড়তে লাগল ... এ যেন ঝড়ের মেঘ ভেঙে পড়া। 'অপরাধীর' বিবর্ণ গম্ভীর মুখে একটা গভীর দুঃখের ছাপ এবং দারুণ মনস্তাপ-ভরা চোখ দুটিতে বলিষ্ঠ ও তিরস্কারপূর্ণ চাউনি দেখে সে একটা বিশ্রী অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

'দয়া করে আমাকে বুঝিয়ে বলতে দিন, স্যার!' মিত্যুশিন আবার সুরু করল।

'বুঝিয়ে বলার কী আছে তোমার? সারেঙ্গ তোমার সম্পর্কে সবকিছুই খুলে বলেছে...'

'সারেঙ্গ আমার সম্পর্কে মিথ্যে বলেছে, স্যার!'

'বাজে কথা! সারেঙ্গ কখনও নাবিকের অপবাদ দেবে না।'

'ঈশ্বর আমার সহায়, স্যার, আমি সত্যি কথা বলছি! আমার উপর সারেঙ্গের রাগ ছিল — সে ইচ্ছে করে আমার নামে লাগিয়েছে আর আপনি তাকে বিশ্বাস করেছেন... আদালতে সত্য প্রকাশ পাবে, স্যার...'

'বেপরোয়ার' মুখে এমন একটা আন্তরিকতা ফুটে উঠল এবং তার স্বরে এমন একটা সত্যের ভাব যে প্রধান অফিসার ওকে আর কঠোর শাস্তির যোগ্য 'অপরাধী' ভাবতে পারল না।

'তুমি কি সারেঙ্গকে গাল দাওনি, তাকে মারবে বলে শাসাওনি?' কিছুটা বিচলিতভাবে জিজ্ঞেস করল অফিসার।

'হ্যাঁ, স্যার।'

'সারেঙ্গ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি, করেছে কি? সবাই তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, তাই না?'

'হ্যাঁ, স্যার। সারেঙ্গ আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি, সবাই আমার সঙ্গে আইনমাফিক ব্যবহার করে ...'

'তাহলে কেন তুমি ওকে অপমান করেছ?'

'কারণ সে নাবিকদের উপর অত্যাচার করে, স্যার। ওকে সংযত করা যাচ্ছে না। আপনি জানেন না কী রকমের ঘুষখোর সে। কী ভাবে লোকদের ঘুঁষি মেরে বেড়ায়.... যখন ওর কেবিনে আমার উপর ঘুঁষি তোলে আমি সেটা সহ্য করিনি... আমি বলেছিলাম ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হবে...

রাগিয়ে দিলে যে কোন লোক একথা বলবে ... ঘুঁষি মারা বা গালিগালাজ দেওয়ার এমন কোন আইন নেই... আমি পাল্টা জবাব দিয়েছিলাম, আমি স্বীকার করছি, স্যার, কিন্তু আমি কখনও কাউকে বিদ্রোহ করতে বা অবাধ্য হতে উস্কানি দিইনি। আমি নাবিকদের শুধু বলেছিলাম যে ঘুঁষি মারা আইন সঙ্গত নয়, তাদেরও সত্য ও ন্যায় অনুযায়ী বাস করার অধিকার আছে। একে বিদ্রোহ বলতে পারেন না, পারেন কি, স্যার?'

মিত্যুশিন তার কথার বন্যা বইয়ে দিল। উত্তেজিতভাবে ও আবেগভরে সারেঙ্গের সঙ্গে তার সংঘর্ষের কথা বিবৃত করল, নির্দোষ লোকদের জীবনকে নারকীয় করে তুলেছে বলে ওই জঘন্য লোকটাকে সে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারে না। লোকগুলির সাহস নেই অভিযোগ করার, কারণ তাদের আশঙ্কা সত্য চাপা পড়ে যাবে এবং যারা ঠিক পথে আছে তারা বিপথে চলছে বলে প্রমাণ হবে। এ জন্যই নাবিকের কাজ এত দুঃখময়। কিন্তু আইন সকলের জন্যই সমান ... আপনি শুধু সেটাকে অনুসরণ করুন, তাহলে কারও কোন অভিযোগ থাকবে না।

'কে তুমি যে আইন প্রয়োগ করবে? কে তোমাকে এ অধিকার দিয়েছে?'

'আমি ন্যায়বিচার চাই, স্যার... আমি বলেছি, নাবিকরা যেন তাদের মার না খেতে দেয়।'

'আর তোমার উপরওয়ালাদের সমালোচনা করেছ?'

'হ্যাঁ, স্যার। কখনও কখনও করেছি।'

'তোমার উপরওয়ালা অফিসারদের সমালোচনা কর — এত বড় দুঃসাহস তোমার?'

'প্রত্যেক লোকেরই বিচার করার অধিকার আছে, স্যার... আমি অফিসারদের এই বলে সমালোচনা করেছি, তাঁরা লোকগুলিকে আইনসঙ্গত দৃষ্টান্ত না দেখিয়ে কেবল দৈহিক নির্যাতন করছেন... এই আমার একমাত্র বিদ্রোহাত্মক আচরণ, স্যার।'

'তুমি কি আমারও সমালোচনা কর?'

'হ্যাঁ, স্যার, মাঝে মাঝে!' 'বেপরোয়া' খোলাখুলিভাবে স্বীকার করল।

'কী কারণে?'

'ঐ একই কারণে, স্যার!'

'তুমি একটা বেপরোয়া লোক, দেখছি!' প্রধান অফিসার বিড় বিড় করে বলল, কিন্তু তার মধ্যে তখন আর অসন্তোষ ছিল না।

হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে-ফেলা লোকের মত তার মধ্যে একটা চিন্তাযুক্ত অনিশ্চিত ভাব দেখা দিল।

যৌবনের দিনগুলির দ্রুত-সঞ্চারি উজ্জ্বল স্মৃতি তার মনের উপর দিয়ে চকিতে খেলে গেল... সে সময়ে ন্যায়ের কাজে তার আগ্রহ ছিল। নিজে সৎ প্রকৃতির লোক হয়ে সারেঙ্গের অপকৌশল ও নীচতার কথা শুনে সে স্তম্ভিত হল। 'বেপরোয়াকে' দেখে বিস্মিত হলেও উপলব্ধি করল যে লোকটা বিদ্রোহী নয় — নিছক অধিকার চর্চাকারী, শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য ওর শাস্তি পাওয়া উচিত। সে এমন ধরনের লোক যে বহু গোলমালের সৃষ্টি করতে পারে। ওর যদি সামরিক বিচার হয় তাহলে নির্ঘাৎ ও কয়েদীর দলভুক্ত হবার শাস্তি পাবে, ওর জীবন ধ্বংস হবে। তাছাড়া, 'গ্রজিয়াশ্চিতে' যা সব ঘটছে তার অনেক কিছুই ফাঁস হয়ে যাবে এবং সেটা প্রধান অফিসার ও ক্যাপ্টেন উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত অপ্রীতিকর হবে।

ইভান পেত্রোভিচ নিজেকে সুবিচারক বলে মনে করত। তার একথা মনে হল যে মিত্যুশিন যা বলেছে তা যদি তদন্তের দ্বারা সমর্থিত হয় তাহলে ন্যায়বিচারের খাতিরে সারেঙ্গের সামরিক বিচার হওয়া দরকার। কিন্তু সারেঙ্গ এমন এক সুদক্ষ লোক যাকে সে হারাতে চায় না। তাছাড়া, সামরিক বিচার অর্থ অবাঞ্ছনীয় গোলমাল যাকে কর্তৃপক্ষ ভাল নজরে দেখেন না। ইভান পেত্রোভিচের সব সময়ে নজর ছিল নিজের সুযোগের দিকে, কর্তৃপক্ষকে সে ভয় করত। তাছাড়া, সারেঙ্গকে সামরিক আদালতের সামনে হাজির করে সে নিজের দোষকেই মেলে ধরবে। এটা কী করে সম্ভব যে সে দু' দুবার এই সারেঙ্গকে নিয়ে সমুদ্রে সফর করেছে অথচ আগে কখনো তার বদ আচরণ জানতে পারেনি।

সে নিজে দিনভর জাহাজ সংক্রান্ত কাজ নিয়ে যথেষ্ট ব্যস্ত। একটা নাবিককে

কেন্দ্র করে 'গ্রজিয়াশ্চিতে' এই যে 'গোলমাল' পাকিয়ে উঠেছে তাতে সে বিরক্ত হয়ে উঠল। 'বেপরোয়াকে' নিয়ে কী করা উচিত আদৌ ঠিক করতে পারল না।

আবার সবটা চিন্তা করল এবং দু'এক মিনিট বাদে ব্যাপারটাকে চাপা দেবার সিদ্ধান্ত করল। তার মত দুর্বলচিত্ত লোকের কাছে এইটেই সর্বোৎকৃষ্ট পথ বলে মনে হল তার।

মিত্যুশিনকে বলল:

'যদি সারেঙ্গের কাছে ক্ষমা চাও, তোমার দোষকে উপেক্ষা করতে পারি... তোমার জন্য দুঃখ পাচ্ছি... আমি নিজে সারেঙ্গের সঙ্গে কথা কইব... বুঝলে ব্যাপারটা?'

'হ্যাঁ, স্যার!'

'কিন্তু মনে রেখো এই শেষবার... জেলে যদি না যেতে চাও, তাহলে মুখ বন্ধ রাখবে... এ কথা ভুলো না... সারেঙ্গকে বিচার করা তোমার কাজ নয়। ওটা তার উপরওয়ালাদের উপর ছেড়ে দাও... যদি তুমি মনে কর তোমার উপর অবিচার হচ্ছে, তুমিও উপরওয়ালাদের কাছে অভিযোগ করতে পার।'

প্রধান অফিসার ভাবল সে 'বেপরোয়াকে' বাঁচাল, তার এখন কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এবং একই সঙ্গে যাকে সে অপ্রীতিকর ব্যাপার হয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা করেছিল তাকেও চাপা দিল। আর সারেঙ্গের ব্যাপারে, ওই দাম্ভিক লোকটার কানে এমন কয়েকটা কথা বলতে হবে যাতে অন্যায়ভাবে ওর টাকা নেওয়া আর পাশবিকতা বন্ধ হয়।

কিন্তু কৃতজ্ঞতা দেখান দূরের কথা, মিত্যুশিনকে অসন্তুষ্ট ও বিষণ্ণ দেখাল।

'যাও, তোমার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও!'

'হ্যাঁ, স্যার... কেবল...'

'কী ব্যাপার আবার?'

'আমি সারেঙ্গের কাছে ক্ষমা চাইব না, স্যার। কারও যদি সামরিক বিচার করতে হয়, তাহলে সেটা সারেঙ্গের...'

'চোপরাও! আমি তোমাকে চাবুক খাওয়াব!' প্রধান অফিসার জ্বলে উঠল।

'এরকম কোন নিয়ম নেই, স্যার! প্রথমে আমার বিচার হোক। ন্যায়ের জয় হবেই হবে!' এই বলে চলে গেল 'বেপরোয়া'।

## ৮

'বেপরোয়াকে' চাবুক লাগান সম্পর্কে প্রধান অফিসার মত বদলাল।

তদন্ত শেষ হবার পরের দিন ওকে পাঠান হল সেণ্ট পিটার্সবুর্গে। বিচারাধীন অবস্থায় সেখানে তাকে নৌ কারাগারে থাকতে হল। ত্বরিৎ যক্ষ্মার ফলে শরৎকালে ওকে যেতে হল হাসপাতালে। হাসপাতালেও 'ন্যায়ের' পক্ষ নিয়ে দাঁড়াল সে। ন্যায় ও সুবিচারের জন্য অন্যান্য রোগীদের কাছে আবেগময়ী বক্তৃতা দিতে লাগল।

তখনও সে অপেক্ষা করছিল বিচারের, আশা করছিল ন্যায়ের 'জয় হবে', সারেঙ্গ হবে বিতাড়িত।

কিন্তু সেদিন পর্যন্ত সে বেঁচে রইল না। বড়দিনের আগেই মারা গেল সে।

## পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত
পেলে প্রকাশালয় বাধিত
হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
২১, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union